শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারত।

(শেষাংশ)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলল-

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-চরিত, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক, শ্রীগৌর-গীতিকা, ...প্রিয়া বিলাপগীতি, শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া টকালীয় লীলা স্মরণ-ম. শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহস্রনামস্তোত্র, শ্রীমুরারিগুপ্তপ্রতিষ্ঠিত শ্রীনিতাই-গৌর-লীলা-কা.. দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের জীবন ও পদাবলী, গজপতি প্রতাপ-রুদ্র নাটক, শ্রীজাহ্নবাচরিত, সিদ্ধচৈতন্যদাস বাবাজি, উপদেশ-শতক, বৈষ্ণব-বন্দনা, নিতাইগৌরনামমাহাত্ম্য, শচী-বিলাপ-গীতি, শ্রীমদ্বিশ্বরূপ-চরিত প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থ প্রণেতা এবং "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ"।

মাসিক শ্রীপত্রিকার সম্পাদক —

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীপাদ দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর বংশীয়

শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভু কর্ত্তৃক গ্রন্থিত ও প্রকাশিত।

বুড়াশিবতলা, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

গৌরলীলা দরশনে বাঞ্ছা হয় মনে মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।
নরহরি পা'বে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থ—গানে দরবিবে শিলা॥

ঠাকুর নরহরি

গৌরাব্দ ৪৪০

সাল ১৩৩৩

মূল্য ৫৲ ডাকমাশুল স্ব—

(সর্ক

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ

গ্রন্থকারের নিবেদন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারতের প্রথম সূচনা হয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে ১৩১৮ সালে শুভ কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা তিথিতে লালাবাবুর শ্রীমন্দিরে বসিয়া শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রণীত আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পু বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ শুনিতে শুনিতে,—শ্রীগ্রন্থের লিখন-কার্য্যের শুভারম্ভ হয় মধ্য ভারতের ভূপাল নগরে গ্রন্থকারের অবস্থান কালীন ১৩১৯ সালের ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে—সমগ্র শ্রীগ্রন্থ লিখন-কার্য্য শেষ হয় তিন বৎসরে সুদূর মুসলমানরাজ্য ভূপালে বসিয়া ১৩২২ সালে ২৮এ কার্ত্তিক মাসে,—এই সুবৃহৎ শ্রীগ্রন্থের প্রথমাংশ শ্রীনবদ্বীপ-লীলার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় কলিকাতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে ১৩২৯ সালে,—ইহার পরবর্ত্তী চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠখণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় কলিকাতার শ্রী... প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ১৩৩১ সালে,—শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারতের শেষাংশ শ্রীনীলাচল-লীলা খণ্ডে শেষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় শেষোক্ত রুদ্রপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ১৩৩৩ সালের মাসে। এই বিরাট শ্রীগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণে ব্যয় হইয়াছে মোটামুটী ৪৬০০৲ টাকা—তাহার শ্রীগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তালন্দ-রাজসাহীনিবাসী গৌরভক্তবর ...রধা... ত ললিতমোহন মৈত্রেয় মহাশয় ৯৭৫৲ টাকা এবং কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট নিবাসী ... গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় ১২৫০৲ টাকা। এই টাকার মধ্যে ...খন আমি ... সঙ্গে ক... গৌর ...রিশত টাকা কলিকাতার কোন এক নামজাদা মুদ্রাযন্ত্র ও ঔষধ ব্যবসায়ী জুয়াচোরে খাইয়াছে—তাহা না হইলে শ্রীগ্রন্থখানিকে একটু অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পদযুক্ত করি... প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতাম। ইহাও ইচ্ছাময় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ইচ্ছা।

এই বিরাট শ্রীগ্রন্থের একটি পরিশিষ্ট লেখা হইতেছে তাহা শেষ হইতে বিলম্ব হইবে। এই বিরাট শ্রীগ্রন্থ লিখনে, মুদ্রাঙ্কণে, প্রকাশে অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদ, ত্রুটি, বিচ্যুতি, পুনরুক্তি প্রভৃতি নানাবিধ দোষ ঘটিয়াছে,—তাহা জানি এবং তাহার জন্য সহৃদয় গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দের নিকট অকপট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ, বুড়াশিবতলা
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ কুঞ্জ
১৫ই আশ্বিন ১৩৩৩ সাল
গৌরাব্দ ৪৪০।

দীন—হরিদাস গোস্বামী

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ।

উৎসর্গ-পত্র।

পরম পূজ্যপাদ গৌরধামগত মদীয় অগ্রজ

শ্রীপাদ শ্রীল অচ্যুতানন্দ গোস্বামী প্রভু

শ্রীকরকমলেষু—

প্রেমময় দাদা!

আমার জন্মিবার বহুদিন পূর্ব্বে পঞ্চমবর্ষে শিশুকালেই তুমি গৌরধাম গমন করিয়াছ,—তোমাকে আমি চক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য পাই নাই,—কিন্তু পিতামাতার নিকট তোমার অপরূপ রূপের কথা শুনিয়া আমি পরম মুগ্ধ হইয়াছি। তোমার অপরূপ রূপের কথা শুনিলেই এবং তোমার পরম পবিত্র মধুর নামটী মনে হইলেই গৌর-আনা-গোসাঞির শ্রীশ্রীঅদ্বৈততনয় সদানন্দময় অপূর্ব্ব বালমূর্ত্তি শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভুর মধুর মূরতিখানি আমার স্মৃতিপথে পরমাশ্চার্য্যভাবে জাগিয়া উঠে। শ্রীচৈতন্যভাগবত বর্ণিত সেই অপরূপ বালমূর্ত্তিখানি,—

"পঞ্চমবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি সব অঙ্গ ধুলায় ধুসর॥
অভিন্ন কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ পরমভক্ত সর্ব্বশক্তিধর।।"

আমার নয়নের উপর যেন অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া উঠে, এবং মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য করে। আমি যখন মানস-চক্ষে দেখি,—

"গৌরবর্ণ এক শিশু নাচিয়া বেড়ায়"।

তখন আমি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নির্নিমেষ নয়নে সেই অপরূপ রূপ-সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করি,—মনে মনে তাঁহার সঙ্গে কত গৌর কথা কহি,—সে কথা আর কি বলিব? সে প্রেমানন্দ ভাষায় বর্ণনাতীত!

আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নাম ছিল শ্রীপাদ সীতানাথ গোস্বামী তর্কপঞ্চানন। শান্তিপুরনাথ গৌর-আনা-গোসাঞির নাম ছিল শ্রীশ্রীসীতানাথ বেদপঞ্চানন। শ্রীশ্রীসীতানাথ-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর নামের সহিত তোমার অমিয়মাখা নামের এই অপূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্য মিলন দেখিয়া আমার মানস-সমুদ্রে অনেক সময়ে নানাবিধ ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হয়। এই সকল ভাব-তরঙ্গের স্রোতে পড়িয়া আমি মধ্যে মধ্যে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যাই। তুমি আমার পূজ্যপাদ অগ্রজ,—আমি তোমার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী একান্ত অনুগত ও পদাশ্রিত ছোট ভাই। তুমি গৃহত্যাগ করিয়া তোমার প্রাণ সর্ব্বস্বধন প্রাণ-গৌরাঙ্গের সঙ্গে নীলাচলে ছিলে,—এখনও আছ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা গ্রন্থখানি তোমার পরম পবিত্র নামের স্মৃতিচিহ্নের নিদর্শন স্বরূপ তোমারই শ্রীকরকমলে সাদরে সমর্পিত হইল। তুমি তোমার এই অযোগ্য জীবাধম কুলাঙ্গার ও মূর্খ ছোট ভাইটির কথা তাঁহার শ্রীচরণকমলে 'সময়' ও 'সুযোগ' বুঝিয়া নিবেদন করিবে। তোমার চরণকমলে ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ কুঞ্জ
২০ই আশ্বিন ১৩৩৩ সাল
গৌরাব্দ ৪৪০

তোমার কৃপাভিখারী স্নেহের ভাই—

হরিদাস

* ভ্রমবশতঃ "ত্রিংশ অধ্যায়" দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে।

অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়।

নবত্রিংশৎ অধ্যায়।

চত্বারিংশৎ অধ্যায়।

একচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

চতুঃচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

ষষ্ঠচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ষষ্ঠপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ঊনষষ্ঠিতম অধ্যায়।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা।

পঞ্চম খণ্ড।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দামোদর পণ্ডিতের বাক্য দণ্ড, মহাপ্রভুর প্রতি—

"তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে"

প্রভু বাক্য,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

দামোদরপণ্ডিতের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মহাপ্রভু নীলাচলে বসিয়া তাঁহার সহিত একটি অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন। মহাপ্রভুর লীলা-রহস্যের গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর; কি জন্য কোন লীলা প্রকট করেন, তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার লীলালেখকগণ কৃপাসিদ্ধ সাধুপুরুষ, তাঁহারাই লীলারহস্য ভেদ করিতে সমর্থ। বাহ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া লীলারস আস্বাদনে আমরা যে আনন্দ পাই, ব্রহ্মানন্দ তাহার নিকট তুচ্ছ বস্তু। শ্রীভগবানের নিগূঢ় লীলারহস্য ভেদ একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপাসিদ্ধ ভক্তগণই করিতে পারেন। আমরা ক্ষুদ্র জীব,—ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া ভগবত লীলার যদি বাহ্য অর্থ কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তাহা হইলেই কৃতার্থ মনে করিব। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি॥

শ্রীভগবান তাঁহার ভক্তকে কখন কখন দণ্ড করেন, তাঁহার ভক্তগণও যে তাঁহাকে কখন কখন দণ্ড করেন, তাহাও মহাপ্রভু তাঁহার অপূর্ব্ব লীলারঙ্গে দেখাইয়াছেন। ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভু সামান্যাপরাধের জন্য কি ভাবে কঠিন দণ্ড আদেশ করি[illegible] পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে গৌরভ[illegible]মোদরপণ্ডিত স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি বি[illegible] বাক্য দণ্ড করিলেন, তাহাই বর্ণিত হইবে।

দামোদরপণ্ডিত মহা[illegible]নুগত ভক্ত। তিনি নদীয়ার ভক্ত,—আজন্ম [illegible] মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দামোদর মনে[illegible] উদাসীনবৃত্তি অবলম্বন [illegible]

নীলাচলে প্রভুসেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা। সকলেই গৌরাঙ্গগতপ্রাণ,—সকলেই বিরক্ত বৈষ্ণব। কনিষ্ঠ শঙ্করপণ্ডিত। ইহাঁর কথা পরে বলিব। সকল ভ্রাতাই পরম পণ্ডিত। দামোদরপণ্ডিত মহাপ্রভুর সকল লীলাই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি মুরারি গুপ্তের বাল্য বন্ধু। মুরারি গুপ্তের করচা মহাপ্রভুর লীলার আদি গ্রন্থ। এই শ্রীগ্রন্থ সরল সংস্কৃত শ্লোকে গ্রথিত। এই শ্লোকগুলি দামোদর পণ্ডিতের রচিত। মুরারি গুপ্ত প্রভুর লীলাকথা মুখে দামোদরের নিকট বর্ণনা করেন, এবং দামোদরপণ্ডিত তাহা শ্লোকবদ্ধ করেন। ইনি স্পষ্টবক্তা এবং নিরপেক্ষ মহাপুরুষ ছিলেন। উচিত কথা বলিতে কাহাকেও তিনি ছাড়িতেন না ইহাকে নিরপেক্ষ ও স্পষ্টবাদী বলিয়া সকলেই বিশেষরূপে জানিতেন এবং সকলেই তাঁহাকে ভয় করিতেন। স্বয়ং মহাপ্রভুও তাঁহাকে ভয় করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার সময় মহাপ্রভু এই দামোদর পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

> আমিত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
> সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥
> ইহাঁর আগে আমি না জানি ব্যবহার।
> ইহাঁর না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥
> লোকাপেক্ষা নাহি ইহাঁর কৃষ্ণ কৃপা হৈতে।
> আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে॥ চৈঃ চঃ

এ হেন গুণনিধি দামোদরপণ্ডিতের সহিত মহাপ্রভু নীলাচলে বসিয়া যে অদ্ভুত লীলারঙ্গটি করিয়াছিলেন, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে একটি পরম সুন্দর পিতৃহীন উড়িয়া ব্রাহ্মণ বালকের সহিত মহাপ্রভুর বড় সম্প্রীতি হইয়াছিল। কিন্তু দামোদর পণ্ডিতের তাহা একেবারেই ভাল লাগিত না। সেই পরম সুন্দর বিপ্রকুমারটি মহাপ্রভুর বাসায় নিত্য আসিত, তিনি তাহাকে স্নেহ করিতেন,—ভাল বাসিতেন,—তাহার সহিত কথা কহিতেন—তাহার গাত্রে শ্রীকরকমল স্পর্শ করিয়া সোহাগ আদর করিতেন। সেই বালকটিও প্রাণের সহিত মহাপ্রভুকে ভালবাসিত। বালস্বভাব মহাপ্রভু এই বালকটি লইয়া নীলাচলে লীলারঙ্গ করিতেন। দামোদরপণ্ডিত এই বিপ্রবালকটিকে প্রভুর নিকটে দেখিলেই মনে মনে বিরক্ত হইতেন,—তাহাকে খিস্ খিস্ করিতেন। তাহাকে গোপনে বাসায় আসিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু সে মহাপ্রভুকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। বালকগণ যেখানে ভালবাসা পায়,—আদর সোহাগ পায়,—সেই খানেই যায়। মহাপ্রভু তাহাকে আদর করেন, প্রসাদ দেন, সে নিত্য তাঁহার নিকট আসে। দামোদর পণ্ডিতের কথা সে শুনে না। ইহাতে তিনি মনে দুঃখ পান (১)। কেন দুঃখ পান, তাহা তাঁহার কথাতেই পরে প্রকাশ পাইবে।

একদিন এই বিপ্রবালকটি মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়াছে। তিনি তাহার সহিত পরম প্রীতিসহকারে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। দুই জনে যেন কোন সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, এই রূপ বোধ হইতেছে। দামোদর পণ্ডিত সেদিন ইহা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বালক চলিয়া যাইলে তিনি মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া ক্রোধভরে কহিলেন—

> "অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহোঁ গোসাঞিির ঠাঞি।
> গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি॥
> এবে গোসাঞির যশ সর্ব্ব লোকে গাইবে।"
> এবে গোসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হইবে॥ চৈঃচঃ

(১) পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ কুমার।
পিতৃশূন্য, মহা সুন্দর মৃদু ব্যবহার॥
প্রভু স্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভু সঙ্গে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার॥
প্রভুকে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদর তারে প্রীতি সহিতে না পারে॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণ কুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে॥
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহা প্রীতি।
যাহা প্রীতি তাঁহা আইসে বালকের রীতি।
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তিনি এ কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিলেন না। দামোদরপণ্ডিতের কথাগুলি হেঁয়ালি বলিয়াই তাঁহার বোধ হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া প্রথমে তাঁহার মুখের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে পরম নম্র হইয়া কহিলেন "দামোদর! ব্যাপারটাকি খুলিয়া বল। আমি কি অপরাধ করিলাম?"। দামোদরপণ্ডিত তখন ক্রোধ কম্পান্বিত কলেবরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

দামোদর কহে "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতের মুখ কে পারে আচ্ছাদিতে॥
পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।"
লোক কানা-কাণি বাতে দেহ অবসর॥ চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া নিরপেক্ষ দামোদরপণ্ডিত নীরব হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে এই স্পষ্ট কথা শুনিয়া প্রভুর তখন চমক ভাঙ্গিল। তিনি মনে মনে তাঁহার এই স্পষ্টবাদিতার জন্য মহা সন্তুষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলেন, এবং মনে মনে বিচার করিলেন,—

ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ॥ চৈঃ চঃ

তিনি দামোদর পণ্ডিতকে তখন আর কোন কথা না বলিয়া সেদিন মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে চলিয়া গেলেন। দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখের মধুর হাসি ও ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার কথায় মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হন নাই। এই ঘটনার পর দুই চারি দিন চলিয়া গেল। একদিন কৃপানিধি প্রভু দামোদরপণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন—

——দামোদর! চলহ নদীয়া।
মাতাব সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা॥
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যেনা হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন্ কেবা হয়॥
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তোমার আগে নাহি কারও স্বচ্ছন্দাচরণে॥
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাঁহা করিবে গমনে।" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু দামোদরপণ্ডিতকে নবদ্বীপে যাইয়া তাঁহার জননীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কৃপাদেশ করিলেন। এই কৃপাদেশের নিগূঢ় কারণও আছে। দামোদরপণ্ডিত নীলাচলে মহাপ্রভু-সেবায় ব্রতী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারই আদেশে তাঁহার মাতৃসেবায় নিযুক্ত হইবেন। মহাপ্রভুর এই যে কৃপাদেশ-বাণী, ইহার ভিতরে একটি পরম গুহ্য কথা আছে। তাঁহার নবীনা ঘরণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নবদ্বীপে জননীর নিকট আছেন,—জননী এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছেন,—উপযুক্ত অভিভাবক গৃহে আর কেহই নাই। দামোদরপণ্ডিতের নিকট বাক্যদণ্ড পাইয়া মহাপ্রভুব নিজ গৃহসংসারের কথা মনে পড়িল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন এমন নিরপেক্ষ অভিভাবক আর কোথায় পাইবেন? পতিবিরহবিধুরা নবযুবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রকৃত রক্ষক এবং অভি-ভাবক এই দামোদর পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না। তাই চতুরচূড়ামণি মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন "তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি দেখি আন"। মহাপ্রভু তাঁহার জননীর নাম করিয়া কথাটি বলিলেন, কারণ সন্ন্যাসী,—স্ত্রীর নাম পর্য্যন্ত তিনি করিতে পারেন না। তাঁহার মনের ভাব এই যে, দামোদর পণ্ডিত তাঁহার বক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষক এবং অভিভাবক হইয়া নবদ্বীপে বাস করিবেন। ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, এবং এই জন্যই তাঁহার এই কৃপাদেশ। দামোদরপণ্ডিত মহা সৌভাগ্যবান পুরুষ,—তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রভুসেবা হইতে বঞ্চিত

হইলেন বটে, কিন্তু কৃপানিধি মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার পূজনীয়া মাতৃসেবা এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবা উভয় সেবাই দিলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে দামোদরপণ্ডিতই সর্ব্ব প্রধান,—এই জন্যই এই উচ্চাধিকার মহাপ্রভু তাঁহাকেই দান করিলেন। তিনি শ্রীমুখেই বলিয়াছেন,—

"দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ।"

এই অত্যান্তিক প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে দামোদরপণ্ডিত যে দায়িত্ব পূর্ণ উচ্চ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তাহার তুলনা নাই। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়াসেবা শ্রীগৌরাঙ্গসেবা হইতেও উচ্চ। শ্রীগৌরভগবান তাঁহার নিজ সেবক অপেক্ষা তাঁহার ভক্ত-সেবককে অধিকতর ভাল বাসেন,—ভক্তজনের ভক্তই তাঁহার প্রিয়। একথা তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন (১)।

দামোদরপণ্ডিত মহাপ্রভুর এই কৃপাদেশবাণী শ্রবণ করিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। কোন কথাই বলিতেছেন না। তিনি কি ভাবিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। মহাপ্রভুর চরণসেবা ছাড়িয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে যাইতে হইবে, এ আদেশ তাঁহার পক্ষে বড় কঠিন বলিয়া বোধ হইল। তিনি মহাপ্রভুকে আত্মদান দিয়াছেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে এই আজ্ঞা দিলেন কেন, তিনি বোধ হয় ইহাই ভাবিতেছেন। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতকে যে কার্য্যের ভারটি দিলেন, তাহা অতি গুরুতর। তাঁহাকে ছাড়িয়া দামোদরপণ্ডিত নবদ্বীপে যাইবেন, ইহাতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা, এবং মনদুঃখ হইবে, তাহা তিনি জানেন,—কিন্তু তিনি নিজের সুবিধা, অসুবিধা, দুঃখ কষ্টের জন্য কিছুই ভাবেন না। তাঁহার যত চিন্তা ভক্তজনের জন্য। দামোদরপণ্ডিতের মত নিরপেক্ষ, বিশ্বাসী এবং একান্ত অনুগত প্রিয়তম ভক্ত ভিন্ন কাহার উপর তিনি বৃদ্ধা জননী ও নবীনা ঘরণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিতে পারেন?

(১) যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে পুনরায় কহিলেন—

মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখকথায় সুখী করিও তাঁহারে ॥ চৈঃ চঃ

দুঃখিনী জননীর কথা স্মরণ করিবামাত্র মাতৃভক্তচূড়ামণি করুণানিধি মহাপ্রভুর কমল নয়ন দুইটি অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি ছল ছল নয়নে দামোদরপণ্ডিতকে কহিলেন তুমি নবদ্বীপে যাইয়া আমার স্নেহময়ী জননীকে কহিবে—

নিরন্তর নিজকথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাতে ॥
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও।
আর গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইও ॥ চৈঃ চঃ

প্রেমবিহ্বলভাবে মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতকে নির্জ্জনে নিকটে ডাকিয়া গোপনে এই সকল গুহ্য কথা গুলি বলিলেন। মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত উক্তি সকল তাঁহার জননীর প্রতি,—তিনি দামোদর পণ্ডিতকে দিয়া জননীকে বলিতেছেন—

"বারে বারে আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য বিরহে তাহা স্বপ্ন করি মান ॥
এই মাঘ সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পিঠা, পায়স রান্ধিলা ॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
মোর স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ান ॥
আস্তে ব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাই দেখি তোমার সুখ উপজিল ॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছি শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখিলা যেন নিমাই খাইল ভাত ॥
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ নাহি লাগাইল এই জ্ঞান হইল ॥
পাক পাত্র দেখি সব অন্ন আছে ভরি।
পুন ভোগ লাগাইলা স্থান সংস্কার করি ॥
এত মত বার বার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধ প্রেমে মোরে করে আকর্ষণ ॥

তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লঞা যায় আমা তোমার প্রেমবলে॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া প্রেমাশ্রুনয়নে মাতৃভক্তশিরোমনি মহাপ্রভু দামোদরপণ্ডিতকে পুনরায় কহিলেন,—

এই মত বার বার করাইও স্মরণ।
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিও চরণ॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু যে এই পরম গুহ্য কথাটি বলিলেন,—এটি তাঁহার আবির্ভাব-লীলারঙ্গের কথা। জননীর মন্দিরে নদীয়ায় যে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইত, তাহাই প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে তিনি শ্রীমুখে দামোদরপণ্ডিতকে বলিলেন। পূর্ব্বে আর একবার তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকেও এই কথা বলিয়াছিলেন। বিজয়াদশমীর দিন তিনি ঠিক এই ভাবেই জননীর মন্দিরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রদত্ত ঠাকুরের ভোগান্নব্যঞ্জন খাইয়া আসিয়াছিলেন।

দামোদরপণ্ডিতের মুখে এখন পর্য্যন্ত কোন কথা নাই,—তিনি মহাপ্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিতেছেন,—আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন।

প্রভুর আদেশ যে অলঙ্ঘনীয়, তাহা দামোদরপণ্ডিত বুঝিয়াছেন। সুতরাং কথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজনবোধে তিনি নীরবে আছেন। মহাপ্রভু গোবিন্দকে দিয়া শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ আনাইলেন। নদীয়ার ভক্তদিগের জন্য এবং জননীর জন্য পৃথক করিয়া এই মহাপ্রসাদ দামোদরপণ্ডিতের হস্তে দিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে বিদায় করিলেন। বিদায় কালে ভক্তবৎসল মহাপ্রভু পুনরায় তাঁহাকে গোপনে কি বলিলেন। কান্দিতে কান্দিতে দামোদরপণ্ডিত মহাপ্রভুর চরণধূলি লইয়া বহির্ব্বাসে বান্ধিলেন। এই চরণধূলিই তাঁহার সম্বল হইল। শোকাবেগে তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। সেই দিনই তিনি নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন।

দামোদর পণ্ডিত দ্বারা মাতৃভক্তশিরোমনি মহাপ্রভু তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে কত কথা বলিয়া দিলেন। তাঁহার বিরহ-বিদগ্ধা ঘরণীর কথা মুখে কিছু বলিলেন না বটে, অন্তরে অন্তরে কপট সন্ন্যাসীঠাকুরের তখন যে মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইল, তাহার প্রকাশ হইল,—তাঁহার কার্য্যে। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র প্রদত্ত বহুমূল্য পট্টসাড়ী প্রসাদ দামোদরপণ্ডিতের মারফৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্য তিনি নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। দামোদরপণ্ডিত প্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত; তাঁহার দ্বারা তিনি জননী ও ঘরণীর সহিত সম্বন্ধ রাখিতেন। প্রতি-বৎসর দামোদরপণ্ডিত নীলাচলে আসিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপের সমাচার দিতেন, জননীরও ঘরণীর সকল কথাই বলিতেন, তাহাদিগের প্রদত্ত ভোজ্যবস্তু সকল আনিয়া তাঁহাকে দিতেন। ইহাতে তিনি মনে বড় সুখ পাইতেন। শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও সুখ পাইতেন। দামোদরপণ্ডিত এইভাবে পারিবারিক সম্বন্ধে মহাপ্রভুর গুপ্তসংবাদ বাহকের কার্য্য করিতেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াসেবাধিকার মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণে বংশী-বদন ঠাকুরকে দিয়াছিলেন,—এক্ষণে তাহা দামোদরপণ্ডিতকে দিলেন। এই দুইজন মহাজনের ভাগ্য শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত।

দামোদরপণ্ডিত কিরূপে মহাপ্রভুর কৃপাদেশ পালন করিয়াছিলেন, কি ভাবে তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবা করিতেন, তাহা শুনিলে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারা যায় না,—কাষ্ঠ পাষাণ পর্য্যন্ত দ্রব হয়। শচীমাতার অপ্রকটের পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার অন্তঃপুরের গৃহদ্বার একেবারে রুদ্ধ করিলেন। সেখানে প্রবেশাধিকার কাহারও ছিল না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অন্তরঙ্গা সখি একমাত্র কাঞ্চনমালা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। মহাপ্রভুর পুরাতন ভৃত্য ঈশান এবং দামোদর পণ্ডিত কেবল শ্রীমন্দিরের বহির্বাটিতে থাকিতেন। দামোদরপণ্ডিতও অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার মাজা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কুব্জদেহে কোন প্রকারে চলেন। কিন্তু প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গা হইতে দুই কলস জল আনিয়া অতি কষ্টে মই দিয়া অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রাতঃস্নানের জন্য শ্রীমন্দিরের বারান্দায় রাখেন, এবং তাঁহার সেবার জন্য যাহা কিছু গঙ্গাজল লাগে দামোদর স্বয়ং তাহা সকলি আনেন। প্রত্যেকবারেই প্রাচীরে সিঁড়ি লাগাইয়া উঠিতে হয়, তবে ভিতরে যাইতে পারা যায় (১)। কারণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আদেশে

(১) ভিতরে পুরুষমাত্র যাইতে না পায়।
দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আজ্ঞায়॥

পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন—

অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ।
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন॥
"রাম" দুই অক্ষর ইহা নয় ব্যবহিত।
প্রেম বাচী "হা" শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥ (১)
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥

এই বলিয়া হরিদাসঠাকুর পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

অর্থ। শুকদেব রাজাপরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন অজামিল নামা কোন এক ব্যক্তি পুত্রের নামে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়াছিল। এই জন্য তাঁহার বৈকুণ্ঠপদ লাভ হয়। সুতরাং শ্রদ্ধাসহকারে ঐ নাম উচ্চারণ করিলে যে বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে তাহাতে আর বক্তব্য কি?

শ্রীগৌর ভগবান হরিদাসঠাকুরের মুখে নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে গদ গদ হইলেন।

শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ জাতির লক্ষণ লিখিত আছে, যথা—

(১) নামৈকং যস্য বাচি স্মরণ পথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়েত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা-লোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিঃক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ পদ্ম পুরাণ

অর্থ,- শ্রীভগবানের যে কোন একটি নাম যদি প্রসঙ্গক্রমে বাগিন্দ্রিয়ে প্রবৃত্ত অথবা মন স্পর্শ করে, কিম্বা কর্ণ গোচর হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধ বর্ণ অথবা ব্যবহিত, কিম্বা কোন অংশে রহিত হইলেও নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে, সকল অপরাধ হইতে এবং সংসার হইতেও উদ্ধার করে। কিন্তু যে সকল পাষণ্ড ধন জন দেহ পুত্র কলত্র প্রভৃতিতে বিমুগ্ধ, তাহাদিগের হৃদয়ে এই নাম নিক্ষিপ্ত হইলে কদাচ আশু ফল প্রদ হয় না।

গোমাংস খাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥

এই যে ম্লেচ্ছবংশ শুধু মুসলমান জাতি তাহা নহে, ইংরেজ, ফরাসি, প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ জাতিও ম্লেচ্ছ। মুসলমান "হা রাম" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ম্লেচ্ছ জাতি তাহা করে না। তাহারা "হা রাম" শব্দের পরিবর্ত্তে ইংরাজিতে "Oh God" (ওগড) শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। "Oh" ইংরাজি শব্দ আমাদের "হা" শব্দের প্রতিবাক্য এবং প্রেমবাচী। ইংরাজি (God) শব্দটিতে তিনটি অক্ষর আছে। "গোর" নামেও তিনটি অক্ষর আছে। ইংরাজিতে গ, ও এবং ড অক্ষর সংযুক্ত "গড" (God) বাঙ্গলার গ উ এবং র সংযুক্ত "গৌর" নামের অপভ্রংশ মাত্র। অতএব শ্বেতাঙ্গ ম্লেচ্ছগণ যে "Oh God" বলে, তাহাতে "হা গৌর" নামের আভাস পাওয়া যায়। মুসলমানেরা যেমন "হা রাম" বলিয়া নামাভাসে উদ্ধার লাভ করে, তদ্রূপ শ্বেতাঙ্গ ম্লেচ্ছ জাতিও "হা গৌর" বলিয়া উদ্ধার লাভ করে। হরিদাসঠাকুর যদি ইংরাজ জাতির মুখে এই "Oh God" ("ওগড") শব্দটি শুনিতেন, তাহা হইলে এই সঙ্গে মহাপ্রভুকে একথাটিও বলিতেন। নামাভাসে মুক্তি হয়,—শ্রীগৌরাঙ্গের নামাভাসে ইংরেজ জাতিও উদ্ধার হইতেছে,—একথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে, গৌরতত্ত্ব তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারিলে, শ্রীগৌরভগবানের চরণে—তাহাদিগের যে দৃঢ় ভক্তি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিদাস ঠাকুর শুধু মুসলমানদিগের উদ্ধারের কথা বলিলেন, তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুরাধম অন্য এক নব্য হরিদাসনামধারী জীবাধম মহাপ্রভুর চরণে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টিয়ান ম্লেচ্ছদিগের উদ্ধারের কথা নিবেদন করিল। ইহাও মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই হইল। (১)

(১) হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাক রূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্য দেবস্য॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

শ্রীগৌরভগবান ভঙ্গী করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—

"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন"॥ চৈঃ চঃ

ভক্তচূড়ামণি হরিদাসঠাকুর করযোড়ে মহাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন যথা. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

হরিদাস কহে "প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গমের আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গম সেই হয়ত শ্রবণ॥
শুনিয়াই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগে প্রতিধ্বনি হয়।
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন।
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম।
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাহা কহিয়াছেন আমাতে॥
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন॥
জগত তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিয়া প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলে সংসার।

মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া প্রেমানন্দে কহিলেন "হরিদাস! তুমি যাহা বলিলে সকলি সত্য। বল দেখি সর্ব্বজীব যদি এইরূপে মুক্তিলাভ করে তবে এই ব্রহ্মাণ্ড কি করিয়া চলিবে? ব্রহ্মাণ্ড যে জীবশূন্য হইবে" (১)।

হরিদাস ঠাকুর প্রভুর প্রশ্নের কি সুন্দর উত্তর দিলেন শ্রবণ করুন।

হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মর্ত্তে স্থিতি।
তাবৎ যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবে॥
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যায় লইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া।
অবতার তুমি তৈছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের খণ্ডাইল সংসার॥ (১)
তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের করিলে নিস্তার॥
যে কহে চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক মোর পুনঃ এইত নিশ্চয়॥
তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু॥

অন্তর্যামী শ্রীগৌরভগবান হরিদাস ঠাকুরের কথায় বিশেষভাবে প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার এই গূঢ় লীলারহস্য হরিদাস ঠাকুর কি করিয়া জানিলেন, এই ভাবিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। একথা মহাপ্রভু নিজ মনের মধ্যেই রাখিলেন। প্রকাশ করিয়া কিছু না বলিয়া দুই বাহু প্রসারণ করিয়া প্রেমভরে তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন-দানে কৃতার্থ করিলেন।

---

(১) প্রভু কহে সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে জীব শূন্য হবে॥ চৈঃ চঃ

(১) ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থ। শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, রাজন্! যোগেশ্বরেশ্বর জন্মরহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণে এরূপ বিস্ময়ভাব প্রকাশ করিও না। তাঁহা হইতে, সচরাচর সকলেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

অয়ং হি ভগবান দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতস্তু
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিল সুরাসুরাদি দুর্লভং ফলং
প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতামিতি॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।

অর্থ। শ্রীকৃষ্ণভগবান তাঁহার দ্বেষকারীদিগকে সুরাসুরাদির দুর্লভফল (মুক্তি) প্রদান করিয়া থাকেন, তখন ভক্তবর্গকে যে সেই ফল প্রদান করিবেন, ইহাতে কি বক্তব্য আছে।

এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ় লীলা হরিদাস কেমনে জানিল॥
মনের সন্তোষে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্য প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন। চৈঃ চঃ

হরিদাস ঠাকুর প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে পুলকিতাঙ্গ হইলেন,—অতিকষ্টে আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া প্রেমানন্দে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। গুণনিধি মহাপ্রভু তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় যাইয়া নিজ ভক্তগণের নিকট শতমুখে হরিদাস ঠাকুরের গুণকীর্ত্তন করিলেন (১)। শ্রীভগবানের গুণ গাইয়া ভক্তের প্রাণে যে সুখ হয়, ভক্তের গুণ গাইয়া ভগবানের প্রাণে তাহা অপেক্ষা শতগুণ সুখ হয়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার"।

হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য কথা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ছাড়া কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে এই মহাপুরুষের আরও দুই তিনটি মহাত্ম্য-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ তাহা কৃপা করিয়া পাঠ করিবেন। সাক্ষাৎ ভগবত-শক্তি যোগমায়া পরমাসুন্দরী মোহিনীমূর্ত্তি রমণীর বেশ ধারণ করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর তখন যুবাপুরুষ, বিকট বৈরাগ্য লইয়া বেণাপোলের নির্জ্জন বনে একটী কুটীরে নাম-ব্রহ্মের ভজন করিতেন। তিনি যখন এই মায়া-দেবীর বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন যোগমায়া তাঁহার সম্মুখে স্ব-স্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার।
আমি মায়া করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার।
ব্রহ্মাদি জীব মুঞি সবারে মোহিল॥
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল।
মহা ভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণনাম শ্রবণে॥
চিত্ত শুদ্ধ হইল, চাহি কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা।
সর্ব্বজীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এই বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে তার কভু নাহিক নিস্তার॥
পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তি হেতু তারক হয়েন রাম নাম।
কৃষ্ণনাম পারক করেন প্রেম দান॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসায় যৈছে এই প্রেম বন্যা॥"

এত বলিয়া ভগবৎ—শক্তি মায়াদেবী হরিদাস ঠাকুরের চরণে পড়িলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে তারকব্রহ্ম হরিনাম দান করিয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন (১)।

এই সকল লীলা-কাহিনী অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যেহেতু-

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে।
লক্ষ্মী আদি করি কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হৈয়া।
নাম-প্রেম আস্বাদিল মনুষ্য জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা! আপনি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেম-রস আস্বাদন॥
মায়া দাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময়।
সাধু কৃপা না করিলে প্রেম নাহি হয়।

(১) তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্তপাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শত মুখ হঞা॥ চৈঃ চঃ

(১) এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥ চৈঃ চঃ

চৈতন্য গোসাঞির লীলার এই ত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব।
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, করে নাম সঙ্কীর্তন॥ চৈঃ চঃ

হরিদাস ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্র কাহিনী লিখিতে লিখিতে পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

তর্ক না করিহ তর্ক অগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি॥

হরিদাস ঠাকুরের মহিমা অনন্ত। তাঁহার মাহাত্ম্য কাহিনী সকল বর্ণনা করিবার শক্তি কাহারও নাই। আত্ম শোধনের জন্য যিনি যাহা পারিয়াছেন, বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এই মহাপুরুষের তিরোভাবের অপরূপ কথা বর্ণিত হইবে। ইহা অতি অদ্ভুত কাহিনী।

মহাপ্রভু নীলাচলে ভক্তবৃন্দসহ পরমানন্দে আছেন। দিবাভাগে তিনি নৃত্যকীর্তন করেন, শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন। রাত্রিতে স্বরূপগোসাঞি এবং রায় রামানন্দকে লইয়া কৃষ্ণকথা রসাস্বাদন করেন। কৃষ্ণবিরহানলে মহাপ্রভুর হৃদয় যখন দগ্ধ হয়, স্বরূপগোসাঞি এবং রায় রামানন্দ কৃষ্ণকথা-রস দ্বারা তাঁহার বিরহানল নির্বাপিত করেন। এই দুই জন রাত্রিকালে মহাপ্রভুর সহায়। দিবাভাগে কোন প্রকারে মহাপ্রভু নৃত্যকীর্তন করিয়া অতিবাহিত করেন, কিন্তু রাত্রিতে তাঁহাকে লইয়া বিষম বিপদ হয়। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় না।

দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয়॥ চৈঃ চঃ

অন্তরঙ্গভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া রাত্রিতে অতিব্যস্ত হন। দিবাভাগে প্রভু কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হন। ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথা কহেন, সকলের সংবাদ লয়েন

হরিদাস ঠাকুর এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহার বাসায় এক্ষণে নিত্য যাইতে পারেন না। গোবিন্দ একদিন প্রসাদ লইয়া হরিদাস ঠাকুরের বাসায় যাইয়া দেখিলেন তিনি শয়ন করিয়া মন্দ মন্দ সংখ্যানাম সঙ্কীর্তন করিতেছেন। গোবিন্দ তাঁহাকে বলিলেন "ঠাকুর! উঠুন, প্রসাদ গ্রহণ করুন"। হরিদাস ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

——————"আজি করিব লঙ্ঘন।
সংখ্যা কীর্তন নাহি পূরে কেমনে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমনে উপেক্ষিব।" চৈঃ চঃ

এই বলিয়া তিনি মহাপ্রসাদ বন্দনা করিলেন এবং তাহা হইতে এক কণিকা মাত্র লইয়া ভক্ষণ করিলেন। হরিদাস ঠাকুর সেদিন উপবাসী রহিলেন। একথা দয়ানিধি মহাপ্রভুর কর্ণে গেল। পরদিন তিনি হরিদাস ঠাকুরের বাসায় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিদাস! তুমি ভাল আছ ত?"

"সুস্থ হও হরিদাস" তাঁহারে পুছিল।

হরিদাস ঠাকুর প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন—

"শরীর অসুস্থ নহে মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন"।

অর্থাৎ তিনি শারীরিক ব্যাধি প্রভৃতির কোন উল্লেখই করিলেন না,—দোষ দিলেন কেবলমাত্র তাঁহার মন ও বুদ্ধির। একমাত্র বৈষ্ণবের মুখেই এই সকল কথা শুনিতে পাইবে এবং তাঁহাদের মুখেই ইহা শোভা পায়।

মহাপ্রভু উত্তরে কহিলেন—"হরিদাস! ওকথা এখন থাক, তোমার কি ব্যাধি, প্রকাশ করিয়া বল দেখি শুনি।" হরিদাস ঠাকুর কান্দিতে কান্দিতে করযোড়ে উত্তর করিলেন "প্রভু হে! অধমতারণ হে! তুমি ত সকলি জান, তোমার অবিদিত ত কিছুই নাই। সংখ্যানাম কীর্তন আর আমা-দ্বারা পূর্ণ হয় না, সেই দুঃখে আমি মরমে মরিয়া আছি। দয়ানিধে! আমার মত পতিত অধমের গতি কি হইবে? তুমি অগতির গতি, এই সময়ে আমার একটা গতি কর"। এই বলিয়া বৃদ্ধ হরিদাস ঠাকুর বালকের ন্যায় কান্দিয়া মহাপ্রভুর চরণতলে দীঘল হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

সর্বজ্ঞ শ্রীগৌরভগবান সকলি জানেন, কিন্তু দেখাইতেছেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। ইহাই তাঁহার লীলা-রঙ্গ। তিনি ভক্তদুঃখে বিশেষ কাতর হইলেন বটে, কিন্তু

মুখে সে ভাব প্রকাশ করিলেন না। হরিদাস ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম কীর্ত্তন না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। এতকাল ধরিয়া এইরূপ ভজনসাধন তিনি করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে বৃদ্ধকালে শরীর অপটু হইয়াছে,—আর সংখ্যানাম জপ পূর্ণ করিতে পারেন না,—সেই দুঃখে মধ্যে মধ্যে উপবাসী থাকেন। ভজনবিজ্ঞ মহাপুরুষের ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? হরিদাস ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনিয়া ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর কোমল হৃদয় দ্রব হইল, তিনি নিজ মনভাব গোপন রাখিয়া তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে ভক্তমহিমা কীর্ত্তন করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

> প্রভু কহে "বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
> সিদ্ধদেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেন ধর॥
> লোক নিস্তারিতে তোমার এই অবতার।
> নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
> এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন।" চৈঃ চঃ

একে ত সংখ্যানাম জপ তিনি পূর্ণ করিতে পারেন না বলিয়া মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত, তাহার উপর মহাপ্রভুর এই স্তুতি-বাক্য, হরিদাস ঠাকুরের প্রাণে যেন আত্মগ্লানির বিষ ঢালিয়া দিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার চরণ-তলে নিপতিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—

> হীন জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
> হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর॥
> অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
> রৌরব হৈতে কাড়ি বৈকুণ্ঠে চড়াইলে।
> স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
> জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়॥
> অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
> বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥ চৈঃ চঃ

ভক্তবৎসল মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের এই দৈন্যোক্তি ও আর্ত্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া, এবং তাঁহার বিষাদপূর্ণ শুষ্ক বদনের প্রতি চাহিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখ পাইলেন। তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বহিল,—তিনি আর উত্তর করিতে পারিলেন না। নীরবে হরিদাসের মুখের প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। প্রভুকে দেখিয়া হরিদাস ঠাকুরের হৃদয়-সমুদ্র আজ প্রেমতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়াছে। তাঁহার মনের সাধ, প্রভুর রাতুল চরণদু'খানি বক্ষে ধারণ করিয়া, তাঁহার চন্দ্রবদনখানি দর্শন করিতে করিতে তাঁহার পতিতপাবন নাম জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে করিতে যেন তাঁহার জীবন-বায়ু বহির্গত হয়, তাঁহার দেহযষ্টিখানি যেন প্রভুর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া রহে। হরিদাস ঠাকুরের এই মনের সাধটি সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভুর অবিদিত নাই। তিনি এই সাধটি পূর্ণ করিবেন, ইহাই তাঁহার সংকল্প। ভক্তের মনের বাসনা ভগবান কখন অপূর্ণ রাখেন না। শ্রীগৌরভগবানের প্রেরণায় হরিদাসঠাকুর তাঁহার মনের বাসনাটি আজ প্রকাশ করিয়া তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন। তিনি কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণ ধরিয়া কহিলেন,—

> এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
> লীলা সম্বরিবে তুমি মোর লয় চিত্তে॥
> সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
> আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
> হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
> নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন।
> জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
> এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥
> মোর ইচ্ছা এই, যদি তোমার প্রসাদে হয়।
> এই নিবেদন মোর, কর দয়াময়।
> এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমার আগে।
> এই বাঞ্ছা সিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥" চৈঃ চঃ

নিজ সংকল্প সিদ্ধ করিতে এবং ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে চতুরচূড়ামণি ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান ভক্ত-চূড়ামণি হরিদাস ঠাকুরের মুখ দিয়া এই শেষ কথাগুলি বলাইলেন। কিন্তু কলির প্রচ্ছন্নঅবতার তথাপিও প্রচ্ছন্ন রহিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি অতিশয় মধুর বচনে হরিদাস ঠাকুরের হাত দুইখানি ধরিয়া ছলছল নয়নে কহিলেন "হরিদাস! তুমি যাহা চাহিবে কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে

তাহাই দিবেন, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া কি তোমার উচিত? তোমাদের লইয়াই ত আমার যাহা কিছু সুখ" (১)। এই কথা বলিতে বলিতে প্রেমাশ্রুধারায় মহাপ্রভুর বক্ষ ভাসিয়া গেল। মহাপ্রভুর এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য, তাঁহার এই যে নাম-প্রেম-প্রচার লীলারঙ্গ—নামমাহাত্ম্য প্রচার-কার্য্য, তাহা কেবল হরিদাসকে লইয়াই। এই কলিযুগে তিনি তাঁহার নামে অনন্ত শক্তি নিহিত করিয়াছেন। নামাচার্য্য হরিদাসঠাকুরই তাঁহার এই নামপ্রেমপ্রচার ও দানলীলার প্রধান সহায়। হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বজ্ঞ, সিদ্ধপুরুষ, তিনি বুঝিয়াছেন মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করিবেন, কিন্তু তাহার অগ্রে তিনি দেহত্যাগ করিতে বাসনা করেন। কারণ তিনি প্রভুর সেই অন্তর্দ্ধান লীলারঙ্গ দেখিতে চাহেন না। চতুর চূড়ামণি ভক্তবৎসল মহাপ্রভু ভক্তের সেই কথা উঠাইয়া কহিলেন "হরিদাস! তোমাকে লইয়াই আমার এই অবতারের লীলা। তুমি যদি চলিয়া যাও আমিও চলিব"। ইহাই ভক্ত ভগবানের প্রীতি বাক্যালাপ হয়। চতুরে চতুরে যখন বাক্যালাপ হয়, তখন এই ভাবেই হয়। শ্রীভগবান চতুর চূড়ামণি, কিন্তু ভক্ত তাঁহাদের কৃপায় তাঁহার চতুরতার রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ, এবং ভক্তগণ এই চতুরতায় ভগবানের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহাকে সময়ে সময়ে ভক্তের নিকট এ বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

হরিদাস ঠাকুর প্রভুর শ্রীমুখের স্নেহমাখা বাণী শুনিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন। তিনি প্রভুর চরণ ধরিয়া কহিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

চরণে ধরি হরিদাস কহে না করিহ মায়া।
অবশ্য অধমে প্রভু করিবে এই দয়া॥
মোর শিরোমণি হয় কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটি-ভক্ত হয়॥
আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাহাঁ হানি হৈল॥
ভক্তবৎসল তুমি মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পুরাবে প্রভু মোর এই আশ॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু আর কোন কথা কহিলেন না। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগৌরভগবান ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সতত তৎপর। তিনি দেখিলেন হরিদাসের অন্তিম সময় উপস্থিত, এই সময়ে ভক্তের প্রতি ভক্তবৎসল ভগবানের যাহা শেষ কার্য্য, তাহা করিতে হইবে। কিভাবে সেই কার্য্যটি করিবেন অন্যমনস্ক হইয়া তাহা ভাবিতে ভাবিতে মহাপ্রভু সেদিন মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় তিনি ঠাকুর হরিদাসকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। হরিদাস ঠাকুর দেখিলেন মহাপ্রভুর নয়নজলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সিক্ত হইল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গস্পর্শে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল, পুলকিত প্রাণ শীতল হইল,—মন সুস্থির হইল। মহাপ্রভুকে বিদায় দিয়া তিনি পুনরায় শয়ন করিয়া মন্দ মন্দ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া সকল ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আসিলেন। অন্য দিন তিনি একাকী আসেন, আজ তিনি সর্ব্ব ভক্তগণ সঙ্গে আসিলেন কেন, তাহা ভক্তগণ কেহ বুঝিতে পারিলেন না। ভক্তগণ মনে করিলেন, আজ কোন বিশেষ লীলারঙ্গ তিনি প্রকট করিবেন। হরিদাস ঠাকুরের প্রাঙ্গনে যখন মহাপ্রভু সপরিকরে উদয় হইলেন, তিনি বুঝিলেন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দয়াময় শ্রীগৌরভগবান তাঁহার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি শয়ন করিয়া মন্দ মন্দ নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, মহাপ্রভুকে দেখিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। শয়নাবস্থাতেই করযোড়ে তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে শয়ন করিয়াই সর্ব্বভক্তগণেরও যথারীতি চরণবন্দনা করিলেন।

"হরিদাস বন্দিল প্রভু আর বৈষ্ণব চরণ"।

মহাপ্রভু তাঁহার শিয়রের নিকটে আসন পরিগ্রহ

(১) প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমায় লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া॥ চৈঃ চঃ

করিয়া শ্রীকর-কমলে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া সস্নেহে মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিদাস! ভাল আছ ত?"

ক্ষীণ কণ্ঠে হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন "প্রভু হে! দীনশরণ হে! পতিতপাবন হে! তোমার কৃপা প্রসাদে এ অধমজনার কি কোন অমঙ্গল হইতে পারে? তুমি সর্ব্ব মঙ্গলময়, তোমার পরিকরবৃন্দ মঙ্গলনিধান। তুমি যখন কৃপা করিয়া সপার্ষদে এই সময়ে এই পতিত অধমের সম্মুখে আসিয়া উদয় হইয়াছ, আমার আর কোন চিন্তাই নাই। আজ আমার বড় শুভদিন! প্রভু হে! সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর হে! এই দীনহীন পতিত অধম দাসানুদাসের প্রতি তোমার অসীম করুণা। তোমার করুণার অবধি নাই। আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাঙ্গণে তুমি সপার্ষদে আজ নৃত্যকীর্ত্তন কর। আমি নয়ন ভরিয়া তোমার মধুর মনমোহন নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া জীবন সার্থক করি। আমার নয়নে যেন পলক না পড়ে, তোমার চরণকমলে অন্তিম সময়ে যেন আমার পলকহীন নয়নদ্বয় লিপ্ত হইয়া থাকে, তুমি আমাকে এই বর দান কর"।

হরিদাস ঠাকুরের কাতরোক্তি শুনিয়া ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর কোমল হৃদয় মথিত হইল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি আঙ্গিনার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার নয়নের ধারায় বক্ষ ভাসিয়া গেল। আজানুলম্বিত বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া তিনি ভুবনমঙ্গল উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে কুটীর হইতে আঙ্গিনায় বাহির করিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। স্বরূপ গোসাঞি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ হরিদাস ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া বেড়াকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন (১)। মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমে শতমুখে হরিদাস ঠাকুরের গুণ ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্ত-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তের ভগবান প্রেমানন্দে আত্মহারা হইলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

> হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা শতমুখ।
> কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহা সুখ॥

ভগবানের শ্রীমুখে ভক্ত মহিমা-শ্রবণে উপস্থিত ভক্তগণের হৃদয়েও প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিল। সকলে মিলিয়া তাঁহার ভক্তচূড়ামণি হরিদাস ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিলেন।

> হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
> সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥

হরিদাস ঠাকুর ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া আঙ্গিনার মাঝে শয়ান আছেন,—মন্দ মন্দ নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন,—এবং মনে মনে মহাপ্রয়াণের উদ্যোগ করিতেছেন। মহাপ্রভু প্রেমানন্দে কীর্ত্তন করিতেছেন,—সর্ব্বভক্তগণ তাহাতে যোগ দিয়াছেন। মহাসঙ্কীর্ত্তনধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উঠিতেছে। স্বর্গে দেবগণ অলক্ষ্যে কলির যুগধর্ম্ম মহাসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা অলক্ষ্যে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। করুণাময় মহাপ্রভু প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে হরিদাস ঠাকুরের প্রতি ঘন ঘন শুভ কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেছেন। মহাপ্রেমোন্মাদ্যত হরিদাস ঠাকুরে ইঙ্গিত করিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া বসাইলেন। অতি ক্ষীণকণ্ঠে, নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে মহাপ্রভুর কমল চরণ দুইখানি ধারিয়া কহিলেন "প্রভু হে! দীনশরণ হে! পতিতপাবন হে! এস! আমার হৃদয়বল্লভ! আমার হৃদয়ে এস। অন্তিমকালে নয়ন ভরিয়া একবার আমি তোমার চন্দ্রবদনখানি জনমের মত দেখিয়া লই,—তোমার ঐ অজভব-বন্দিত লক্ষ্মীসেবিত রাঙ্গা চরণ দুইখানি হৃদয়ে ধারণ করি,—তোমার মধু হইতে মধুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম একবারে জনমের মত জিহ্বায় উচ্চারণ করি। এস হৃদয়ের ধন, হৃদয়ে এস, এস" এই বলিয়া ভক্তচূড়ামণি হরিদাস ঠাকুর কি করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

> হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভু বসাইল।
> নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥

(১) অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহা সঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
স্বরূপ গোসাঞি আদি প্রভুর যত গণ।
হরিদাসে বেড়ি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ চৈঃ চঃ

দেখিতেছেন, প্রেমাশ্রু ধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে উচ্চকণ্ঠে এক একবার কেবল "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনি করিতেছেন। তাহার পর ভক্তগণ কি করিলেন শ্রবণ করুন—

ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥ চৈঃ চঃ

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান তখন শ্রীহস্তে অঞ্জলি ভরিয়া বালুকা উঠাইয়া হরিধ্বনি করিয়া হরিদাস ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে দিলেন।

হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়॥ চৈঃ চঃ

সকলে মিলিয়া তখন সমুদ্রতীরে হরিদাস ঠাকুরের জন্য সুন্দর একটি বালুকার সমাধিমন্দির করিলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে বালুকার আবরণ দিলেন।

তাঁরে বালু দিয়া তার উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডায় মহা আবরণ কৈল॥ চৈঃ চঃ

সমুদ্রতীরে এই বালুকার সমাধিমন্দির অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সর্ব্বভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভু তখন পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাহার পর মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে সমুদ্রস্নান করিয়া জলকেলি লীলারঙ্গ করিলেন। স্নানান্তে সপার্ষদে তিনি পুনরায় হরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ভক্তগণ প্রণাম করিলেন। সর্ব্বশেষে মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে সপরিকরে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মন আজ উদাস,—তিনি আনমনা হইয়া ইতি উতি চাহিতেছেন, নয়নে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা বর্ষণ হইতেছে। সিংহদ্বারে আনন্দবাজারে নানাবিধ পশারীর দোকান বসিয়াছে। সকলেই মহাপ্রভুকে চিনে। ভক্তবৎসল প্রভু আমার তাঁহার বহির্ব্বাসের অঞ্চল পাতিয়া তাঁহার ভক্তচূড়ামণি হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসবের জন্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন তিনি সজলনয়নে গদগদকণ্ঠে যখন বলিলেন—

হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥ চৈঃ চঃ

তখন তাঁহার ভক্তবিরহকাতর শ্রীমুখের প্রতি চাহিয়া দোকানী পশারী সকলেই প্রেমবিহ্বল হইয়া চাঙ্গারি সুদ্ধ উলটাইয়া তাঁহার শ্রীকরকমলে প্রসাদ দিতে উদ্যত হইল। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তখন ইঙ্গিতে দোকানী পসারীদিগকে নিষেধ করিলেন, তবে তাহারা ক্ষান্ত হইল (১)। তিনি মহাপ্রভুকে বলিলেন "প্রভু হে! তুমি বাসায় চল। আমি ভিক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছি।" ভক্তবৎসল মহাপ্রভু স্বরূপ গোসাঞির মুখের প্রতি চাহিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বরূপ দামোদরও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ভক্তগণের সঙ্গে মহাপ্রভুকে তিনি বাসায় পাঠাইলেন। তাঁহার তাৎকালিক মনের ভাব তাঁহার অন্তরঙ্গ এবং মর্ম্মী ভক্ত স্বরূপ দামোদর বুঝিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর ইচ্ছা, তিনি ভাল করিয়া হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব সম্পন্ন করেন। তিনি ভিখারী সন্ন্যাসী, তাঁহার ভিক্ষা ভিন্ন অন্য সম্বল নাই,—তাঁহার মনের আশা কি করিয়া পূর্ণ হইবে? তাই স্বয়ং ভগবান স্বয়ং অঞ্চল পাতিয়া ভক্তের তিরোভাব উৎসবের জন্য ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি জানেন, তিনি স্বয়ং ভিক্ষায় বাহির হইলে সর্ব্বলোকে বহু পরিমাণে ভিক্ষা দিবে,—বহু দ্রব্যসম্ভার একত্রিত হইবে,—মহা সমারোহে তিনি হরিদাসের তিরোভাব মহোৎসব করিবেন। ভক্তচূড়ামণি স্বরূপ দামোদর গোসাঞি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের শ্রীহস্তে ভিক্ষার ঝুলি দিতে ইচ্ছা করিলেন না,—এই দৃশ্য তাঁহার মনে ভাল লাগিল না। ভক্তগণ থাকিতে শ্রীগৌরভগবান স্বয়ং কেন এরূপ ভিক্ষা করিবেন? ইহা ভাবিয়া তিনি মহাপ্রভুকে ভিক্ষাকার্য্য

(১) শুনি পসারী সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হৈয়া॥
স্বরূপ গোসাঞি পসারীরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারী পসারে বসিল॥ চৈঃ চঃ

হইতে নিবস্ত করিয়া বাসায় পাঠাইলেন। তাহার পর তিনি এই মহামহোৎসবের আয়োজন কিরূপে করিলেন তাহা শ্রবণ করুন —

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিল॥
স্বরূপ গোসাঞি কহিলেন সব পসারীরে।
এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জা দেহ মোরে॥
এইরূপে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লঞা আইলা চারি জনের মস্তকে চড়াইয়া॥ চৈঃ চঃ

শুধু ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। বাণীনাথ এবং কাশীমিশ্র ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিলেন, অন্ন উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে যেন মহাপ্রভুর বাসায় পাঠান হয়। কাশীমিশ্র ঠাকুর রাজগুরু,—শ্রীমন্দিরের প্রসাদের সমস্ত ভারই তাঁহার উপর। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের আদেশ, মহাপ্রভুর জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, বিনা বাক্যব্যয়ে অকাতরে তাহা দিবে। ভারে ভারে জগন্নাথের উত্তম উত্তম প্রসাদ মহাপ্রভুর বাসায় পৌছিল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিল।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইল॥

মহাপ্রভুর বাসায় উত্তম উত্তম প্রসাদ আসিয়া স্তূপীকৃত হইল,—তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি স্বয়ং সর্ব্ব বৈষ্ণবগণকে সারি সারি পাতা দিয়া পঙ্গতে বসাইলেন। চারিজন মাত্র ভক্ত লইয়া তিনি স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এই চারি জন ভক্ত, স্বরূপ গোসাঞি, জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশীশ্বর পণ্ডিত এবং শঙ্কর পণ্ডিত। ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প বস্তু উঠে না,—তিনি কাহাকেও অল্প করিয়া দিতে পারেন না,—

"মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।"

এক এক জনের পাতে তিনি পাঁচ জনের আহার্য্য বস্তু ঢালিয়া দিতেছেন (১)। ইহা দেখিয়া স্বরূপ গোসাঞি তাঁহাকে কহিলেন "প্রভু হে! তুমি মহোৎসব দর্শন কর। আমরা পরিবেশন করিতেছি"।

স্বরূপ কহে প্রভু! বসি কর দরশন।
আমি ইহাঁ সবা লঞা করি পরিবেশন॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু ভোজনে না বসিলে কেহ ভোজনে বসিতে পারেন না এই জন্য স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। মহাপ্রভুকে সেদিন কাশীমিশ্র ঠাকুর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং প্রসাদ লইয়া আসিয়াছেন। সকলের অনুরোধে মহাপ্রভু পুরী এবং ভারতী গোসাঞির সহিত অগত্যা ভোজনে বসিলেন। তখন বৈষ্ণবগণ মহানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রেমানন্দে সকলের সঙ্গে ভোজন করিতেছেন, আর কেবল শ্রীমুখে "দেহ দেহ" শব্দ করিতেছেন। তাঁহার সহিত এক পঙক্তিতে পরম প্রেমরঙ্গে সর্ব্ববৈষ্ণবগণ সেদিন আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করিলেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভু প্রেমানন্দে উচ্চ হরিধ্বনি করিতেছেন, এবং শতমুখে হরিদাস ঠাকুরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। সর্ব্ববৈষ্ণবগণ তাঁহার সঙ্গে "জয় হরিদাস" রবে দিগন্ত পূর্ণ করিতেছেন। এইরূপে ভোজন মহামহোৎসব শেষ হইলে সকলে যথাবিধি আচমন করিলেন। তাহার পর মহাপ্রভু স্বহস্তে সর্ব্ব বৈষ্ণবগণকে মাল্যচন্দন পরাইলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে যে বরদান করিলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহাদিগের মন প্রাণ শীতল হইল এবং কর্ণ জুড়াইয়া গেল। মহাপ্রভুর এই পরম মঙ্গল বরদান-বাণীটী কি, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যেই তাঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যেই তাঁরে বালু দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যে বা করিলা ভোজন॥
অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি। চৈঃ চঃ

বৈষ্ণবগণ প্রভুর শ্রীমুখের এই শুভাশীর্ব্বাদ-বাণী শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর কথা [illegible] শেষ হয় নাই। তিনি পুনরায়

(১) সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইল সারি সারি।
আপনি পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
এক এক পাতে পঞ্চ জনের ভক্ষ্য পরিবেশে

সর্ব্বভক্তগণ সমক্ষে গদগদ কণ্ঠে হরিদাস ঠাকুরের গুণ গাহিয়া কহিলেন—

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছা মাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্কামণ।
পূর্ব্বে যে শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্য হৈল মেদিনী॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া ভক্তবৎসল মহাপ্রভু সজলনয়নে সর্ব্ব বৈষ্ণবগণের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার আজানুলম্বিত বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন—

————"জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিলা প্রকাশ॥ চৈঃ চঃ

সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনে যোগ দিলেন; মহাপ্রভু ভঙ্গী করিয়া মধুর মনমোহন নয়নরঞ্জন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেখানে প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিল। সেই তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত সমস্ত নীলাচলবাসীর গৃহে গৃহে লাগিল। সমগ্র নীলাচলবাসী বৈষ্ণববৃন্দ হরিদাস ঠাকুরের শোকে অধীর হইলেন।

ভক্তগণ মহাপ্রভুর বাসা হইতে সেদিন অপরাহ্নে বিদায় হইলেন। তিনি তখন একটু বিশ্রাম করিলেন।

"হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা"।

প্রভুর হর্ষ কেন? কারণ তিনি স্বয়ং স্বহস্তে হরিদাস ঠাকুরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সকল সমাধান করিতে সুযোগ পাইলেন। বিষাদ,—শ্রেষ্ঠ ভক্তবিরহে। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য [illegible] সম্বন্ধ তাহা মহাপ্রভু স্বয়ং আচরিয়া ভক্তগণকে [illegible] াইলেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসী শিরোমণি॥
শেষ কালে দিল তাঁরে দর্শন স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনি নর্ত্তন।
আপনি শ্রীহস্তে কৃপায় বালু তাঁরে দিল (১)।
আপনি প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহা ভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।
এই সৌভাগ্য লাগি আগে করিলা প্রয়াণ॥

হরিদাস ঠাকুরের সৌভাগ্যের অবধি নাই। তাঁহার মত সৌভাগ্যবান্ মহাপুরুষ এ জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই সাধ করিয়া কি ঠাকুর বৃন্দাবনদাস গাহিয়াছেন—

সকৃৎ যে বলিবেক হরিদাস নাম।
সত্য সত্য সে যাইবেক কৃষ্ণ ধাম॥ চৈঃ ভাঃ

কবিরাজ গোস্বামী হরিদাসঠাকুরকে প্রণাম করিয়াছেন,—

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুং
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

—:*:—

নীলাচলে প্রদ্যুম্নমিশ্র, রায় রামানন্দ এবং মহাপ্রভু।

সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥

(১) শ্রীনিবাস আচার্য যখন শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তৎপূর্ব্বেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সমুদ্রতীরে হরিদাস ঠাকুরের এক সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যথা ভক্তিরত্নাকর তৃতীয় তরঙ্গে,—"শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কূলে গেলা; হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিলা॥ ভূমেতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর। ভাগবতগণ শ্রীসমাধি সন্নিধানে শ্রীনিবাসে স্থির কৈল মধুর বচনে॥ পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া। যে বিলাপ কৈল তা শুনিতে দ্রবে হিয়া॥" হরিদাস ঠাকুরের সমাধি ক্ষেত্রে কিঞ্চিদধিক দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ অদ্বৈত মূর্ত্তিত্রয়ের সেবা সংস্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রাপাড়ার ভ্রমরবর নামক জনৈক উৎকল ভক্তের আনুকূল্যে স্বর্গদ্বারে সেখানে একটী স্থায়ী শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয়। এই সেবা টোটা গোপীনাথের সেবাইত গোস্বামীগণের পর্য্যবেক্ষণে ছিল। ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া অন্যের হস্তগত হইয়াছে এবং তাঁহারাই সেবা চালাইতেছেন।

ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাবের পর মহাপ্রভু কয়েক দিন বড়ই ভক্তবিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। যাহাকে দেখেন, তাঁহাকে ধরিয়া হরিদাসের অনন্ত গুণের কথা বলেন,—তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন। হরিদাসের নাম করিলে প্রভুর কমল নয়ন দুটি অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়। হরিদাস বিহনে তিনি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। নিত্য তিনি হরিদাসের কুটীরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেন, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পরম প্রীতির জ্বলন্ত নিদর্শন হরিদাস ও মহাপ্রভু। ভক্তকে ভগবান না দেখিয়া থাকিতে পারেন না—দর্শন দিবার ছল করিয়া তাঁহার প্রাণের হরিদাসকে মহাপ্রভু নিত্য দেখিয়া আসিতেন। হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাবের পর দিবস হইতে মহাপ্রভু কয়েক দিবস যাবৎ সমুদ্রস্নান বন্ধ করিলেন। কারণ সে পথে যাইলেই হরিদাসের কুটীর দ্বার দিয়া যাইতে হইত। হরিদাস নাই,—তাঁহার শূন্য ভজনকুটীরখানি পড়িয়া আছে। ভক্তবৎসল কোমলহৃদয় মহাপ্রভু আর সে দিকে চাহিতে পারেন না। তিনি এক্ষণে নিজ বাসায় থাকেন, জগন্নাথ দর্শন করেন,—কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহেন না। তাঁহার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করেন না। স্বরূপ দামোদর গোসাঞি তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকেন,—তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনান,—তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণকথা কহেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু কিন্তু সর্ব্বদাই যেন কেমন অন্যমনা ভাবে থাকেন,—স্বরূপ গোসাঞি জানেন মহাপ্রভুর হৃদয় হরিদাস-বিরহ-বাণে জর্জ্জরিত,—তাঁহার মন হরিদাসের সঙ্গাভাবে সদাই খিন্ন। তাঁহার শ্রীবদন দেখিলেই বোধ হয় তিনি যেন পুত্র-শোকে জর্জ্জরিত। ভক্ত ও ভগবানের যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য,—তাহা কখনই ছিন্ন হইতে পারে না। শ্রীগৌর ভগবান নরবপু ধারণ করিয়া নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। নরলীলা সর্ব্বোত্তম লীলা। তাই প্রভু স্বয়ং আচরিয়া এই সর্ব্বোত্তম নরলীলার সকল অঙ্গ সম্যক্‌ভাবে অভিনয় করিতেছেন। ভক্তগণই ভগবানের পুত্র। হরিদাস বিহনে আজ শ্রীগৌরভগবান দুর্জ্জয় পুত্রশোক পাইয়াছেন। হরিদাসের বিরহে সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের মনে নিরানন্দের উদয় হইয়াছে। লোকশিক্ষার জন্য শিক্ষাগুরু শ্রীভগবানের এই লৌকিকী লীলারঙ্গ। তিনি এই লীলারঙ্গে দেখাইলেন ভক্তবিরহ শ্রীভগবানের পক্ষেও অসহনীয়। ভক্তের একমাত্র দুঃখ ভগবত-বিরহ—শ্রীভগবানেরও একমাত্র দুঃখ ভক্ত-বিরহ। নির্ব্বিকার শ্রীভগবান শোকদুঃখের অতীত হইলেও অবতার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ভক্তবিরহানলে দগ্ধ হইতে হয়, কারণ তিনি ভক্তসঙ্গ ভিন্ন থাকিতে পারেন না,—ভক্তের জন্য সকলি সহ্য করিতে পারেন

জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥ চৈঃ চঃ

এই সময়ে একদিন শ্রীপাদ প্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীহট্ট হইতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি মহাপ্রভুর পরমাত্মীয়। তাঁহার পিতৃব্যকুল শ্রীহট্টে বাস করিতেন। এই পবিত্র বংশে এই মহাপুরুষের জন্ম। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী,—তিনি জ্ঞাতি কুটুম্বের সম্পর্ক রাখেন না। সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করেন। শ্রীপাদ প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নাম শুনিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহেন,—আলাপ পরিচয় করেন। কিন্তু তিনি শুনিলেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা কহেন না। তাই তিনি তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—

"শুন প্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাঞাছি তোমার দুর্ল্লভ চরণ
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয়।" চৈঃ চঃ

শ্রীপাদ প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট আত্মগোপন করিলেন। তিনি যে সম্বন্ধে মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি একথ বলিতে সাহস

করিলেন না। কারণ বিরক্ত-সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর নিকট এসকল গ্রাম্যকথা। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু সকলি জানেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার সহিত জাতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন শ্রীপাদ প্রদ্যুম্নমিশ্রের মনে কিছু অভিমান আছে। তিনি মুখে যাহাই বলুন,—অন্তরে অন্তরে এই অভিমান পোষণ করেন। কারণ তিনি তাঁহার ভক্তগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে আসিয়াছেন। নীলাচলে তাঁহার অসংখ্য ভক্ত,—কৃষ্ণকথারসরঙ্গে তাঁহারা জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহারা এক একটী ধ্রুব প্রহ্লাদ। তাঁহাদিগের নিকট না যাইয়া প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে আসিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মনের দাম্ভিকতার ভাব কিছু অনুভূত হইতেছে। চতুর চূড়ামণি সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে কহিলেন—

"কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানেন, তাঁর মুখে শুনি॥
ভাগ্যে তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হৈল মন।
রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান। (১) চৈঃ চঃ

প্রদ্যুম্ন মিশ্র আর কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া সেই দিনই রায় রামানন্দের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন কৃষ্ণ-কথা শুনিতে তাঁহার মনে প্রবল বাসনা হইয়াছে,—তাঁহার উপর মহাপ্রভুর আদেশ,—তিনি আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া রায় রামানন্দের বাড়ীতে আসিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে রায় রামানন্দ অন্তঃপুরে দেবসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। প্রদ্যুম্নমিশ্রকে রায় রামানন্দের ভৃত্যগণ অতিশয় সম্মান সহকারে আসনে বসাইয়া পদ ধৌত করিয়া দিল। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "রায় রামানন্দ কোথায় আছেন? তাঁহার সহিত কখন দেখা হইতে পারে?"

(২) ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

সেবক উত্তর দিল 'তিনি নিভৃত উদ্যানে বসিয়া দেবদাসীগণকে নিজকৃত নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, তিনি এখনই আসিবেন" (১)। শ্রীপাদ প্রদ্যুম্নমিশ্র এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। রায় রামানন্দ পরম বৈষ্ণব,—মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র; তিনি নিভৃতে স্ত্রীলোক লইয়া নাটকাভিনয় করেন,—তাহাদিগকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দেন,—ইহা শুনিয়া তাঁহার মনে রায় রামানন্দের প্রতি কিছু অশ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন মহাপ্রভু কেন আমাকে ইহাঁর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে পাঠাইলেন? তিনি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন?

রায় রামানন্দ ব্রজের পরকীয়া মধুর রসের ভজনের কিরূপ উচ্চাধিকারী সাধক, তাহা মহাপ্রভু এবং তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সকলেই জানেন। প্রদ্যুম্নমিশ্র তাহা জানেন না। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী রসিকভক্ত রায় রামানন্দের দেবদাসী লইয়া গূঢ় ভজন-রহস্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল (২)। মহাপ্রভুর গণের মধ্যে রায় রামানন্দের

(১) দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে সুনিপুনা বয়সে কিশোরী॥
তাঁহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিখায় নর্ত্তনে॥ চৈঃ চঃ

(২) রামানন্দ রায় সেই দুই জন লঞা।
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জ্জন॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন॥
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী স্পর্শে রায়ের তৈছে স্বভাব॥
সেব্য বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করি আরোপন॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাবভক্তি প্রেম-সীমা॥
তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।

মত মধুর রসের উচ্চাধিকারী ভক্ত আর কেহ ছিলেন না। মহাপ্রভু একথা শ্রীমুখে স্বীকার করিয়াছেন—

"এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।"

প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দের বহির্বাটিতে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,—এমন সময় অন্দর মহল হইতে রায় রামানন্দ শীঘ্রগতি আসিয়া তাঁহাকে বড় সম্মান পূর্ব্বক চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন,—

বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল।
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাহা করোঁ তোমার কিঙ্কর॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দের সহিত প্রদ্যুম্নমিশ্রের প্রথম পরিচয়। বৈষ্ণবোচিত দৈন্য সহকারে তিনি তাঁহার কিঞ্চিৎ বিলম্বে আগমনজনিত অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় রামানন্দের বৈষ্ণবীয় দৈন্য দেখিয়া পরম মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভজন-বৃত্তান্ত শুনিয়া মনে মনে তাঁহার প্রতি যে একটু অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাহা আর দূর করিতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট আর কৃষ্ণকথা শুনিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। সে কথা আর না তুলিয়া তিনিও দৈন্যপূর্ণ বচনে বলিলেন "রামানন্দ রায়। তোমার নাম শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার দর্শন পাইলাম। ইহাতে আমি আপনাকে পবিত্র মনে করিলাম" (১)। এই যে কথাটি, ইহা সরল মনের কথা নহে। রায় রামানন্দ ভিতরের কথা কিছুই বুঝিলেন না। কিন্তু আত্মপ্রশংসা শুনিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। প্রদ্যুম্নমিশ্র আর কিছু না বলিয়া সেদিন সেখান হইতে এই ভাবেই বিদায় লইলেন।

পরদিন তিনি মহাপ্রভুর নিকট আসিতেই সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগৌর-ভগবান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রামানন্দের নিকটে কেমন কৃষ্ণকথা শুনিলেন?" প্রদ্যুম্নমিশ্র বদন অবনত করিয়া মহাপ্রভুর নিকট রামানন্দ রায় সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তিনি সরলভাবে সকল কথাই বলিলেন। তাঁহার ভাগ্যে রামানন্দের নিকট কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ কেন হয় নাই, তাহাও বলিলেন; অর্থাৎ তিনি স্পষ্টই মহাপ্রভুকে বলিলেন যে রায় রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিতে তাহার শ্রদ্ধা হইল না।

মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রদ্যুম্নমিশ্রের যখন এই সকল কথা হইতেছিল, সেখানে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাগুরু শ্রীগৌর ভগবান প্রদ্যুম্নমিশ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার সঙ্গ ভক্তগণকে উপদেশচ্ছলে কহিলেন—

"আমি ত সন্ন্যাসী আপনাকে বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার নহে যাহা আশ্চর্য্য কথন॥
একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের যত তার দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥

গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥
তবে সেই দুই জনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তার মন॥ চৈ চঃ

(১) মিশ্র কহে তোমা দেখিতে হৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দরশনে॥ চৈঃ চঃ

কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে কহি এক অনুমান।
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নহে মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেমভক্তি পায়
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদাই॥ (১)
যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তাঁর কায়॥
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাও তথা॥
মোর নাম লইও তিঁহ পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥" চৈঃ

রায় রামানন্দের এইরূপ গুণকীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভু প্রদ্যুম্নমিশ্রের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া কহিলেন—

"শীঘ্র যাহ যাবৎ তিনি আছেন সভাতে"।

রায় রামানন্দ এই সময়ে তাঁহার নিজগৃহের বহির্বাটিতে বসিয়া ভক্তসঙ্গ করেন, সেই জন্য মহাপ্রভু এই কথা বলিলেন। শ্রীপাদ প্রদ্যুম্নমিশ্রের আত্মাভিমান চূর্ণ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে শ্রীগৌরভগবান ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দকে

(১) বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থ। যিনি ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া বিশ্বাস যুক্ত হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তন করেন, তিনিই শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ করতঃ অচির মধ্যে ধৈর্য্য লাভ করিয়া হৃদয়ের রোগ কামকে পরিত্যাগ করেন।

ভজনরাজ্যের যে উচ্চ স্থান দিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ একান্ত প্রিয়তম নিজ ভক্তকেও তিনি এত উচ্চ স্থান দেন নাই। প্রদ্যুম্নমিশ্র তাঁহার আত্মীয়, অতি নিজজন: তাঁহার মনে অহঙ্কার রহিয়াছে, অভিমান আছে,—তিনি মহাপ্রভুর আত্মীয়, তিনি উচ্চ বংশসম্ভূত বিপ্র—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। রায় রামানন্দ বিষয়ী শূদ্র। মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত হইলেও প্রদ্যুম্নমিশ্র অপেক্ষা তিনি কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন। রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে যখন মহাপ্রভু তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই খট্‌কা লাগিয়াছিল। কিন্তু কি করিবেন, মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিবার তাঁহার শক্তি নাই। তিনি মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিলেন, কিন্তু রায় রামানন্দ সম্বন্ধে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার অভিমানপূর্ণ চঞ্চল চিত্ত অধিকতর চঞ্চল হইয়া পড়িল। রায় রামানন্দের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; তিনি কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। সরলচিত্ত বিপ্র সরল ভাবেই মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার মনের ভাব অকপটে প্রকাশ করিয়া সকল কথাই বলিলেন। শ্রীগৌরভগবান ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রায় রামানন্দ যে কি বস্তু, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন 'তুমি পুনরায় অতি শীঘ্র তাঁহার নিকট যাও; এক্ষণে তিনি বহির্বাটিতে আছেন, আমার নাম করিয়া তাঁহাকে সসম্মানে বলিও "আপনার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে তিনি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন"

প্রদ্যুম্নমিশ্র তখন বুঝিলেন প্রভুর এই আদেশ-বাণীর কিছু মর্ম্ম আছে—ইহাতে কিছু রহস্য আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ রায় রামানন্দের বাটির দিকে ছুটিলেন। উভয়ে পুনরায় মিলিত হইলেন। রায় রামানন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন।

"আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হৈল"।

প্রদ্যুম্নমিশ্রের চিত্ত তখন শুদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মনের খট্‌কা দূর হইয়াছে। মহাপ্রভুর কৃপায় তখন তাঁহার অভিমান দূর হইয়াছে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে কৃষ্ণকথা শুনিতে জীব অধিকারী হয় না, আর অভিমানশূন্য না হইলে

কৃষ্ণকথার রুচি হয় না। তিনি রায় রামানন্দকে মহাপ্রভুর আদেশবাণী জানাইলেন। রায় রামানন্দ প্রেমানন্দে বৈষ্ণবোচিত দৈন্য সহকারে করযোড়ে নিবেদন করিলেন—

"প্রভু আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।

ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা॥" চৈঃ চঃ

এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে নিভৃতে লইয়া বসিলেন এবং হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ! আপনি কি কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন আদেশ করুন"। প্রদ্যুম্নমিশ্র তখন কহিলেন "রায় রামানন্দ! তুমি বিদ্যানগরে গোদাবরী তীরে মহাপ্রভুর সহিত যে সকল তত্ত্বকথা কহিয়াছিলে, তাহা আমাকে ক্রমে ক্রমে বল। তুমি মহাপ্রভুরও উপদেষ্টা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভাল মন্দ কিছুই আমি প্রশ্ন করিতে জানি না। আমাকে দীনহীন ভিক্ষুক কৃষ্ণকথা-পিপাসু মনে করিয়া কৃপা করিয়া তুমি আপনিই যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই বল; আমি তোমার মুখে মধুর কৃষ্ণকথা শুনিয়া পিপাসিত কর্ণ শীতল করি" (১)। রায় রামানন্দের মুখে তখন মধুর কৃষ্ণকথারসের প্রস্রবণ ছুটিল,—রসসিন্ধু উথলিয়া উঠিল,—আপনিই প্রশ্ন করেন এবং আপনিই তাহার সিদ্ধান্ত সমাধান করেন। প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রেমাবিষ্টভাবে শ্রবণ করিতেছেন। তিনি যেন কৃষ্ণকথামৃত সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছে। বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়াছেন। এইরূপে দিনের তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল, তবুও কৃষ্ণকথা রস তরঙ্গের নিবৃত্তি হইল না।

"তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত"।

রায় রামানন্দের ভৃত্য আসিয়া তখন কৃষ্ণকথার রসভঙ্গ করিয়া কহিল "দিন হৈল অবসান"। রায় রামানন্দের তখন জ্ঞান হইল, দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে, ব্রাহ্মণ এখন পর্যন্ত অভুক্ত আছেন,—ইহা ভাবিয়া তিনি মহা লজ্জিত ভাবে অপরাধীর ন্যায় প্রদ্যুম্নমিশ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বহু সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র তখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া "কৃতার্থ হইলাম" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন—

"কৃতার্থ হইনু বলি মিশ্র নাচিতে লাগিল"।

প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে তিনি নিজ বাসায় আসিয়া তখন স্নানাহ্নিক ভোজনাদি সমাপন করিলেন। সেদিন সন্ধ্যাকালে তিনি পুনরায় মহাপ্রভু দর্শনে আসিলেন তাঁহার মনে আজ বড় আনন্দ। কৃপানিধি-মহাপ্রভু মধুর হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কৃষ্ণকথা কেমন শ্রবণ করিলেন"? তিনি প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে করযোড়ে মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—"প্রভু হে! তোমাকে আমি আর কি বলিব? তুমি আমাকে কৃষ্ণকথা রস-সাগরে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছ, আমি এখন হাবুডুবু খাইতেছি। কৃপানিধি হে! আমাকে যে কৃপা করিলে, তাহা বড় ভাগ্যে লাভ হয়। রায় রামানন্দ মনুষ্য নহেন"—তিনি সাক্ষাৎ রসময় রসিক কৃষ্ণভক্তস্বরূপ। তাঁহার মুখে যে কৃষ্ণকথা রস-তত্ত্ব শুনিলাম, তাহা ব্রহ্মারও অগোচর। তিনি আমাকে আরও বলিলেন—

কৃষ্ণ কথা বক্তা করি না জানিহ মোরে।

মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র।

যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণা-যন্ত্র।

মোর মুখে কহে কথা করে পরচার।

পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার॥ চৈঃ চঃ

রসনিধি হে! তুমি আমাকে আজ যে "অপূর্ব্ব কৃষ্ণকথারস পান করাইলে তাঁহার জন্য তোমার নিকট আমি চিরদিন চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম"। মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—

—"রামানন্দ বিনয়ের খনি।

আপনার কথা পর-মুণ্ডে দেন আনি॥

মহানুভবের এই স্বভাব হয়।

আপনার গুণ নাহি আপনি কহয়॥" চৈঃ চঃ

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

(১) অজ্ঞের কি কথা তুমি প্রভু উপদেষ্টা।
আমি ত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা॥
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখে কৃপা করি কহিবে আপনি॥ চৈঃ চঃ

ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তি-তত্ত্ব-প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নামমহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজরস প্রেমলীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥

প্রদ্যুম্নমিশ্রকে রায় রামানন্দের নিকট মহাপ্রভু যে কেন কৃষ্ণকথা শুনিতে পাঠাইলেন,—কৃপাময় পাঠকবৃন্দ এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। মন্দারে শ্রীমধুসূদন দর্শন করিতে যাইয়া জ্বর-প্রকাশ ছলে ভবরোগের মহৌষধ বিপ্র-পাদোদক পান করিয়া যে মহাপ্রভু বিপ্রভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই মহাপ্রভুই পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণ্য অহঙ্কারপূর্ণ জাত্যভিমান-গর্ব্বিত নিজ পরমাত্মীয় শ্রীপাদ প্রদ্যুম্নমিশ্রকে বিষয়ী শূদ্রের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে পাঠাইয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর সফলতা সাধন করিলেন।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ চৈঃ চঃ

পণ্ডিতাভিমানী, জাত্যাভিমানগর্ব্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সোঽহংবাদী সন্ন্যাসীদিগের অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নীচ-শূদ্রের দ্বারা বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রায় রামানন্দের মুখ দিয়া তিনি যে নিগূঢ় রসতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপর যুগের ঋষি মহাজন গণেরও অপরিজ্ঞাত ছিল। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তাহা জানিতেন না। রায় রামানন্দ গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তিনি অনাশক্তভাবে সংসার করিতেন। বিষয়ী হইয়াও তিনি নির্ব্বিষয়ী,—গৃহস্থ হইয়াও তিনি উদাসীন,—সংসারী হইয়াও তিনি অনাশক্ত মহাযোগী। তিনি যুক্তবৈরাগ্যবান মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত ছিলেন না,—বরঞ্চ ইন্দ্রিয়গণই তাঁহার বশীভূত ছিল। তিনি বিষয়ী হইয়াও সন্ন্যাসীগণকে তত্ত্ব উপদেশ দানে কৃতার্থ করিতেন (১) এই জন্য চতুর-চূড়ামণি মহাপ্রভু তাঁহার অনন্ত গুণরাশি এবং অপার মহিমা সকল ভক্তসমাজে প্রচার করিবার জন্য প্রদ্যুম্নমিশ্রকে তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা-রসতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অতিশয় গম্ভীর। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কোটীর মধ্যে এক জনের আছে কি না সন্দেহ। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা অমৃতের সিন্ধু, ইহার এক বিন্দুতে ত্রিজগত ভাসাইতে পারে। একথা পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্য-লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগত ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান॥

এমন যে অপূর্ব্ব রসপূর্ণ অপ্রাকৃত ভাববিশিষ্ট পরমাদ্ভুত শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা,—এমন যে প্রেমানন্দপূর্ণ হৃদয়-মন-স্নিগ্ধকারী অপরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,—যাহার আস্বাদনে, অনুশীলনে, এবং পঠন পাঠনে কলিহত জীব অপ্রাকৃত ব্রজরসাস্বাদনে অধিকারী হয়,—যাহার অচিন্ত্য প্রভাবে কলির জীবের ভব-বন্ধন দূর হয়,—সেই যে পরম মঙ্গল, ভুবনপাবনী মধু হইতেও মধু,—পরম ও চরম তত্ত্ব,—

"চৈতন্য চরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব,—বৈষ্ণব শাস্ত্র কহে এই মর্ম্ম॥

বল প্রেমানন্দে—গৌর হরি বোল!

---

(১) গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড় বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রে পাঠাইলা তাঁহা শ্রবণ করিতে॥ চৈঃ চঃ

পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর গ্রন্থ-সমালোচনা।

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণে নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

নদীয়ার অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার নাম এক্ষণে ভারত-ভূমির সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার মাহাত্ম্য ভারতের সর্ব্বস্থানে,—ব্যক্ত হইয়াছে। সর্ব্বদেশের লোক আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিতেছে,—তাঁহার সহিত একটি কথা কহিতে পারিলে,—একটিবার তাঁহার রাতুল চরণ দুই খানি দর্শন করিতে পারিলে,—সর্ব্বলোকে কৃতকৃতার্থ মনে করে। ভক্ত কবিগণ ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়া বহুদূর দেশ হইতে বহু পরিশ্রম করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করেন। পণ্ডিত স্বরূপদামোদর গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং প্রিয়তম পার্ষদ। ভক্ত কবিগণ প্রথমতঃ তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া নিজ নিজ গ্রন্থ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইবার জন্য তাঁহারই হস্তে প্রদান করেন। স্বরূপদামোদর গোস্বামী গ্রন্থের দোষ গুণ বিচার করিয়া যদি তাহা তাঁহার মনোমত হয়, তবে তিনি সেই গ্রন্থ মহাপ্রভুকে শুনান। সিদ্ধান্ত বিরোধপূর্ণ ও রসাভাসদর্শিত কোন বর্ণনা শুনিলে মহাপ্রভুর মনে সুখ হয় না,—তিনি হৃদয়ে দুঃখ পান,—এই জন্য স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই এই নিয়ম (১)। ভক্তকবি এবং পণ্ডিত লেখক-গণকে নীলাচলে আসিয়া এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর আশ্রয় লইতে হয়।

এই সময়ে জনৈক বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ একখানি নাটক লিখিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুকে শুনাইতে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্তিমান্ ও পরম পণ্ডিত। নাটকখানি তিনি সংস্কৃত ভাষাতে লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি যথেষ্ট কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ভগবান আচার্য্যের সহিত এই বঙ্গদেশীয় বিপ্রের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। ভগবান আচার্য্য এক্ষণে নীলাচলবাসী। তিনি মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। এই মহাপুরুষের কিছু পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। বঙ্গদেশীয় বিপ্র নীলাচলে আসিয়া ভগবান আচার্য্যের গৃহে অতিথি হইলেন এবং প্রথমে তাঁহার রচিত নাটকখানি তাঁহাকে শুনাইলেন। নীলাচলবাসী অনেক বৈষ্ণবও এই নাটক শুনিলেন। সকলেই একবাক্যে গ্রন্থের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সকলেরই মন হইল এই অপূর্ব্ব নাটকখানি মহাপ্রভু একবার শুনেন। সকলে ভগবান আচার্য্যকে অনুরোধ করিলেন,—তিনি যেন সুযোগ বুঝিয়া স্বরূপদামোদর গোস্বামীর হস্তে এই গ্রন্থখানি প্রদান করেন। ভগবান আচার্য্য একদিন স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর নিকট ভয়ে ভয়ে এই কথা উঠাইলেন। তিনি বলিলেন—

আদৌ তুমি শুন যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুকেও করাবে শ্রবণে॥ চৈ: চ:

স্বরূপ গোস্বামী পরম রসজ্ঞ এবং শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি বিচার না করিয়া কোন কথা বলেন না,—যে সে গ্রন্থ পাঠ করেন না। ভক্তিগ্রন্থ যদি রসাভাস ও সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধভাব দোষাদি বর্জ্জিত হয়, তবে তাহা পাঠ করেন। তিনি ভগবান আচার্য্যের কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন "ভগবান আচার্য্য! তুমি পরম উদার। যে কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে বা শুনিতে তোমার ইচ্ছা হয়। যে সে শাস্ত্র শুনিতেও তোমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমি এখনও তোমার মত উদার হইতে পারি নাই। যে সে কবির কাব্যে নানাস্থানে রসাভাস দোষ লক্ষিত হয় এবং সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অনেক কথাও থাকে।

(১) রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তাবিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই ত মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে॥ চৈ: চ:

তাহা শুনিলে মনের উল্লাস হয় না। রস এবং রসাভাসে যাহার বিচার জ্ঞান নাই, ভক্তিতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-সমুদ্র সে কি করিয়া পার হইবে? তুমি বলিতেছ এই গ্রাম্য কবির গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণলীলা কিম্বা শ্রীগৌরাঙ্গলীলা উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। উভয় লীলাই বিশেষ দুর্গম। গৌরকৃষ্ণচরণে যাহার দৃঢ়া ভক্তি নাই, তিনি লীলাগ্রন্থ লিখিতে পারেন না।

কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা যে করে বর্ণন।
কৃষ্ণগৌর পাদপদ্ম যার প্রাণ ধন। চৈঃ চঃ

এই বঙ্গদেশীয় কবি কি সেইরূপ কৃষ্ণভক্ত গ্রন্থকার? শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ যেরূপ দুইখানি কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তিরসপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিতে মনে অপার আনন্দ হয়। ভগবান আচার্য্য! তুমিও সে গ্রন্থদ্বয়ের মুখবন্ধ শুনিয়াছ। বল দেখি কিরূপ আনন্দ পাইয়াছ?"

স্বরূপ গোস্বামীর কথা শুনিয়া ভগবান আচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন "গোসাঞি! গ্রন্থখানি তুমি একবার শুন,—তুমি শুনিয়া গ্রন্থের ভাল মন্দ বিচার কর, এই আমার প্রার্থনা। স্বরূপ গোস্বামী সেদিন আর কিছু বলিলেন না, এবং গ্রন্থ শ্রবণেও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু ভগবান আচার্য্য ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনিও সেদিন আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। কিন্তু দুই তিন দিন পরিয়া তিনি স্বরূপ গোস্বামীকে এই বিষয়ে একান্তভাবে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা স্বরূপ গোস্বামীর গ্রন্থ শুনিতে ইচ্ছা হইল।

দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হইল॥ চৈঃ চঃ

তখন একদিন সকল ভক্তগণকে লইয়া তিনি গ্রন্থ শুনিতে বসিলেন। ভগবান আচার্য্যের মনে বড় আনন্দ। গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই নান্দীশ্লোক পাঠ করিলেন। গ্রন্থকারও একজন গৌরভক্ত। শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল (১)। এই শ্লোক শুনিয়া সকলেই মহানন্দে ভাগ্যবান গ্রন্থকারকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কারণ এই শ্লোকে তিনি

(১) বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতি জড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্য দেবঃ॥

অর্থ—যিনি স্বভাবত জড়নিখিল বিশ্বের চৈতন্য উৎপাদন করিবার জন্য কণককান্তি প্রকটন করিয়াছিলেন—যাঁহার নয়নযুগল প্রফুল্ল কমল তুল্য, সেই শ্রীজগন্নাথরূপ দেহে যিনি আত্মা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্লোকের অন্বয়। যঃ কনকরুচিঃ কনকস্য স্বর্ণস্য ইব রুচিঃ কান্তির্যস্য সঃ গৌর ইহ অস্মিন্ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিকচে প্রফুল্লে কমলে ইব নেত্রে যস্য তস্মিন্ শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে শ্রীজগন্নাথ ইতি সংজ্ঞা নামধেয়ং যস্য আত্মনি শরীরে আত্মতাং দেহিত্বং প্রপন্নঃসন্ অশেষং চতুর্দ্দশভুবনং প্রকৃতিজড়ং প্রকৃত্যা জড়ং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ প্রকটো বভুব সঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেব তব ভব্যং কল্যাণং দিশতু বিদধাতু।

ভাবার্থ—শ্রীজগন্নাথবিগ্রহকে দারুময় প্রতিমাজ্ঞানে বিলাসশীল এবং প্রাকৃত দ্রব্যগঠিত জড়বস্তুমত্তা মাত্র মনে করিলে অপরাধ হয়, যেহেতু ভক্তগণ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শন করেন।

যথাগ্নেবিস্ফুলিঙ্গা ব্যচরন্তি এই শ্রুতি বাক্যোদিত জীব স্ফুলিঙ্গ সদৃশ চিৎকণ। মায়াবশ জীবের জড় বদ্ধযোগ্যতা আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নরশরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার জড়াধীন ক্ষুদ্র জীবত্ব এরূপ নহে—তিনি মায়াধীশ পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবান যশোদানন্দন। তিনি মায়াধীশ হইয়াও যে মায়াবশ হন, ইহা তাঁহার বিচিত্র লীলারঙ্গ মাত্র। দুই স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবকে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু উভয়কে প্রপঞ্চান্তর্গত বিচার করায় একের প্রাকৃতদেহ অন্যের প্রাকৃত দেহে চিৎকণ প্রবেশ মনে করায় দুইস্থানে অপরাধ।

ঈশ্বরের দেহ স্বতন্ত্র এবং দেহী ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু স্বীকার করিলে অপরাধ হয়। প্রাকৃত জগতে গুণমায়াগঠিত বদ্ধ জীবের দেহসত্তা এবং জীবমায়াগঠিত জীবানুভূতি। ঈশ্বর ও বদ্ধজীবে ভেদ এই যে ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা ও কর্ম্মফলাধীন,—জীব বদ্ধাবস্থায় কর্ম্মফলভোক্তা ও ফলাধীন। ঈশ্বর মায়াবশ নহেন, বদ্ধ জীব মায়াধীন। ঈশ্বর অপরিমেয়,—জীব পরিমেয়। বদ্ধ জীবের নশ্বর অনিত্য দেহ মায়িক, শুদ্ধ জীবের অপ্রাকৃত দেহ নিত্য। শুদ্ধভক্তমাত্রেই শুদ্ধ জীব। মায়াতীত ঈশ্বর নিত্য সবিশেষ বিগ্রহ। প্রপঞ্চে নিত্য বিগ্রহ উদিত হইলে, তাহা কখনই প্রাপঞ্চিক ধর্ম্মবিশিষ্ট মায়িক নহে। নিত্য বিগ্রহকে নির্ব্বিশেষ করিবার ছলে দেহদেহীভেদ মনে করা অপরাধের কার্য্য।

ভক্তিবিনোদ ভাষ্য।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ণাবতারত্ব প্রমাণ করিয়া গুণগান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সচল জগন্নাথ বলিয়াছেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ভক্তিগ্রন্থ সমালোচক স্বরূপ গোস্বামী নীরব আছেন। নান্দী শ্লোক শুনিয়া তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইয়াছে। তিনি সক্রোধে গ্রন্থকারকে সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন—

> আরে মূর্খ! আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
> দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
> পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
> তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥
> পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান
> তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥
> দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
> অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে তার এই রীতি॥
> আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
> দেহ দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ॥
> ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহী ভেদ।
> স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥
> কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
> কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥ চৈঃ চঃ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সক্রোধ উচিত বাক্য শ্রবণে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সকলেই তখন বুঝিলেন গ্রন্থকারের প্রতি এই তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বথা উচিত হইয়াছে,—কারণ, গ্রন্থের দোষ অতিশয় গুরুতর এবং অমার্জ্জনীয়। তাঁহারা একবার স্বরূপ গোস্বামীর মুখের প্রতি চাহিতেছেন, আর একবার গ্রন্থকারের বিষণ্ণ বদনের প্রতি চাহিতেছেন। তিনি লজ্জা, ভয় ও বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। ব্রাহ্মণের দুঃখ দেখিয়া সকলেরই দুঃখ হইল। স্বরূপ গোস্বামীর মনও দ্রব হইল। তিনি তখন ক্রোধ সম্বরণ করিয়া এই বঙ্গদেশীয় বিপ্রকে কি উপদেশ দিলেন শুনুন—

> যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
> একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
> চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
> তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥
> তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
> কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥
> এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
> তোমার হৃদয়ের অর্থ দুঁহার লাগে দোষ।
> তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিয়া রীতি।
> সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি॥ চৈঃ চঃ

পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস গোস্বামী বঙ্গদেশীয় বিপ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া উপরিউক্ত তিনটি পয়ার শ্লোকে সর্ব্বজগতকে অতি সারগর্ভ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে এই সকল উপদেশ অতিশয় হিতকারী। কবিরাজ গোস্বামীর এই কয়টি উপদেশবাক্য সর্ব্বগৌরভক্তগণ যেন কৃপা করিয়া কণ্ঠহার করিয়া রাখেন। তিনি তিনটি অতি সার-গর্ভ কথা বলিয়াছেন। (১) বৈষ্ণবের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা কর্ত্তব্য। (২) শ্রীগৌরাঙ্গচরণে একান্তভাবে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তাঁহার চরণে একনিষ্ঠা ভক্তির প্রয়োজন এবং (৩) গৌরভক্তগণের সঙ্গ নিত্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বৈষ্ণবীয় ভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিদ্যাশিক্ষা সফল হইবে। ভাগবতশাস্ত্র ভক্তিশাস্ত্র। প্রকৃত ভক্তিমান্ বৈষ্ণব-পণ্ডিতের নিকট এই শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, কিন্তু তিনি ভক্তিমান ছিলেন না। শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার বাটীতে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা শুনিতে যাইয়া প্রেমে গদগদ হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতের ছাত্রগণ তাঁহাকে সেস্থান হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন, কারণ ইহাতে তাঁহাদের পাঠের বিঘ্ন হইতেছিল। দেবানন্দ পণ্ডিত বিদ্যাবুদ্ধিতে বৃহস্পতি তুল্য হইলেও ভক্তিমান্ বৈষ্ণব ছিলেন না বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর চরণে প্রথমে তাঁহার দৃঢ়াভক্তির উদয় হয় নাই। পরে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার অপরাধ ভঞ্জন করিলে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করেন। দেবানন্দের অপরাধ-ভঞ্জনের পাট অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

স্বরূপ গোস্বামী সেইজন্য বলিলেন বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত পাঠ করিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে ভক্তিমান বৈষ্ণব অধ্যাপকের অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাহার তাহার নিকট, বিশেষতঃ পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং বিদ্যাগর্ব্বিত অধ্যাপক পণ্ডিত কখনই ভাগবতশাস্ত্র অধ্যাপনার অধিকারী নহেন। ইহাই স্বরূপ গোস্বামীর প্রথম উপদেশ এবং ইহা অতি সার কথা। তাঁহার দ্বিতীয় উপদেশ,—

"একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে।"

ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রীগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা রসাস্বাদন করিতে হইলে,—শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ভাগবতের কথা শ্রীকৃষ্ণলীলা ও তত্ত্ব-পূর্ণ। গৌর-কৃষ্ণ অদ্বয়-তত্ত্ব—যিনি গৌর তিনিই কৃষ্ণ,—নদীয়ার অবতার সেই শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এখন নীলাচলে প্রকট আছেন, এবং অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ করিতেছেন। ভাগ্যবান্ জীব তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গচরণে রতিমতি না হইলে ভাগবতার্থের মর্ম্ম গ্রহণ দুঃসাধ্য, লীলা-রহস্যের মর্ম্মবোধ দুর্ঘট, এবং ভক্তিতত্ত্ব সিদ্ধান্তসমূহের প্রকৃত বিচারক্ষমতা লাভ সুদূর পরাহত। এইজন্য পরম গৌরভক্ত পণ্ডিত স্বরূপ গোস্বামী বঙ্গদেশীয় বিপ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে উপদেশ দিলেন, কলির জীবের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত অর্থ মর্ম্মগ্রহণ একরূপ দুঃসাধ্য। তিনি আরও বলিলেন একান্তভাবে শ্রীগৌরাঙ্গচরণ-আশ্রয় করিতে হইবে। স্বয়ং ভগবানজ্ঞানে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের চরণকমলে একনিষ্ঠা ভক্তি প্রয়োজন, তাহা না হইলে কলিহত জীবের পক্ষে ভক্তিমার্গ অতীব দুর্গম বলিয়া বোধ হইবে, ভক্তিশাস্ত্র সকল দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হইবে। তৃতীয় উপদেশ দিবার সময় স্বরূপ গোস্বামী সাধুসঙ্গের কথা তুলিয়া বলিলেন—

"চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।"

সাধুসঙ্গ ব্যতীত ধর্ম্ম অর্জ্জন বা শ্রীভগবানপ্রাপ্তি কিছুই সম্ভব নহে। গৌরভক্তগণ পরম বৈষ্ণব, ভক্তিজগতে তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে, তাঁহাদিগের সঙ্গলাভ বহু ভাগ্যে হয়। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীঠাকুর গৌরভক্তগণের মহিমা বর্ণন করিয়া নিম্নলিখিত উত্তম শ্লোকটি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

তাবৎ ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্নতিক্তী ভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোক বেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা বহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাব্জপ্রিয়জনো যাবন্নদৃগগোচরঃ॥ (১)

স্বরূপ গোস্বামী বলিলেন গৌরভক্তবৃন্দের সঙ্গ নিত্য করিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে রতিমতি হইবে—ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমূহ সহজে বুঝিতে পারিবে। ভক্তিগ্রন্থ লেখকগণ ও শ্রীভগবানের লীলাবর্ণনকারী ভাগ্যবান গ্রন্থকারগণ সামান্য মানব নহেন,—তাঁহারা শ্রীভগবানের পরমশ্রেষ্ঠ চিহ্নিত দাস,—সাধকশ্রেষ্ঠ। সাধ্যায়যোগ সাধুসঙ্গপ্রভাবে এবং ভক্তিশাস্ত্রালোচনে তাঁহা-দিগের মন পবিত্র এবং চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা শ্রীভগবানের অপূর্ব্বলীলা বর্ণনা করিতে সক্ষম। এই বঙ্গদেশীয় বিপ্র যে সাধুসঙ্গ করেন নাই,—এমন কথা নহে। সাধুসঙ্গ না করিলে, তাঁহার ভক্তিগ্রন্থ লিখিতে বাসনা হইত না। তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক নাটক লিখিয়াছেন, এবং নান্দীশ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র। এই শ্লোকে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ দুইটী কথা লিখিয়াছেন। এত-দিন গৌরভক্তের সঙ্গলাভে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়াই এরূপ ভ্রমপ্রমাদে পড়িয়াছেন। সর্ব্বদর্শী বিচক্ষণ বৈষ্ণব পণ্ডিত-চূড়ামণি স্বরূপ গোস্বামী ইহা বুঝিতে পারিয়াই এই তৃতীয় উপদেশটি তাঁহাকে দিলেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম গৌরভক্তের সঙ্গ বিনা শ্রীগৌরাঙ্গচরণে রতিমতি হয় না, এবং শ্রীগৌরাঙ্গচরণে রতি না হইলে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বা শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনার শক্তি লাভ হয় না। কবিরাজগোস্বামী তাই বলিলেন—

(১) অর্থ। যে পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণকমলমধুপ প্রিয়ভক্তগণ দৃষ্টি-গোচর না হন, সেই পর্য্যন্তই ব্রহ্মবিচার ও মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না, সেই পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খল বোধ হয় না, এবং সেই পর্য্যন্তই বহিরঙ্গ মার্গগামী বেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পর কলহ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

"কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা যে করু বর্ণন।
কৃষ্ণগৌরপাদপদ্ম যার প্রাণধন॥

বঙ্গদেশীয় বিপ্র অধোমুখে নীরবে বসিয়া আছেন,—স্বরূপ গোস্বামীর উপদেশবাক্য শুনিয়া তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে। এক্ষণে তিনি মনে শান্তি পাইয়াছেন,—কিন্তু লোকলজ্জা বিষম দায়। সর্ব্বসমক্ষে স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার রচিত নাটকের নান্দীশ্লোকের যেরূপভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেন,—তাঁহাকে যেরূপ ভাষায় সম্বোধন করিলেন, তাহাতে তাঁহার একপ লজ্জা হইবারই কথা। তিনি আর মাথা তুলিতে পারিতেছেন না। স্বরূপ গোস্বামী তখন বিপ্রের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার রচিত নান্দী শ্লোকটির অপর ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "বিপ্র। তোমার এই শ্লোকও শ্রীভগবানের স্তুতিপূর্ণ। তুমি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছ, তাহারও একটা সদর্থ আছে। পরম পণ্ডিত স্বরূপ গোস্বামী তখন এই মনঃক্ষুণ্ণ ব্রাহ্মণের চিত্তবিনোদনার্থে তাঁহার রচিত শ্লোকের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলেন যথা,—

জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্ম স্বরূপ।
কিন্তু ইঁহ দারুব্রহ্ম স্থাবরের রূপ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
সেই কৃষ্ণ একতত্ত্ব দুই রূপ হঞা॥
সংসার তারণ হেতু সেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলনে কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গম রূপে কৈল অবতার॥
জগন্নাথ দরশনে খণ্ডায় সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সবলোক নিস্তারিল জঙ্গম ব্রহ্ম হঞা॥
সরস্বতীর অর্থ এই কৈল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার ঐছে করিলে বর্ণন॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥ চৈঃ চঃ

স্বরূপ গোস্বামীর উপদেশ-বাক্য এবং অপরপক্ষে শ্লোক-ব্যাখ্যা শ্রবণে বিপ্রের মনে তখন আনন্দ হইল। তিনি উপস্থিত ভক্তবৃন্দের চরণে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোস্বামীর উপদেশমত তিনি কান্দিতে কান্দিতে দন্তে তৃণ করিয়া সর্ব্ব গৌরভক্তগণের চরণে শরণ লইলেন (১)। সকলেই তাঁহাকে কৃপা করিলেন। তাহার পর সময়মত সকলে মিলিয়া এই ভাগ্যবান বিপ্রের গুণ গাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন করিয়া দিলেন। সেই হইতে গৌরভক্তগণের কৃপায় এই বঙ্গদেশীয় বিপ্রের বিষয়-বাসনা দূর হইল। তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া নীলাচলে বাস করিলেন।

সেই কবি সব ছাড়ি রহিল নীলাচলে।
গৌরভক্তগণ-মহিমা কে কহিতে পারে? চৈঃ চঃ

কবিরাজ গোস্বামী এই ভাগ্যবান বিপ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ"

শাস্ত্রানভিজ্ঞ রসজ্ঞানবিহীন বক্তিরও যদি শ্রদ্ধা থাকে, তাহাকে শ্রীভগবান কৃপা করেন—এইজন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে—"আদৌ শ্রদ্ধা"।

দুঃখের বিষয় গ্রন্থে এই ভাগ্যবান বিপ্রের নাম ধাম ও পরিচয় কিছুই লিখিত নাই।

এই লীলা-কাহিনীর ফলশ্রুতি কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই পড়ে শুনে।
গৌর-লীলা, ভক্তি, ভক্ত, রসতত্ত্ব জানে।

ষষ্ঠচত্বারিংশৎ অধ্যায়

—:*:—

নীলাচলে শ্রীরঘুনাথদাস ও মহাপ্রভু।

—:০:—

রঘুনাথ কহে আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমায় এই আমি মানি॥ চৈঃ চঃ

(১) তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লইলা দন্তে তৃণ লঞা॥ চৈঃ চঃ

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাসিদ্ধ ভক্ত; ষড়্গোস্বামীর মধ্যে একজন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। তিনি জাতিতে কায়স্থ কুলতিলক,—সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্দ্ধনদাসের একমাত্র পুত্র। গোবর্দ্ধনদাস বার্ষিক বিশলক্ষ টাকা আয়ের জমিদারীর মালিক—মহা ধনবান এবং ভক্তিমান মহাপুরুষ ছিলেন। তাৎকালিক নবদ্বীপের সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণই তাহার বৃত্তিভোগী ছিলেন। রঘুনাথদাসের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই বিষয়-বৈরাগ্যের ভাব সকল দৃষ্ট হইত। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বালক রঘুনাথদাস প্রাণের আবেগে ছুটিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর সেই মুণ্ডিতমস্তক ও সন্ন্যাস-বেশ দর্শন করেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের আজন্মপোষিত বিষয় বৈরাগ্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয় এবং তিনি গৃহত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিবার মনবাসনা প্রকাশ করেন। সর্ব্বধর্ম্মরক্ষক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিয়া অনাসক্তভাবে গৃহ সংসার করিতে বলেন। তাঁহার এই উপদেশ বাক্যটি অমূল্য রত্ন। গৃহী বৈষ্ণবগণ এই অমূল্য রত্নটি কণ্ঠহার করিয়া রাখিবেন। মহাপ্রভু বলিলেন—

> স্থির হৈঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
> ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল।
> মর্কট বৈরাগ্য (১) না কর লোক দেখাইয়া।
> যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
> অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
> অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার। চৈঃ চঃ

রঘুনাথদাস মহাপ্রভুর এই অমূল্য উপদেশবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিলেন—এবং মহাপ্রভুর মতে অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অন্তরের বৈরাগ্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহাপ্রভুর উপদেশে তিনি বাহিরে গৃহসংসারে মন দিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যচরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইঁহার সাংসারিক ব্যবহারে পিতামাতার মনে আনন্দ হইল। তাঁহারা বুঝিলেন পুত্রের আর গৃহত্যাগের সম্ভাবনা নাই। ইহাতেই তাঁদের আনন্দ। কারণ, তাঁহাদের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ। পরমা সুন্দরী নবীনা পুত্রবধূ,—অতুল ঐশ্বর্য্য,—এই সুখসম্ভোগের একমাত্র অধিকারী রঘুনাথ। রঘুনাথের বিষয়বৈরাগ্য দর্শনে তাঁহাদের মনে বিষম ভয় হইয়াছিল। মহাপ্রভুর কৃপায় জীবনসম্বল একমাত্র পুত্রের মতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাঁহারা নিত্য কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বস্থানে তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন।

ইচ্ছাময় মহাপ্রভুর কি ইচ্ছা তাহা কে বুঝিতে পারে? শ্রীবৃন্দাবন হইতে যখন তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, এই সময়ে রঘুনাথের মনে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন-লালসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য গোপনে নীলাচল-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে একটি দুর্দ্দৈব ঘটনা সংঘটিত হইল। জনৈক মুসলমান চৌধুরী সপ্তগ্রামের তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার প্রবল অত্যাচারে হিন্দুমাত্রেই অত্যন্ত প্রপীড়িত ছিল। তিনি বাদসাহের বেতনভোগী ভৃত্য কিন্তু, তাঁহাকে রাজস্ব আদায়ের একটি পয়সাও দিতেন না। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া তিনি স্বয়ং বাদসাহের মত সকলই আত্মসাৎ করিতেন। বাদসাহকে কাজেকাজেই তাঁহাকে শাসন করিতে হইল,—সপ্তগ্রামের জমীদারীর জন্য নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইল। হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস দুই ভ্রাতায় মিলিয়া এই সময়ে সপ্তগ্রামের জমীদারীর মোক্তা-সূত্রে দিল্লীর বাদসাহের হস্ত হইতে কর আদায় তহশীল ও শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। বাদসাহের সহিত তাঁহাদিগের এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে রাজসরকারে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা দিতে হইবে,—রাজস্ব আদায় হউক আর না হউক। সপ্তগ্রাম জমিদারীর তাৎকালিক আয় প্রায় বিশ লক্ষ টাকা, অতএব এই বন্দোবস্তে তাঁহাদিগের বিশেষ লাভ ছিল।

(১) মর্কট বৈরাগ্য=হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যভাব উদয় হয় নাই—অথচ বৈরাগীর বেশ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হওয়ার সাধ যাঁহার হয়—তিনি মর্কট-বৈরাগী।

এখন উহাদের ঘটনার কথা বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান চৌধুরীর লভ্য সমুদয়ই নষ্ট হইল,—তিনি এইরূপ বন্দোবস্ত দেখিয়া ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়া দিল্লীর বাদসাহের কাণে এই জমিদারীতে বিশ লক্ষ টাকা আয়ের কথা উঠাইলেন। বাদসাহও কুচক্রীদিগের কুমন্ত্রণাবলে পুনরায় পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার বশীভূত হইলেন, এবং সসৈন্য উজিরকে পাঠাইয়া দুই ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিলেন। বাদসাহের সৈন্যদল সপ্তগ্রামে আসিলে প্রাণভয়ে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাস দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। তখন আর তাঁহাদিগের একমাত্র পুত্র রঘুনাথের কথা মনে রহিল না। বাদসাহের লোক রঘুনাথকে বন্দী করিয়া তাঁহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। তাঁহার পিতা এবং জ্যেষ্ঠতাত পলাতক হইয়াছেন,—তাঁহাদিগকে উপস্থিত করাইবার জন্য রঘুনাথকে বহু বাক্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রিত যুবক রঘুনাথের মন কিন্তু এই বিপদকালে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গচরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সপ্তগ্রামের চৌধুরী একজন বৃদ্ধ মুসলমান। রঘুনাথ তাঁহাকে একদিন মিনতি করিয়া কহিলেন "চৌধুরী সাহেব! আমার বাপ জেঠা তোমার দুই ভ্রাতা। ভাই ভাইতে কলহ বিবাদ হইয়াই থাকে, পুনরায় প্রীতিও সংস্থাপিত হয়। এই যে বিবাদ, বিসম্বাদ—ইহা চিরস্থায়ী নহে। তুমি আমার পিতৃতুল্য,—আমি গোবর্দ্ধনদাসের যেমন পুত্র,—তোমারও তদ্রূপ স্নেহভিখারী এবং প্রতিপাল্য। তুমি আমার প্রতিপালক হইয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ কেন? জিন্দা পির, সকল শাস্ত্রজ্ঞ,—তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ,—আমি তোমার বালক। আমাকে তোমার নিজ বালকজ্ঞানে কৃপা করা উচিত।" এই বলিয়া রঘুনাথ করযোড়ে এই বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইলে, তাঁহার পাষাণ মনও দ্রব হইল। রঘুনাথের বিষণ্ণ বদন দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া বৃদ্ধ আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার শ্মশ্রু বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, তিনি রঘুনাথের হাত দুইখানি ধরিয়া কহিলেন,—"রঘুনাথ! অদ্য হইতে তুমি আমার পুত্র হইলে, যে কোন উপায়ে আজ আমি তোমাকে বন্ধন মুক্ত করিব। তুমি কোন চিন্তা করিও না।(১)। সেই বৃদ্ধ যবন তখন বাদসাহের উজিরকে বলিয়া সেই দিনই রঘুনাথকে কারামুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন 'রঘুনাথ! তুমি তোমার জেঠাকে আমার নিকট লইয়া এস, আমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় করিব"। রঘুনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতকে আনাইয়া চৌধুরী সাহেবের সহিত মিলন করাইয়া দিলেন, এবং এই মিলনের ফলে সপ্তগ্রামের জমিদারীর নূতন বন্দোবস্তে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। বাদসাহের উজির সসৈন্যে রাজধানী ফিরিয়া গেলেন। হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস পুনরায় সপ্তগ্রামের পর্গণা-খণ্ডাধিকারী মালিক হইলেন। সুচতুর ও ভক্তিমান রঘুনাথের বুদ্ধিবলে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিলেন। রঘুনাথদাস শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর একান্ত দাস এবং একনিষ্ঠ ভক্ত। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান চিরদিন ভক্তের সকল দুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছেন। তিনিই রঘুনাথদাসের দুঃখ বিমোচন করিলেন। রঘুনাথদাস তাহা বুঝিলেন, তাঁহার গোষ্ঠীবর্গও তাহা বুঝিলেন। এই ঘটনায় তাঁহাদের সকলের মন শ্রীগৌরাঙ্গচরণে অধিকতর আকৃষ্ট হইল। শ্রীগৌরভগবানের ইহাই বিচিত্র লীলারঙ্গ।

ইহার পর এক বৎসর কাটিয়া গেল। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় রঘুনাথদাস তাঁহার উপদেশ মত অনাসক্তভাবে সংসার করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মন আর সংসারে থাকিতে চাহিতেছে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-মধুপানে তাঁহার মন প্রাণ নীলাচলাভিমুখে ছুটিল। তিনি গোপনে গৃহত্যাগের বাসনা করিলেন। গভীর রাত্রিতে উঠিয়া একদিন তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে বহুদূর আসিয়া পিতার প্রেরিত লোক জন কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পুনরায় গৃহে আসিতে হইল। কিন্তু তিনি শ্রীগৌরাঙ্গচরণ দর্শনলালসায় উন্মত্ত

(১) ম্লেচ্ছ বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আজি তোমা ছাড়াইব করি কোন সূত্র॥ চৈঃ চঃ

হইয়াছেন,—মনপ্রাণ তাঁহার নীলাচলে পড়িয়া রহিয়াছে,—তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? পুনরায় আর একদিন রাত্রিতে পলায়ন করিলেন। এবারেও ধৃত হইয়া তাঁহাকে গৃহে আসিতে হইল। এইরূপ আরও দুইবার হইল। তাঁহার স্নেহময়ী জননী তখন ভাবিলেন পুত্র পাগল হইয়াছে। তাঁহার স্বামীকে অনুরোধ করিলেন পুত্রকে গৃহে বাঁধিয়া রাখ; গোবর্দ্ধনদাস মহাপ্রভুর ভক্ত এবং শাস্ত্রবেত্তা। তিনি পুত্রের মনের অবস্থা সকলি জানেন এবং বুঝেন,—তিনি তাঁহার গৃহিণীকে কাতরভাবে বলিলেন:—

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন।
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিব কেমনে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্যপ্রভুর বাউল কে বাখিতে পারে॥ চৈঃ চঃ

রঘুনাথের জননী তাঁহার স্বামীর কথার উপর আর কথা কহিতে পারিলেন না। দুঃখিনী জননী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। গোবর্দ্ধন স্ত্রীকে বহু সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিলেন।

এই সময় রঘুনাথ মনে মনে বিচার করিলেন শ্রীনিতাই-চাঁদের কৃপা না হইলে তাঁহার সংসার বন্ধন ছিন্ন হইবে না। পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গচরণে স্থান প্রাপ্তি অসম্ভব। এইরূপ মনে করিয়া এবার রঘুনাথদাস—

"নিত্যানন্দ গোসাঞির পাশ চলিল আর দিনে" চৈঃ চঃ

অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ তখন পানিহাটি গ্রামে ভক্তগণ সঙ্গে লীলারঙ্গ করিতেছেন। রঘুনাথ একদিন হঠাৎ সেখানে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দর্শন পাইলেন,—যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিড়ার উপরে।
বসিয়াছে প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখি প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥"

রঘুনাথ শ্রীনিতাইচাঁদকে দেখিয়াই—"দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কত দূরে"—তখন জনৈক ভক্ত শ্রীনিতাইচাঁদের চরণে নিবেদন করিলেন "প্রভু! রঘুনাথ আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে"। শ্রীনিতাইচাঁদ রঘুনাথের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া কি কহিলেন শুনুন,—

শুনি প্রভু কহে—"চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন॥" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ তুই চোর—তুই আমার নিকটে আসিস্ না,—ভয়ে ভয়ে দূরে থাকিস্—এই অপরাধে আজ তোকে দণ্ড দিব। এই বলিয়া পরম দয়াল নিতাইচাঁদ রঘুনাথকে নিকটে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু রঘুনাথ ভয়ে তাঁহার নিকটে আসিতে চাহিতেছেন না,—

"প্রভু বোলায় তিঁহো নিকট না করে গমন"।

তখন তিনি কি করিলেন তাহা শুনুন -

"আকর্ষিয়া তার মাথে ধরিলা চরণ"॥

ইহাকেই বলে অযাচিত কৃপা—অহৈতুকী কৃপা,—কেশে ধরিয়া কৃপা করা। পরম দয়াল গৌরনিতাই এই-ভাবেই কলিহত জীবকে কৃপা করেন। রঘুনাথ এইভাবে নিতাইচাঁদের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া প্রেমানন্দে কান্দিতেছেন,—সব্ব ভক্তগণ প্রেমানন্দে উচ্চ হরিধ্বনি করিতেছেন,—পানিহাটীতে প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিল। রঘুনাথ আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। তখন—

কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥ চৈঃ চঃ

তিনি কি বলিলেন তাহা শুনুন—

নিকট না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি,—দণ্ডিব তোমারে॥
দধি চিড়া ভক্ষণ করাও মোর গণে।

তখন এই কথা—

শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে চৈঃ চঃ

এই কৃপাদেশ প্রাপ্তমাত্র রঘুনাথ তখন কি করিলেন

তাহাও গ্রন্থে লিখিত আছে। কবিরাজ গোস্বামীর কথায় তাহা সকলে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি হোল্‌না আনাইল॥ (১)
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ শতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে।
এক ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥

তখন—

ধূতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা॥
চবুতরা উপর যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী রচন॥

ইহারা কে কে,—তাহা শুনুন,—

রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস।
মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥

এই মহোৎসবে বহু ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত আসিয়াছিলেন,—স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র তাঁহাদের সম্মান করাইয়া উপরে বসাইলেন,—যথা—

শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিলা।
একে দুগ্ধ চিড়া আরে দধি চিড়া কৈল॥

তার পর—

আর যত লোক সব চৌতরা তলানে।
মণ্ডলী বন্ধনে বসিলা তার না হয় গণনে॥
একেক জনারে দুই দুই হোল্‌না দিল।
দধি চিড়া দুগ্ধ চিড়া দুইতে ভিজাইল॥

তাহার পর কি হইল শুনুন,—

কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোল্‌নায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন।
জলে নামি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ॥
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঞি উপবেশন করে॥

এই যে চিড়া মহোৎসব,—এই যে ভক্তসঙ্গে পুলিন-ভোজন-লীলারঙ্গ,—ইহা শ্রীনিতাইচাঁদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি,—অদ্যাবধি পানিহাটীগ্রামে প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা এই মহামহোৎসবের স্মরণোৎসব।

এইরূপ চিড়া দধি দুগ্ধের মহোৎসব হইতেছে,—এমন সময়ে পানিহাটীবাসী মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠভক্ত রাঘবপণ্ডিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং এইরূপ মহামহোৎসব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি সঙ্গে করিয়া নি-সক্‌ড়ি (যাহা সক্‌ড়ি নহে) প্রসাদ আনিয়াছিলেন—তাহা উপস্থিত ভক্তগণকে বণ্টন করিয়া দিয়া শ্রীনিতাইচাঁদকে করযোড়ে কহিলেন,—

————"তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
তুমি ইঁহা উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল॥"

তখন পরম দয়াল ভক্তবৎসল শ্রীনিতাইচাঁদ মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—

————"এ দ্রব্য এ দিনে করিয়া ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ॥
গোপজাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিনভোজন রঙ্গে॥" চৈঃ চঃ

(১) মৃৎপাত্র বিশেষ।

তখন স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু,—

রাঘবে বসায়ে দুই কুণ্ডী দেওয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাহাতে ভিজাইল॥ চৈঃ চঃ

এইরূপে যখন উপস্থিত সর্ব্বলোক সমূহের সম্মুখে মৃৎপাত্রে চিড়া দধি দুগ্ধ সহ ভিজিতে লাগিল,—তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ধ্যানস্থ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই চিড়ামহোৎসবে আহ্বান করিলেন—অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদের ধ্যানে নীলাচল হইতে ভক্তের ভগবান মহাপ্রভুকে পানিহাটিতে আসিতে হইল, যথা,—

সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হইল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥

তখন কি হইল তাহা শুনুন,—

মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডি হোলনার চিড়া এককে গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥
হাসি মহাপ্রভু আর একগ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়ে খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥ চৈঃ চঃ

এই যে মহাপ্রভুর পানিহাটীতে আবির্ভাব, ইহা সকলে দেখিতে পাইতেছেন না, ইহা "কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়"। তাই কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

(নিতাই) কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥

এইরূপে ধ্যানযোগে অলক্ষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নীলাচল হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ পানিহাটীতে এই চিড়ামহোৎসব করিতেছেন।

ইহার পর কি হইল, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন—

তবে হাসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডি [illegible] গোয়া চিড়া রাখিল ডাহিনে॥ (১)

আসন দিয়া মহাপ্রভুকে তাহে বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুকে লইয়া শ্রীনিতাইচাঁদের একত্র ভোজন, উভয়ের পক্ষেই বিশিষ্ট আনন্দপ্রদ, বিশেষতঃ অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ মহাপ্রভুকে পাইয়া আজ প্রেমানন্দে আটখানা হইয়াছেন, কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

দেখি নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা।
"কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা"॥

তিনি তখন প্রেমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া সকলকে ভোজনে বসিতে আজ্ঞা দিলেন,—

আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন।
পুলিনভোজন সবার হৈল স্মরণ॥ চৈঃ চঃ

এই যে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব আবির্ভাব লীলারঙ্গ,—এই যে পুলিনভোজন লীলারঙ্গ,—এই যে শ্রীনিতাইচাঁদের অনন্ত প্রভাব প্রদর্শন,—ইহা কেবল রঘুনাথদাসের ভাগ্যে পানিহাটীতে শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় সংঘটিত হইল। কবিরাজগোস্বামী তাই লিখিয়াছেন,—

"রঘুনাথের ভাগ্যে ইহা কৈল অঙ্গীকার"

শ্রীনিতাইচাঁদের অপূর্ব্ব মহিমা বর্ণনা করিয়া কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ-প্রভুর-কৃপা জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিনভোজন॥

---

(১) [illegible] ড়া ঠাকুর ভোগে লাগে না। তাই আতপ চিড়ার ভোগ মহাপ্রভুকে নিতাইচাঁদ দিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছেন বিপ্র দ্বারা দধিদুগ্ধ চিড়ায় মিশ্রিত করিয়া তবে সকলকে দেওয়া হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ সম্মান করিয়া উপরে পৃথক্‌ভাবে আসন দিয়া ভোজনে বসাইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে হইবে মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দপ্রভু উভয়েই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-মর্য্যাদারক্ষক ছিলেন। সদাচার রক্ষা করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। প্রসাদে বিশ্বাস অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। সে ভাগ্য সকলের হয় না। বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি বিচারে মহাপাপ, সে সম্বন্ধে কোন কথা নাই। তবে গৃহী বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতে পারেন। ইহা মহাপ্রভুর অভিমত। তবে যিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বেষাশ্রয় করিয়া বিরক্ত উদাসীন বৈষ্ণব হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, সন্দেহ নাই, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।

তার পর যখন এই চিড়ামহোৎসবে উপস্থিত ভক্তগণ **ভোজনে বসিলেন, তখন কি হইল শুনুন,—**

মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্য করি লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥
কৌতুক দেখিলে যত যত জন।
সেই চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥

যখন শ্রীনিতাইচাঁদের ভোজনলীলা শেষ হইল,—তিনি আচমন করিয়া স্বহস্তে চারি কুণ্ডীর অবশেষ প্রসাদ রঘুনাথকে দিলেন।

ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥

তার পর আর তিনটি কুণ্ডিকায় যাহা অবশিষ্ট প্রসাদ ছিল তাহা,—

"গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল।"

এই যে বিপ্র ইনিই পূর্ব্বে দধি দুগ্ধের সহিত চিড়া মিশাইয়া সকল ভক্তগণকে দিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ এক্ষণে পুনর্ব্বার গৌরনিতাইর প্রসাদ সকলকে বণ্টন করিলেন তিনিই পুষ্পের মালিকা আনিয়া শ্রীনিতাই-চাঁদের গলদেশে পরাইয়া দিলেন এবং চন্দনে তাঁহার দিব্য শ্রীঅঙ্গ লেপন করিলেন,—

পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু গলে দিল।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥

তখন কোন সেবক তাম্বুলসেবা করিলেন অবধৃত নিতাইচাঁদ হাসিয়া হাসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন এবং—

মালা চন্দন তাম্বুল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকার বাটি দিল ॥

রঘুনাথ দাসও এই শেষ প্রসাদ পাইয়া—

"আপনার গণ সহ খাইলা বাটিয়া।"

এই হইল শ্রীনিতাইচাঁদের পানিহাটীতে বিখ্যাত চিড়া-**মহোৎসব,** যাহা অদ্যাবধি প্রতিবৎসর সেখানে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাতি যার নাম ॥

তার পর শ্রীনিতাইচাঁদ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া স্বগণ সহ রাঘব পণ্ডিতের গৃহে গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

কারণ সেখানে পুনরায় রাত্রিতে মহামহোৎসব আছে। রাঘব পণ্ডিতের গৃহে এই মহাসংকীর্ত্তনযজ্ঞ **আরম্ভ হইল,—** ইহাতেও মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল, যথা চরিতামৃতে,—

ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগত ভাসায় ॥
মহাপ্রভু তার নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে অন্য জন ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীনিতাইচাঁদের নৃত্যে মহাপ্রভুর নৃত্যপ্রকাশলীলা সকলে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

নিত্যানন্দ নৃত্য যেন তাঁহারই নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন ॥

এই নৃত্য-কীর্ত্তনের পর শ্রীনিতাইচাঁদ যখন বিশ্রাম করিলেন, তখন রাঘব পণ্ডিত করযোড়ে নিবেদন করি-লেন—"প্রভু প্রসাদ প্রস্তুত, ভোজনে আগমন করুন"— তখন অবধূত নিতাইচাদ কি করিলেন ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন—

ভোজনে বসিল প্রভু নিজগণ লঞা
মহাপ্রভুর আসন ডাইনে পাতিয়া।

গৌরাঙ্গপার্ষদশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ রাঘবপণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইত—তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেন,—

এবারও তাই হইল—

মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা ॥ চৈঃ চঃ

রাঘব পণ্ডিত দেখিলেন মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়া ভোজন-বিলাস করিতেছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে আজি নূতন নহে।

কারণ তিনি স্বয়ং পাক করিয়া ভোগ লাগাইলে মহাপ্রভু আসিয়া ভোজন করিতেন।

পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক বাড়য়।
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে কভু তাঁরে দেন দরশন॥

এদিনে নিতাইগৌর দুই ভাইকে একত্রে পাইয়া ভক্তবর রাঘব পণ্ডিত প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পরিবেশন করিতেছেন।

দুই ভাইকে রাঘব আনি পরিবেশে।
যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে॥
কত উপহার আনে হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা ঠাকুরাণী॥ চৈঃ চঃ

ভক্তবৃন্দও এই প্রসাদভোজনে বসিয়াছেন,—নানা প্রকার প্রসাদ প্রস্তুত করিয়া রাঘব গৌরাঙ্গপ্রভুর ভোগ দিয়াছেন,—

নানা প্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আসে বার বার॥ চৈঃ চঃ

রঘুনাথ দাস একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই মহামহোৎসব দর্শন করিতেছেন,—তিনি প্রসাদ ভোজনে বসেন নাই; তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিতেছেন,—কিন্তু রাঘব পণ্ডিত বলিলেন,—

——"ইহোঁ পাছে করিবে ভোজন॥"

ইহার তাৎপর্য্য আছে, পরে প্রকাশ হইবে। ভক্তগণ আকণ্ঠ ভোজন করিলেন। প্রেমধ্বনি ও হরিধ্বনি দিয়া সকলে আচমন করিলেন। তখন রাঘবপণ্ডিত সকলকে মালাচন্দন দিলেন, তাম্বুল দিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি রঘুনাথকে নিভৃতে ডাকিয়া নিতাইগৌর দুই ভ্রাতার অবশেষ-পাত্র প্রসাদ দিয়া হাসিয়া কহিলেন,—

——"চৈতন্য প্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিবে বন্ধন"। চৈঃ চঃ

রঘুনাথের মনের বাসনা পূর্ণ হইবে—তাঁহার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবে,—যাহার জন্য তিনি শ্রীনিত্যানন্দচরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন,—এবং যে জন্য এই পাণিহাটিতে তাঁহার আগমন,—গৌরাঙ্গপার্ষদশ্রেষ্ঠ রাঘব পণ্ডিতের মুখে তাহার আভাস পাইয়া তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া পরম ভক্তিভরে প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া প্রেমানন্দে পুনরায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইজন্যই তিনি পঙ্গতে প্রসাদভোজনে বসেন নাই। এরূপ সৌভাগ্য সকলের হয় না। ধন্য রঘুনাথ! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত।

শ্রীগৌরভগবান ভক্তবৎসল,—ভক্তবশ্য,—ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু,—তাঁহার নিবাসই ভক্ত-হৃদয়ে এবং ভক্তগৃহে,—কখন তিনি ব্যক্তভাবে ভক্তগৃহে ভোজন বিলাসাদি লীলা-রঙ্গ করেন,—কখন গুপ্তভাবে আবির্ভাব লীলারঙ্গে ভোজনাদি লীলারঙ্গ করেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীও এই কথা লিখিয়াছেন,—

"ভক্তচিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান॥"

তিনি সর্ব্বব্যাপক,—সর্ব্বত্র তাঁহার অধিষ্ঠান, সর্ব্বত্র তাঁহার বাস,—

"ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ॥"

রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে রাত্রিতে সেদিন মহামহোৎসব শেষ হইলে পরদিন প্রভাতে শ্রীনিতাইচাঁদ গঙ্গাস্নান করিয়া নিজগণসহ গঙ্গাতীরে সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া স্বচ্ছন্দে আনন্দ বিহার করিতেছেন,—এমন সময়ে রঘুনাথদাস সেখানে আসিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া রাঘবপণ্ডিতকে নিজ মনভাব নিবেদন করিলেন—

"অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাঙ চৈতন্য চরণ॥
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।

পিতামাতা দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তবে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়ে সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ॥" চৈঃ চঃ

লক্ষপতি জমিদারপুত্র রঘুনাথদাসের মুখে এই অপূর্ব্ব দৈন্যোক্তি শুনিয়া উপস্থিত সর্ব্বভক্তগণ পরমানন্দে উচ্চ হরিধ্বনি দিতে লাগিলেন। শ্রীনিতাইচাঁদ হাসিয়া ভক্তগণকে কহিলেন,—

শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয়-সুখ ইন্দ্র-সুখ সমে॥
চৈতন্য কৃপাতে সে নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর পাউ চৈতন্য চরণে॥ চৈঃ চঃ

পরম দয়াল নিতাইচাঁদ সর্ব্বাগ্রে রঘুনাথের জন্য ভক্তাশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়া লইলেন। ইহাতে তিনি উপস্থিত সর্ব্বসাধারণ ভক্তজনকে শিক্ষা দিলেন, যে সর্ব্বাগ্রে ভক্তাশীর্ব্বাদ প্রয়োজন—স্বয়ং মহাপ্রভু ভক্তাশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছেন,—তাঁহার নবদ্বীপ লীলায় দেখিতে পাই,—

"ভক্তাশীর্ব্বাদপ্রভু শিরে ধরি লয়"।

তাহার পর পরম দয়াল নিতাইচাঁদ রঘুনাথদাসকে নিকটে ডাকিয়া—

"তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা"।

এই যে বিশেষ কৃপা,—ইহা মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দপ্রভু যাহাকে তাহাকে করেন নাই—বিশেষ চিহ্নিত দাসগণই তাঁহাদিগের এই অপূর্ব্ব কৃপা-বৈভব সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। রঘুনাথের মস্তকে শ্রীচরণ ধারণ করিয়া পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ হাসিতে হাসিতে মধুরভাষে কি বলিলেন, তাহা শ্রবণ করুন,—

"——তুমি করাইলে সেই পুলিন ভোজন।
তোমায় কৃপা করি গোর কৈল আগমন॥
কৃপা করি কৈল চিড়া দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
তোমা উদ্ধারিতে গোর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিয়ে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবে চরণে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ॥" চৈঃ চঃ

এইরূপ কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া পরম দয়াল নিতাইচাঁদ পুনরায়—

"সব ভক্ত দ্বারে তারে আশীর্ব্বাদ করাইল"।

তখন রঘুনাথ সকলের চরণে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন—

"তা সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল"॥

তার পর শ্রীনিতাইচাঁদের আদেশ গ্রহণ করিয়া,—উপস্থিত ভক্তবৃন্দের আজ্ঞা ভিক্ষা করিয়া বিদায় গ্রহণ কালে রঘুনাথদাস রাঘবপণ্ডিতের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া—

——"শতমুদ্রা সোনা তোলা সাথে।
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে॥"

শ্রীনিতাইচাঁদকে কাঞ্চন দক্ষিণা দিতে রঘুনাথ সাহস করিলেন না—তাহার সেবার জন্য তাঁহার ভাণ্ডারীর হাতে দিয়া—

"তাঁরে নিষেধিল প্রভুকে এবে না কহিবা।
নিজ ঘরে যাবে তবে নিবেদিবা॥" চৈঃ চঃ

এইভাবে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সম্মান করিয়া রঘুনাথ ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় হইলেন। তখন রাঘবপণ্ডিত তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজগৃহে লইয়া গিয়া—

"ঠাকুর দর্শন করাইয়া মালা চন্দন দিলা"।

তার পর আর কি করিলেন, তাহা শুনিয়া রাখুন,—ভক্ত-বিদায়ের সময় কাজে লাগিবে।

"অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে"।

মহাপ্রভুর প্রদর্শিত বৈষ্ণবীয় ভজনপথে যত্রতত্র প্রসাদের ছড়াছড়ি—প্রসাদ ভোজনের এমন সুবন্দোবস্ত ও সুব্যবস্থা অন্যত্র নাই,—কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাপিও এই

ভজনপথে কেহ আসিতে চাহে না। প্রসাদের লোভেও যদি কেহ এই পথে আসেন, তাহারও ভাগ্য প্রসন্ন,—কারণ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভোজনেই প্রকৃত বৈষ্ণবতা আসে,—চিত্তশুদ্ধি হয়।

রঘুনাথ প্রসাদ পাইয়া শিরোধারণ পূর্ব্বক রাঘব পণ্ডিতকে করযোড়ে নিবেদন করিলেন—

"প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ॥
বিশ পঞ্চাশ দশ বার পঞ্চদশ দ্বয়।
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যোগ্য যত হয়॥ চৈঃ চঃ

এইভাবে সাধু মোহান্ত বৈষ্ণবের উপযুক্ত সম্মান করিয়া মহামহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়া রঘুনাথদাস সপ্তগ্রামে নিজ বাটীতে ফিরিলেন। মোহান্তমহাজন গোসাঞিগোবিন্দ প্রভৃতির বিদায় মহাজনগণও করিয়া গিয়াছেন,—এখনও এই প্রথা চলিতেছে। ইহা বৈষ্ণবের সম্মান এবং উৎসবান্তে ইহা যে করণীয়,—লীলায় ইহাই দেখাইলেন।

পাণিহাটি হইতে রঘুনাথদাস নিজগৃহে ফিরিয়া আসিয়া আর অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করেন নাই—

সেই হইতে অভ্যন্তর না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন॥ চৈঃ চঃ

এখানে তাঁহাকে দ্বাররক্ষকগণ সর্ব্বদা কড়া পাহারা দেয়—তিনি আর কোথাও যাইতে পারেন না,—তাঁহার পিতার আদেশে এরূপ কড়া পাহারার বন্দোবস্ত,—কারণ পূর্ব্বে কয়েকবার তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে গৌড়দেশ হইতে গৌরভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথদাস তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না, এজন্য মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলেন। কিন্তু তিনি পরাধীন, কারারুদ্ধ কয়েদীর মত নিজগৃহে সর্ব্বদা আবদ্ধ,—কোথাও যাইবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। তাঁহার মনদুঃখ কেহ বুঝিল না,—তাঁহার গৃহত্যাগের সহায় কেহ হইল না, দেবীমণ্ডপে শয়ন করিয়া একদিন রাত্রিতে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, তখন রাত্রি চারিদণ্ড আছে এমন সময়ে তাঁহার গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য সেখানে আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইলেন।

রঘুনাথদাস তাঁহার গুরুদেবের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তখন মনের দুঃখ সকলি কহিলেন। তিনি শিষ্যের এই মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তৎকালে অভিলাষী না হইলেও মহাপ্রভুর ইচ্ছায় কোনরূপ কৌশলে তাঁহার সাহায্যে রঘুনাথ সেদিন গৃহের বাহির হইলেন। যদুনন্দন আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য, বাসুদেবদত্তের অনুগৃহীত এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর পরম ভক্ত। তিনি রঘুনাথদাসের গুরু এবং পুরোহিত উভয়ই। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। গৃহত্যাগ করিয়া রঘুনাথ আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নীলাচলাভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহার চিন্তা একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গচরণ। সোজাপথে হাঁটিয়া দ্বাদশ দিনে তিনি শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ প্রাপ্তে মন॥
কভু চর্ব্বন, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধ পান।
যবে যেই মিলে তাতে রাখয়ে পরাণ॥
বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিলা ভোজন।

রঘুনাথের বিকট বৈরাগ্য ও ভক্তিসাধন জগতে অতুলনীয়। তাঁহার এই যে দ্বাদশ দিনে সপ্তগ্রাম হইতে প্রথমে পূর্ব্বমুখে পরে দক্ষিণ মুখে ছত্রভোগ পার হইয়া কুগ্রাম দিয়া বনপথে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন,—ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। তিনি দিনে পঞ্চদশ ক্রোশ চলিতেন (১)। ইহা কি মানুষে পারে? রঘুনাথ সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। তাঁহার বৈরাগ্যের তুলনা নাই। শ্রীগৌরভগবানের কৃপাকর্ষণে তিনি এই দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নীলাচলধামে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কাশীমিশ্রের বাটিতে স্বরূপ

(১) পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে॥ চৈঃ চঃ

দামোদর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া কৃষ্ণকথা রসে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ দাস আঙ্গিনায় বহুদূরে থাকিয়া ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যোড় হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি সপার্ষদ মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। মুকুন্দ দত্ত সেখানে ছিলেন তিনি রঘুনাথকে দেখিয়াই প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন "প্রভু! এই আমাদের রঘুনাথ আসিয়াছে"। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তাঁহার চরণাশ্রিত দাসের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া মহাস্যবদনে কহিলেন "এস রঘুনাথ এস"। এই কথা বলিবামাত্র প্রেমাবেগে রঘুনাথ ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর চরণে দীঘল হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে শ্রীহস্তে ধরিয়া উঠাইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতকৃতার্থ করিলেন। রঘুনাথ প্রেমানন্দে অধীর হইয়া জড়বৎ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি সর্ব্ব ভক্তবৃন্দের চরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহারাও একে একে সকলে কৃপা করিয়া রঘুনাথকে প্রেমালিঙ্গনদানে সুখী করিলেন। মহাপ্রভু তখন ভঙ্গী করিয়া রঘুনাথকে পরম প্রেমভরে হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

———"কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।

তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥" চৈঃ চঃ

একনিষ্ঠ গৌরভক্ত রঘুনাথ মহাপ্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া নির্ভয় চিত্তে কহিলেন—

———"আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।

তব কৃপা কাড়িল আমায়, এই আমি মানি॥" চৈঃ চঃ

নিতাইচাঁদের কৃপায় রঘুনাথ প্রকৃত গৌরতত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার চরণে একনিষ্ঠা ভক্তি হইয়াছিল। এই একনিষ্ঠা ভক্তির বলে তিনি এইরূপ কথা মহাপ্রভুর সম্মুখে বলিতে সাহস পাইলেন। এই কথার মর্ম্ম "আমি কৃষ্ণকে জানি না, তোমাকেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া জানি ও মানি,—তোমার কৃপাবলেই আমি বিষয় গর্ত্ত হইতে উঠিতে সক্ষম হইয়াছি,—ইহাই আমার ধারণা। কৃষ্ণকৃপা আমি বুঝি না, তোমার কৃপাই আমি বুঝি"। রঘুনাথের এই কথাতে মহাপ্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি চতুরচূড়ামণি, রঘুনাথের গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতা বুঝিয়া, আর তাঁহার চরণে তাঁহার একনিষ্ঠা ভক্তি দেখিয়া মহাপ্রভু নিজ মনের ভাব গোপন করিলেন। রঘুনাথের বাপ জেঠার বিষয়নিষ্ঠা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি পরিহাসছলে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন "রঘুনাথ! আমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে তোমার পিতা ও জেঠাকে আমি আজ্যা (১) বলিয়া সম্মান করি। আমার মাতামহের সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকে পরিহাস করিতেও পারি তাই বলিতেছি তোমার বাপ জেঠা বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট। তাঁহারা বিষয় সম্ভোগকে পরম সুখ মনে করেন, বিষয়ে যে মহা পীড়া আছে তাহা বুঝিতে পারেন না। যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণসেবা করেন, এবং সর্ব্ববিষয়ে ব্রাহ্মণের সহায়তা করেন, কিন্তু তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন (২)। বিষয়ের স্বভাবে তাঁহাদিগকে মহা অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা যাহা কিছু করেন, তাহাতেই ভববন্ধে পতিত হন। এহেন বিষয়বিষ হইতে রঘুনাথ! তোমাকে কৃষ্ণ উদ্ধার করিলেন। ইহাতেই কৃষ্ণের কৃপার মহিমা বুঝ (৩)"। রঘুনাথ নীরবে মহাপ্রভুর কথা নিবিষ্টচিত্তে শুনিলেন,—এবার আর উত্তর করিতে সাহস করিলেন না। কৃষ্ণকৃপার অর্থ তিনি এখনও বুঝিতে পারিলেন না,—গৌরাঙ্গকৃপাই কৃষ্ণকৃপা মনে করিয়া মহাপ্রভুর সহিত এ বিষয় লইয়া আর তর্ক না করা উচিৎ মনে করিলেন। মহাপ্রভু

(১) আজ্যা মাতামহের অপভ্রংশ কথা।

(২) যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে বৈষ্ণবের প্রায়॥

ইহার ভাবার্থ এই যে বৈষ্ণবের ন্যায় বেশভূষা দেবসেবাদি থাকিলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারে না, কেন না যে পর্য্যন্ত অন্যাভিলাষিতাশূন্যং ইত্যাদি লক্ষণ না হয়, সে পর্য্যন্ত দীক্ষাদি প্রাপ্ত হইয়াও বৈষ্ণব প্রায় থাকে। ইহাদিগকে বৈষ্ণবাভাস বলে।

(৩) তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ।
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥ চৈঃ চঃ

ও রঘুনাথকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া তাঁহার পথশ্রান্ত মলিন বদন ও অনাহারে ক্লিষ্ট শরীর দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া স্বরূপ দামোদরের প্রতি করুণ নেত্রে চাহিয়া কহিলেন,—

এই রঘুনাথে আমি সোঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্যরূপে ইহারে কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নামে হয় আমা স্থানে।
স্বরূপের রঘুনাথ আজি হৈল ইহার নামে॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া ভক্তবৎসল মহাপ্রভু রঘুনাথকে স্বরূপ দামোদর গোসাঞির হস্তে হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেন। স্বরূপ গোস্বামী "যে আজ্ঞে প্রভু"! এই বলিয়া পুনরায় রঘুনাথকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।

মহাপ্রভুর সকল লীলারঙ্গই নিগূঢ় ভাব ও পরম রহস্যপূর্ণ। এই যে স্বরূপ দামোদরের হস্তে রঘুনাথকে সমর্পণ করিলেন, ইহার মধ্যেও নিগূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। স্বরূপ দামোদর ভিন্ন রঘুনাথের গতি নাই। রঘুনাথ সাধন করিবেন, স্বরূপ তাঁহাকে ব্রজের নিগূঢ় ভজন সাধন শিক্ষা দিবেন। রঘুনাথের দীক্ষা হইয়াছে, এক্ষণে শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন; সাধনপথে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর প্রভাব ও মহিমা তুল্য। ইহা দেখাইবার জন্য সর্ব্ব ধর্ম্মমর্য্যাদাপালক মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে উপযুক্ত সদ্‌গুরু হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বরূপ দামোদরের মত শিক্ষা-গুরু আর কে কোথা পাইবেন? তিনি পূর্ব্ব লীলার ললিতা সখি,—শ্রীরাধিকাজির প্রধান সহচরী। তাঁহার কৃপা ভিন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলবিলাস হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হইতে পারে না। রঘুনাথ দাসকে মহাপ্রভু ব্রজের উন্নতোজ্জ্বল মধুর পরকীয়া রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক করিবেন এবং তিনি পরে এই মধুর পরকীয়া রসের ভজনের গুরু হইবেন, ইহা ভাবিয়াই চতুরচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে স্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্যের অবধি নাই। রঘুনাথ পথশ্রান্তিতে মলিন ও দুর্ব্বল হইয়াছেন, দয়াময় প্রভু তাহা বুঝিয়া নিজ ভৃত্য গোবিন্দকে ডাকিয়া কহিলেন—

"পথে ইহোঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কতক দিন কর ইঁহার ভাল সন্তর্পণ॥" চৈঃ চঃ

আহা! এমন পরম দয়াল ভক্তবৎসল প্রভু কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? রঘুনাথ দেখিলেন তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর স্নেহাতিশয্য তাঁহার পিতার অপেক্ষাও অধিক। এই কথা মনে হইতেই তিনি বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দয়াময় মহাপ্রভু তাঁহার পদ্মহস্ত খানি রঘুনাথের গাত্রে দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া পুনরায় সস্নেহ বচনে কহিলেন "রঘুনাথ! দিবা দ্বিপ্রহর হইয়াছে তুমি সিন্ধুস্নানে যাও,—জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া এস, আর এখানে আসিয়া প্রসাদ পাইও" (১)। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে উঠিলেন। রঘুনাথ তখন সকল ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রস্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে গোবিন্দের নিকট আসিলেন। মহাপ্রভুর তখন ভোজনলীলা সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার আদেশে তাঁহার অবশিষ্ট ভোজনপাত্র গোবিন্দ ভাগ্যবান রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ পরমানন্দে মহাপ্রভুর অধরামৃত পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। গোবিন্দ এইরূপে পাঁচদিন রঘুনাথকে সুন্দররূপে মহাপ্রভুর প্রসাদ দিলেন। এই কয়দিন প্রসাদ পাইয়া তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ শরীর হইলেন। ইহার পর রঘুনাথ ভিক্ষান্নভোজী হইলেন বিরক্ত বৈষ্ণবের চিরন্তন প্রথানুযায়ী তিনি জগন্নাথের সিংহ-দ্বারে বসিয়া হরিনাম জপ করেন। যাত্রীগণ জগন্নাথ দর্শন করিয়া যাইবার সময় এইরূপ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ কিনিয়া ভিক্ষা দিয়া থাকেন। রঘুনাথের এই ভিক্ষান্নই সম্বল। তিনি দিবাভাগে অনাহারে ভজন করেন। রাত্রিতে জগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকেন। যৎসামান্য ভিক্ষা পাইলেই নিজ ভজনকুঠীরে চলিয়া আসেন। প্রভুর শ্রীমন্দিরে পাঁচ দিন প্রসাদ

(১) রঘুনাথে কহে যাহ করি সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করিহ ভোজন।। চৈঃ চঃ

পাইয়া রঘুনাথের মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ হইয়াছিল, তাই তিনি এই সাধুবৈষ্ণবোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু একদিন তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রঘুনাথ এখানে প্রসাদ পায় না?" গোবিন্দ উত্তর করিলেন—

"রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা মাগিয়া খান"। প্রভু ইহা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি এই সময় একদিন বিরক্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর কি কর্ত্তব্য,—তাহা সকল ভক্তগণকে উপদেশ দিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল করিলা, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥
বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাকপত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

মহাপ্রভুর উপদেশ বাক্যগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই কণ্ঠহার করিয়া রাখিবেন। বেদবেদান্ত সাংখ্যদর্শন পুরাণ শাস্ত্রবিধি সকল একদিকে,—আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশবাণী একদিকে। শাস্ত্রউপদেশ পরোক্ষ আদেশ,—ইহা শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ আদেশ,—সুতরাং ইহার মূল্য ও মহিমা অধিক।

রঘুনাথদাস মহাপ্রভুর সমক্ষে কোন কথা বলিতে সাহস করেন না। তিনি তাঁহাকে দর্শন করেন এবং তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি করেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বরূপ দামোদর গোসাঞির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। রঘুনাথ একদিন স্বরূপ গোসাঞির নিকট করযোড়ে নিবেদন করিলেন মহাপ্রভুকে কৃপা করিয়া একবার জিজ্ঞাসা করুন এখন আমার কর্ত্তব্য কি? মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশ শুনিতে আমার মনে বড় ইচ্ছা হইয়াছে।" স্বরূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রঘুনাথের নিবেদন জানাইলেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া রঘুনাথকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন—

"তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল।
সাধ্য সাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর প্রতি কথাটি নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। তিনি ধর্ম্ম মর্য্যাদারক্ষক। মর্য্যাদালঙ্ঘন কাহারও দেখিলেই তিনি তাঁহার ভক্তগণকে অত্যন্ত সাবধান করিয়া দেন। রঘুনাথকে তিনি স্বরূপ দামোদরের হাতে সমর্পণ দিয়াছেন। স্বরূপদামোদর গোস্বামী তাঁহার শিক্ষাগুরু। তাঁহার নিকটই তিনি সাধ্যসাধন তত্ত্ব শিক্ষা করিবেন,—ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। আর স্বরূপদামোদর গোস্বামী যে সে লোক নহেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পরম পণ্ডিত এবং ভজনবিজ্ঞ মহাজন।

ভক্তের সম্মান বাড়াইতে ভক্তবৎসল মহাপ্রভু যেমন সর্ব্বদা তৎপর, এমন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বরূপদামোদর গোসাঞির কিরূপ সম্মান বাড়াইলেন দেখুন। তিনি বলিলেন—

"আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে।"

ইহা অপেক্ষা উচ্চ সম্মান শ্রীভগবানের কাছে কেহ কখন পাইয়াছেন কি? ইহাই সম্মানের অবধি। এবং ইহাই শ্রীভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান।

এই কথাতে মহাপ্রভু স্বরূপদামোদর গোসাঞিকে বৈষ্ণবজগতের সর্ব্বপ্রধান গুরুপদে বরণ করিলেন, এবং তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দকে দেখাইলেন, শিক্ষাগুরু যে সে বস্তু নহেন,—দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুতে কোনই ভেদ নাই।

রঘুনাথকে তিনি বুঝাইলেন স্বরূপদামোদর গোসাঞির নিকট যে শিক্ষা পাইবে, স্বয়ং ভগবানের নিকটও তাহা পাইবে না।

মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া রঘুনাথদাস বড়ই অপ্রতিভ হইলেন এবং লজ্জায় তিনি আর তাঁহার চন্দ্রবদনের প্রতি চাহিতে পারিলেন না। কিন্তু ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ভক্তের মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। রঘুনাথের মনের বাসনা, তিনি মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশ কিছু শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন। ভক্তবৎসলপ্রভু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া হাসিয়া কহিলেন—

"তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষে॥" চৈঃ চঃ

এই যে মহাপ্রভুর উপদেশ ইহা ত্যাগাশ্রমী বৈরাগ্যবান্ রাগানুগায় বৈষ্ণবসাধক ভক্তদিগের পক্ষে প্রযোজ্য। রঘুনাথ উপলক্ষ্য মাত্র। এই সকল উপদেশ পালন অতিশয় কঠিন কার্য্য। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তবিষয়ক কথা ভিন্ন অন্য যে কোন কথা, তাহাই গ্রাম্যকথা। মহাপ্রভু বলিলেন কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা শুনিবে না,—এবং বলিবে না। ইহা বড় কঠিন কথা। ভাল খাইবে না এবং ভাল পরিবে না। ইহার মর্ম্ম অতিশয় নিগূঢ়। শ্রীমন্দিরসেবা যে সকল বিরক্ত বৈষ্ণব ভজনাঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীশ্রীভগবানচন্দ্রকে উত্তম উত্তম বস্তু ভোগ দিবেন, এবং সেই সকল প্রসাদ সাধু বৈষ্ণবকে বণ্টন করিবেন। স্বয়ং মাধুকরী করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। তিনি জিহ্বার লালসা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন,—ভোগ-লালসা থাকিলে বিরক্ত বৈষ্ণবের ভজনপথে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। এইজন্য ধর্ম্মরক্ষক মহাপ্রভু ত্যাগাশ্রমী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন বৈষ্ণবসন্ন্যাসী স্বয়ং অমানী হইয়া অপরকে সম্মান দান করিবেন এবং তাঁহারা সদাসর্ব্বদা কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবেন। একথা তিনি তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেও বলিয়াছেন—

"অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"

ইহাও অতিশয় কঠিন কার্য্য। সর্ব্বশেষে মহাপ্রভু সার কথাটি বলিলেন—

"ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে"।

এই যে মানসে রাধাকৃষ্ণসেবা, ইহা অতিশয় গুহ্য ভজন। সিদ্ধ দেহের কথা,—সিদ্ধাবস্থার ভজন। শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাতে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিয়মিত পূজা ভোগের ব্যবস্থা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য উত্তম উত্তম বস্তুর আহরণ এবং তদ্দ্বারা নিত্য ভোগ দেওয়া এবং ভোগের প্রসাদ ভোজন, ভগবদ্ভক্ত মাত্রেই করিয়া থাকেন। গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে ইহাই ব্যবস্থা। কিন্তু বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর পক্ষে এ ব্যবস্থা হইতে পারে না। বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ সংসারের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া বৈরাগ্যপথে সাধন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা পুনরায় যাহাতে জাগতিক কার্য্যে জড়িত না হন, মহাপ্রভু এই জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবেন। মানসে রাধাকৃষ্ণসেবা যে কি বস্তু, তাহা অনেকেই জানেন না এবং বুঝেন না। মহাপ্রভু স্বয়ং আচরিয়া ইহা তাঁহার ভক্তবৃন্দকে দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং সাধক ভক্তবৃন্দও এই কঠিন সাধনপথের পথিক হইয়া সিদ্ধদেহে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কৃপা ভিন্ন এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনপথের পথিক হইয়া সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব। মানসে রাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণ-মনন করিতে করিতে সাধক ভক্তবৃন্দ কিরূপে সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হন, তাহা ভক্তাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে তাঁহার এক অত্যদ্ভুত লীলারঙ্গের একটি চিত্র কৃপাময় পাঠকবৃন্দের সম্মুখে ধরিব। মানসে রাধাকৃষ্ণসেবা যে কি কঠিন বস্তু, তাহা বুঝিয়া লউন। ইহাই সর্ব্ববিধ বৈষ্ণবীয় সাধনের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। রঘুনাথদাস গোস্বামীকে মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাই শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং তিনি তাহাতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচলে চটক পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন গিরি ভ্রমে বায়ুবেগে পথে ছুটিতেছেন। তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার লাগ পাইতেছেন না। ইহাদিগের সঙ্গে তাঁহার মর্ম্মী ভক্ত এবং তাঁহার ব্রজের ভজনের সর্ব্ব প্রধান সহায় স্বরূপ দামোদর গোসাঞি আছেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভু পথে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন, তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদ্গম দৃষ্ট হইতেছে। ভক্তবৃন্দ তখন তাঁহার নিকটে বসিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার কানের কাছে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। এই ভাবে বহুক্ষণ এবং বহুবার কীর্ত্তন করিতে করিতে, মহাপ্রভু হঠাৎ হরিবোল বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। ভক্তবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বিস্ময়ভরে এদিক ওদিক চাহিতেছেন। তিনি যেন কোন বস্তুর অন্বেষণ করিতেছেন,—যেন কোন হারান-ধন খুঁজিতেছেন। সম্মুখে স্বরূপ দামোদরকে দেখিয়াই প্রেমভরে দুটি হস্ত দিয়া তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে করুণ বচনে তিনি কহিলেন—

"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কেন হেথা আনিল
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥
এথা হৈতে আজি মুঞি, গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখি যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণে ॥
গোবর্দ্ধন চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥
বেণু নাদ শুনি আইল রাধা ঠাকুরাণী।
তা'র রূপ ভাব আমি বর্ণিতে না জানি ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিল কন্দরাতে।
সখিগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ॥
হেন কালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহা হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা ॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পানু দেখিতে ॥" চৈঃ চঃ

এইরূপ ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু আকুলি বিকুলি করিয়া সেখানে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব প্রেমবিহ্বল ভাব দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণ কান্দিয়া অস্থির হইলেন।

ইহাকেই বলে মানসে রাধাকৃষ্ণসেবা। অবিশ্বাসী অভক্তেরা ইহা বিশ্বাস করিবে না,—শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত ধীমানদিগের ধীশক্তির ধারণায় ইহা আসিবে না,—কিন্তু ইহা পরম সত্য কথা, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইহাই পরম রহস্য-পূর্ণ গুহ্য ভজন-পন্থা। সিদ্ধদেহে মানসে রাধাকৃষ্ণসেবার ফল ও ক্রিয়া বাহ্য দেহে প্রকাশ হয়, তাহার শত শত প্রমাণ সাধু বৈষ্ণব মহাজন গৌরভক্তবৃন্দের পুণ্য চরিতাখ্যানে দেখা যায়। সে সকল কথা বিস্তারিতভাবে লিখিতে হইলে গ্রন্থবিস্তার হইবে, এই জন্য এই লীলাগ্রন্থে এ সকল নিগূঢ় তত্ত্বকথার আলোচনা করা সম্ভব নহে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু রঘুনাথ দাসকে এইভাবে অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে কৃতার্থ করিলেন। স্বরূপ দামোদর গোসাঞি সেই স্থানেই ছিলেন, মহাপ্রভু পুনরায় তাঁহার হস্তে রঘুনাথকে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ তাঁহার নিকট পরমানন্দে ব্রজের নিগূঢ় ভজন সাধন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করেন এবং মাসের মধ্যে দুই দিন সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করান। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু রঘুনাথের কুটীরে আসিয়া পরমানন্দে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এই ভাবে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। রঘুনাথ মনে মনে বিচার করিলেন ভিক্ষালব্ধ বিষয়ীর অন্ন দ্বারা মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করান অতিশয় গর্হিত কার্য্য,—ইহাতেই তাঁহার মন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতেছে না। মহাপ্রভুর ত পরের কথা। তাঁহার নিজের মনও এই অবৈষ্ণবীয় কার্য্যে দুষ্ট হইতেছে,—তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন। উপরোধে মহাপ্রভু তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন মাত্র,—কারণ তিনি ভক্ত-বৎসল। এই সকল বিচার করিয়া রঘুনাথ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করা একেবারে বন্ধ করিলেন। স্বরূপ দামোদর

গোসাঞিকে তিনি তাহার মনের কথা বলিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার বড় আনন্দ হইল।

একদিন মহাপ্রভু স্বরূপ গোসাঞিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল"?

স্বরূপ গোসাঞি তখন সকল কথা তাঁহার চরণকমলে নিবেদন করিলেন। বঙ্গিয়া মহাপ্রভু সে সকল কথা শুনিয়া হাসিয়া আকুল হইলেন। রঘুনাথের বিচারবুদ্ধি দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়া উপস্থিত অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দকে এ সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ দিলেন শুনুন,—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল তা নয়া সে আপনি ছাড়িল॥ চৈঃ চঃ

রঘুনাথ যাহা ভাবিয়াছিলেন সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভুও ঠিক তাই বলিলেন. ভক্তের উপরোধে ভক্তের ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু এই সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন, তিনি নিজ শ্রীমুখেই তাহা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথ এখন সিংহদ্বারের ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছেন, কারণ সেখানে বিষয়ীর অন্ন ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তিনি এক্ষণে ছত্রে যাইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু সকলি জানেন। তাঁহার প্রেরণাতেই রঘুনাথের এই তীব্র বৈরাগ্য, এবং এই বৈরাগ্যফলেই তাঁহার এইরূপ অপূর্ব্ব ভাব। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু এক দিন স্বরূপ গোসাঞিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "স্বরূপ! রঘুনাথকে ত আর এখন সিংহদ্বারে দেখিতে পাই না। সে এখন কি করে?" স্বরূপ দামোদর কহিলেন "রঘুনাথ এখন মধ্যাহ্ন কালে ছত্রে গিয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে"। সর্ব্ব ধর্ম্মরক্ষক শিক্ষাগুরু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

———ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি বেশ্যার আচার॥" চৈঃ চঃ

কি ভয়ানক কথা! নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণের ভিক্ষাবৃত্তিই জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন, এবং ইহাই তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ। মহাপ্রভু এই ভিক্ষাবৃত্তিকে বেশ্যাবৃত্তির সহিত তুলনা করিলেন!, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি উপস্থিত ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভুর তাঁহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে আর বাকি থাকিল না। তিনি তখন স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখের বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তবৃন্দকে স্বরচিত শ্লোকে আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। যথা—

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি, অনেন দত্তং অয়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি, ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি॥

অর্থাৎ এই জন আসিতেছে — এই জন দান করিবে,— এই ব্যক্তি দান করিয়াছিলেন,—আর এক জন আসিবে,— সে দান করিবে —এই রূপ মনে ভাবিয়া ভিক্ষা করা আর বেশ্যাবৃত্তি করা একই কথা।

ভক্তগণ তখন মহাপ্রভুর উপদেশের প্রকৃত অর্থ ও নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিলেন এবং প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।

বৈরাগ্যবান্ রঘুনাথের কর্ণে এই কথা গেল। তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য তীব্রতর হইতে তীব্রতম হইল। দয়াময় মহাপ্রভু তাঁহার অতি প্রিয়তম ভক্ত রঘুনাথের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিলেন।

মহাপ্রভু যখন নীলাচলে থাকেন শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধনশিলা এবং গুঞ্জামালা লইয়া আসিলেন, তিনি এই দুইটি বস্তু তাঁহাকে ভেট দিলেন। মহাপ্রভু মহা সন্তুষ্টচিত্তে এই দুইটি পরম বস্তুকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তিনি যখন নাম স্মরণ করেন গুঞ্জামালা তখন প্রেমভরে গলদেশে ধারণ করেন, আর গোবর্দ্ধনশিলা কখন কখন মস্তকে, কখন হৃদয়ে, কখন নেত্রের উপর, ধারণ

করিয়া প্রেমানন্দে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। কখনও নাসিকার নিকট গোবর্দ্ধনশিলা লইয়া আঘ্রাণ করেন। তাঁহার নয়নধারায় এই গোবর্দ্ধনশিলা সর্ব্বদা সিক্ত হইতেন। মহাপ্রভু এই শিলাকে শ্রীকৃষ্ণের কলেবরজ্ঞানে প্রেমানন্দে দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, এবং আস্বাদন করিয়া পুলকানন্দে বিভোর হইতেন। তিন বৎসর কাল তিনি এইরূপ গোবর্দ্ধনশিলার ভজন পূজন করিলেন।

একদিন রঘুনাথ মহাপ্রভুর শ্রীচরণসরোজ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি এক্ষণে অতিশয় সদয়। তাঁহার শ্রীহস্তসেবিত, নয়নের প্রেমজল-সিঞ্চিত এবং শ্রীবক্ষস্থলে রক্ষিত এই প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকলেবর তুল্য গোবর্দ্ধনশিলা তিনি তাঁহার কৃপার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত রঘুনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা রঘুনাথের হস্তে দিয়া পরম প্রেমভরে গদগদ বচনে কহিলেন—

——— এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন॥
এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু কহিলেন, এই গোবর্দ্ধনশিলাকে সাত্ত্বিক ভাবে পূজা করিবে। পূজা তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক পূজার ব্যবস্থা প্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে রঘুনাথকে বলিয়া দিলেন। জল আর তুলসী এই পূজার উপকরণ। গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়া এইরূপ সাত্ত্বিকভাবে পূজা করিয়াই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গোলোক হইতে শ্রীগৌর-ভগবানকে মর্ত্তভূমে আনিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন,—

জল তুলসী সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়। (১) চৈঃ চঃ

বিধিমত তিনটি তুলসী পত্র দিয়া শ্রীভগবানের চরণ পূজা কর্ত্তব্য। মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীকৃষ্ণকলেবর গোবর্দ্ধন শিলার দুই চরণে দুই তুলসী পত্র দিবে এবং তন্মধ্যে কোমল মঞ্জরী দিবে। এইরূপে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অষ্ট মঞ্জরী দিয়া পূজা করিবে। ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। তবে শ্রীগৌরাঙ্গচরণ স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার সেই নিত্যসিদ্ধ ভক্তবৃন্দের চরণ ধ্যান করিয়া ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিবার প্রয়াস মাত্র করিব। স্বরূপ দামোদর গোসাঞি বলিয়া গিয়াছেন—

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবেত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু কহিলেন গোবর্দ্ধন শিলার দুই দিকে দুইটি তুলসী পত্র দিবে। ইহার ভাবার্থ শ্রীশ্রীরাধা ও কৃষ্ণের যুগল চরণে দুইটি তুলসী পত্র দিবে শ্রীশ্রীরাধা ও মাধবের যুগল চরণ মধ্যে একটি কোমল তুলসী মঞ্জরী দিবে। এই ভাবে এক একটি করিয়া অষ্ট মঞ্জরী দিবে, অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগল চরণ পূজা করিয়া তাহার পর এক এক করিয়া প্রধানা অষ্ট সখির পূজা করিবে। সখিবৃন্দসহ শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের যুগলভজন-প্রণালী মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত রঘুনাথকে ইঙ্গিতে বলিয়া দিলেন। সদ্‌গুরু কৃপায় এক্ষণে প্রকৃত শ্রীগৌরতত্ত্ব এবং পরতত্ত্ব যাঁহারা সম্যক্‌ভাবে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিতবপু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের বাতুল চরণকমলে দুইটি তুলসী দিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল চরণভজনানন্দে বিভোর হন এবং তাঁহারই চরণে অষ্ট মঞ্জরী দিয়া অষ্ট সখিসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের মধুর ভজন করেন।

ইহাই মানসিক উপাসনা ও সাত্ত্বিক পূজাবিধি। রাজসিক পূজা ষোড়শোপচারে দশোপচারে পঞ্চোপচারেও হইয়া থাকে। ধূপ দীপ নৈবেদ্য বস্ত্রালঙ্কার গন্ধ চন্দন ভোগ আরতি প্রভৃতি রাজসিক পূজার উপকরণ। বাহ্য

(১) তুলসীদল মাত্রেন জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যোঃ ভক্তবৎসলঃ॥
গৌতমীয় তন্ত্রে নারদবচন

গীত নৃত্য প্রসাদদান দান দরিদ্রভোজন এই পূজার অঙ্গ তামসিক পূজা তামসিক ভক্তে করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে শাস্ত্রে ভক্তাধম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন--

শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে ভক্ত না আদরে।
সর্ব নীচ পতিতেরে দয়া নাহি করে।
এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর॥
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার।
বলরাম শিব প্রতি প্রীতি নাহি করে।
ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এসব জনারে॥

আর এক প্রকার তামসিক পূজা তামসিক নাস্তিক ভক্তগণ করিয়া থাকেন, তাহা ভগবতপূজার নাম করিয়া আত্মপূজা মাত্র। পঞ্চমকার লইয়া পূজন, জীবহিংসা করিয়া পূজন, এই তামসিক পূজার অন্তর্গত।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে সাত্ত্বিকভাবে গোবর্দ্ধনশিলার পূজন করিতে বলিলেন। প্রেমানন্দে রঘুনাথদাস মহাপ্রভু দত্ত ও তাঁহার পূজিত গোবর্দ্ধনশিলা মস্তকে ধরিলেন এবং প্রেমভরে সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু স্বরূপ গোসাঞি তাঁহাকে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ দুইখানি বস্ত্র দিলেন, সেই সঙ্গে একখানি ছোট কাঠের পিড়া এবং জল আনিবার জন্য একটী কুঁজা দিলেন। এই হইল রঘুনাথের ঠাকুর সেবার সরঞ্জাম। তিনি পরম প্রীতি-সহকারে গোবর্দ্ধনশিলার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূজার সময় তিনি দেখিতে লাগিলেন প্রভুদত্ত এই গোবর্দ্ধন শিলা সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর তাঁহার নয়নের প্রেমজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল (১)। এই ভাবে কিছু দিন কাটিয়া গেল। স্বরূপ গোসাঞি একদিন রঘুনাথকে আজ্ঞা করিলেন তিনি তাঁহার ঠাকুরকে আট কড়ার খাজা ভোগ দিতে পারেন। প্রেমানন্দে উন্মত্ত রঘুনাথ তাহাই করিলেন। এই আদেশেরও মর্ম্ম আছে। রঘুনাথ মহাপ্রভুর আদেশে জল তুলসী দিয়া তাঁহার সর্ব্বস্বধনকে সাত্ত্বিকভাবে পূজা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মনে মধ্যে মধ্যে বাসনা হয় তাঁহার প্রাণের ঠাকুর ইষ্টদেবকে কিছু ভোগ দেন। মহাপ্রভুর উপদেশবাণী তিনি বর্ণে বর্ণে পালন করিতেছেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভুর প্রেরণায় স্বরূপ গোসাঞির মনে যে এই ভাবটি উদয় হইল, ইহাও তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের পরিচয়। তিনি রঘুনাথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

রঘুনাথের এই যে মানসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণসেবা,—ইহা চিন্তা করিবার বস্তু, দেখিবার বস্তু নহে। তাঁহাকে যখন মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনশিলা দিলেন, তিনি মনে করিলেন তিনি তাঁহাকে গোবর্দ্ধনে স্থান দিলেন। গুঞ্জামালা পাইয়া তিনি ভাবিলেন, মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকা জিউর শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন, এই ভাবিয়া তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলবিলাসরসে মগ্ন হইলেন। নীলাচল তাঁহার বৃন্দাবন হইল,—শ্রীগৌরাঙ্গ চরণই তাঁহার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল চরণ হইল। প্রকৃত তত্ত্ব ইহা,—সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ স্বরূপ গোসাঞি তাহা রঘুনাথকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাই তিনি কায়মনো বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। অষ্টপ্রহর দিবারাত্রির মধ্যে সাড়ে সাত প্রহর তাঁহার ভজনে অতি বাহিত হইত, আহার নিদ্রা প্রভৃতি ক্রিয়ার জন্য তিনি চারি দণ্ড মাত্র রাখিয়াছিলেন। কোন কোন দিন তাহাও থাকিত না। তিনি কখনই নিয়মভঙ্গ করিতেন না, তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।"

তাঁহার এই বিকট বৈরাগ্যের কথা স্মরণ করিলেও মন পবিত্র হয়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন —

বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিঁড়া কাণি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥

(১) এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
প্রভুর শ্রীহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥ চৈঃ চঃ

প্রাণ রক্ষা লাগি যেবা করয়ে ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনা করে নিবেদন॥

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! রঘুনাথের এই বিকট বৈরাগ্যের পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। শ্রীগৌরভগবানের পরীক্ষা অতিশয় কঠিন। তিনি রঘুনাথকে সর্ব্বভাবে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে শ্রীবৃন্দাবনবাসের উপযোগী করিবেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। রঘুনাথ এক্ষণে আর ছত্রে প্রসাদ পাইতে যান না। মহাপ্রভু কিছু বলেন নাই,—কিন্তু রঘুনাথ আপনা হইতেই ছত্রে ভিক্ষা করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এখন কিরূপে জীবন ধারণ করেন তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শুনুন। শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে আনন্দবাজারে প্রসাদ বিক্রয় হয়, তাহা সকলেই জানেন। দোকানী পসারিগণ এই প্রসাদান্ন যাত্রীদিগকে বিক্রয় করে। যে সকল প্রসাদান্ন দুই তিন দিন পর্য্যন্ত বিক্রয় না হয়, এবং বাসি পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেই সকল অন্নাদি সিংহদ্বারের তৈলঙ্গী গাভীদিগকে খাইতে দেয়। পচা গন্ধে গাভীগণও যাহা খাইতে পারে না, সেই সকল প্রসাদ রঘুনাথ রাত্রিকালে কুড়াইয়া নিজ ভজনকুটীরে লইয়া আসেন। বহু পরিমাণে জল দিয়া সেই সকল পর্য্যুষিত অন্নগুলি ধুইয়া তাহার মধ্য হইতে যে অন্নটির মধ্যে মাইজ আছে অর্থাৎ মধ্যভাগ ঠিক আছে, তাহাকে পৃথক করিয়া রাখেন। এইরূপভাবে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া কোনমতে দুই এক গ্রাস অন্ন সংগ্রহ করিয়া তাহাতে একটু লবণের ছিটা দিয়া, তাহাই পরমানন্দে ভোজন করিয়া দেহ রক্ষা করেন। ইহাতেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। জগন্নাথের মহাপ্রসাদের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি করিবেন না,—এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই মাত্র প্রাণ রক্ষার এই অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। স্বরূপ গোসাঞি একদিন রঘুনাথের কুটীরে আসিয়া ইহা স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাঁহার নিকট এই অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া কিছু ভোজন করিলেন। তিনি প্রসাদ পাইয়া রঘুনাথকে হাসিয়া কহিলেন—

——"ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবায় নাহি দাও কি তোমার প্রকৃতি॥" চৈঃ চঃ

রঘুনাথ মহা লজ্জিত হইলেন,—তাঁহার শিক্ষাগুরুর কথা শুনিয়া অধোবদনে রহিলেন। কি আর উত্তর করিবেন? গুরুদেবকে লোকে উত্তম উত্তম বস্ত্র দান করেন, উত্তম ভোজন করান, আজ তিনি তাঁহার কুটীরে তাঁহার গুরুদেব পর্য্যুষিত প্রসাদান্ন ভোজন করিলেন, ইহাতে রঘুনাথের মনে আর দুঃখের সীমা রহিল না। তাই কিছু না বলিয়া মনদুঃখে অধোবদনে ঝুরিতে লাগিলেন।

স্বরূপ দামোদর গোসাঞি এই কথা একদিন গোবিন্দকে বলিলেন। গোবিন্দও সময় বুঝিয়া এই কথাটি একদিন মহাপ্রভুর কানে তুলিলেন। ইহা শুনিয়া ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর মনে বড় দুঃখ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও হইল। রঘুনাথ যে মহাপ্রসাদ পান, তাহার প্রতি তাঁহার লোভও হইল। তিনি স্বয়ং পরদিন সন্ধ্যার পর স্বরূপকে সঙ্গে লইয়া হঠাৎ রঘুনাথের কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ সেই পর্য্যুষিত প্রসাদান্নগুলি কেবলমাত্র একত্রিত করিয়া প্রসাদ পাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মহাপ্রভুকে তাঁহার কুটীর দ্বারে দেখিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া আসনে উপবেশন করিয়া মহাপ্রসাদ দর্শন করিয়া হাস্যবদনে কহিলেন—

"খাসা বস্তু খাও সবে আমায় না দেহ কেন?" এই কথা বলিয়াই সেই পর্য্যুষিত প্রসাদান্নের এক গ্রাস তুলিয়া শ্রীমুখে দিলেন। তিনি যেমন আর এক গ্রাস লইতে যাইবেন, স্বরূপ গোসাঞি তখন হায় হায় করিয়া প্রভুর শ্রীহস্ত হইতে জোর করিয়া তাহা কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন "প্রভুহে! ইহা তোমার যোগ্য নহে"। (১) স্বরূপের প্রতি প্রভু করুণনয়নে একবার চাহিলেন। এবং প্রেমগদগদ বদনে কহিলেন—

(১) এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণ।
আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা॥
তোমার যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিলা॥ চৈঃ চঃ

—"নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।

ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥" চৈঃ চঃ

রঘুনাথ কুটীরের এক কোনে করযোড়ে জড়বৎ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার ক্ষীণ শরীর পরিধানে শতগ্রন্থি বস্ত্র খণ্ড,—নয়ন ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। মহাপ্রভুর এই প্রসাদভোজন লীলারঙ্গ দেখিয়া তিনি মনঃদুঃখে লজ্জায় এবং অনুতাপে বিষম কাতর হইয়া জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ভাবিতেছেন আজ কি সর্ব্বনাশ হইল! সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান মহাপ্রভুকে আজ আমি কি ভোগ দিলাম! কত লোকে কত উত্তম উত্তম বস্তু দিয়া তাঁহার ভোগ দিতেছে,—আজ আমার কুটীরে তিনি শ্রীহস্তে কি খাইলেন? আমার পরম সৌভাগ্য তাই তিনি আজ কৃপা করিয়া এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি একি করিলেন? এইরূপ মনঃদুঃখে এবং মর্ম্ম পীড়ায় রঘুনাথ নিতান্ত কাতর হইয়া দাঁড়াইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া মৃদু মধুর হাসিতেছেন। ভক্তের ভগবান ভক্তের জন্য কি না করিয়াছেন, এবং কি না করিতে পারেন? রঘুনাথের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গটি ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। মহাপ্রভুর এই লীলারঙ্গটির মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। এই অপরূপ লীলারঙ্গ দ্বারা তিনি তাঁহার ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বুঝাইলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্যের সীমা দেখাইলেন। এই কার্য্যে রঘুনাথের গৌরাঙ্গপ্রেম লক্ষগুণ বর্দ্ধিত হইল, ভক্তবৃন্দের মনে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য সুদৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল এবং তাঁহারা মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় পাইয়া তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিলেন,—ইহাতে তাঁহাদিগের মনেও গৌরাঙ্গপ্রীতি শত গুণ বর্দ্ধিত হইল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত"

এস্থলেও তাহাই হইল। মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসমুদ্র-বারির এক একটি ধারা হইতে শতধারা প্রবাহিত হইয়া জগত প্লাবিত করে। ইহা ধ্রুবসত্য,—এ কথার প্রতি বর্ণ সত্য।

এই রঘুনাথদাসকে মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনধামের যোগ্য করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে তিনি নির্জ্জন ভজন করিতেন। তাঁহার অনন্ত গুণের কথা বর্ণনা করিবার শক্তি জীবাধম গ্রন্থকারের নাই। পূজ্যপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে রঘুনাথ দাস গোস্বামী সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়—
তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধি গুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক সততং স্নিগ্ধ স্বরূপানুগো,
বৈরাগ্যৈকনিধিঃ কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং॥

অর্থাৎ বাসুদেব দত্তের পরম প্রিয়তম, পরম প্রেমবান যদুনন্দন আচার্য্য ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য, বিবিধ গুণের গুণমণি রঘুনাথদাস আমাদের প্রাণাধিক। নীলাচলস্থিত জনগণের মধ্যে এমন কে আছেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাতিশয়লাভে পরম স্নিগ্ধ এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পরম প্রিয়পাত্র, এবং বৈরাগ্যের সাগর রঘুনাথকে না জানেন?

রঘুনাথদাসকে মহাপ্রভু তাঁহার সাবশেষ কৃপাপাত্র ছয় গোস্বামীর এক গোস্বামী করিয়া জগতকে শিক্ষা দিলেন ধর্ম্মজগতে জাতিকুলের বিচার নাই,—যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনিই গুরু। হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রঘুনাথকে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উচ্চপদ দান করিলেন। তিনি কাশীতে বসিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—

কিবা ন্যাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ বেত্তা সেই গুরু হয়॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু তাঁহার এই মহাবাণীর সার্থকতা করিলেন—রঘুনাথকে দিয়া। রঘুনাথ শূদ্র হইয়াও বর্ণশ্রেষ্ঠ বিপ্রের শ্রেষ্ঠ হইলেন এবং বিপ্রেরও গুরু হইলেন।

রঘুনাথদাস গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্য-স্তবকল্পবৃক্ষ গৌরভক্তবৃন্দের নিত্যপাঠ্য ও আস্বাদনের বস্তু। তিনি

নীলাচলে থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গলীলা স্বচক্ষে দেখিয়া দ্বাদশ শ্লোকপূর্ণ এই গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরু গ্রন্থিত করিয়াছিলেন। ইহা প্রথম খণ্ডের সর্ব্বপ্রথমেই মুদ্রিত হইয়াছেন। তাহা হইতে এই শ্লোকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল মাত্র।

মহা সম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাংন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

অর্থ—

আমি অভাজন জন, বেষ্টিত সম্পদ-বন
সে বনে বিতাপ দাবানল।
করুণাতে উদ্ধারিয়ে, স্বরূপে আশ্রয় দিয়ে
প্রকাশিল আনন্দ প্রবল॥
বক্ষস্থিত গুঞ্জাহার, গোবর্দ্ধন শিলা আর
সমর্পিল দয়া করি মোরে।
এ হেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি
সে আনন্দ দেখা কেবা করে॥

এই রঘুনাথদাস গোস্বামীর মুখে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর এই অপূর্ব্ব নীলাচললীলা শ্রবণ করিয়া পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ অবলম্বনে মহাপ্রভু ও রঘুনাথদাসপ্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত হইল।

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা॥

তবে যতটুকু শক্তি কৃপা করিয়া মহাপ্রভু দিয়াছেন সেই শক্তিবলে এই সিদ্ধ মহাজন মহাপুরুষের কিছু গুণগান করিয়া আত্মশোধন করিলাম মাত্র। মহাপ্রভুর বড় আদরের ধন ছিলেন রঘুনাথ—তিনি পরম প্রেমভরে তাঁহাকে ডাকিতেন "স্বরূপের রঘু"। সেই—

স্বরূপের রঘুনাথ দয়া কর মোরে।
(যেন) জন্মে জন্মে তবগুণ গাহি প্রাণ ভরে॥
দুরমতি দুরজন দাস হরিদাসে।
উদ্ধারহ কৃপানিধি! ধরি তার কেশে॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

—:*:—

নীলাচলে জগদানন্দ ও মহাপ্রভু।

—:*:—

'চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।"
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর নিরতিশয় প্রেমপাত্র ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি যখন নবদ্বীপ অন্ধকার করিয়া নীলাচলে আগমন করেন, জগদানন্দ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসেন। তিনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর একজন প্রতিবেশীপুত্র এবং বাল্যবন্ধু তিনি ছিলেন। তাঁহার সহিত মহাপ্রভু বাল্যলীলারঙ্গ করিয়াছেন,—সে সকল লীলাকথা শ্রীনবদ্বীপলীলার পরিশিষ্টে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মহাপ্রভুর অভিমানী ভক্ত ছিলেন,—বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহাকে এই জন্য সত্যভামার অবতার বলিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাই তাঁহার প্রধান কাম্য ছিল। ইহাই তাঁহার ভজন সাধন ছিল। মধুরভাবে তিনি মহাপ্রভুকে ভজনা করিতেন, তাঁহার ভাব ঠিক অভিমানিনী শ্রীমতি সত্যভামার মত। প্রাণপতি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার প্রতি তাঁহার বড় অভিমান। মহাপ্রভুও তাঁহার এই অভিমানী ভক্তের এইরূপ পরম প্রীতিসেবা বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, ইহাতে জগদানন্দের মনে অতিশয় দুঃখ। এই বিষয় লইয়া মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার রসকোন্দল হইত। এই রসকোন্দলে জগদানন্দই জিতিতেন, আর মহাপ্রভু হারিতেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাতি যিনি সত্যভামার স্বরূপ॥

প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন
বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন।
দুই জনে খটমটি লাগয়ে কোন্দল ॥

জগদানন্দ মহাপ্রভুর একান্ত মর্ম্মীভক্ত। তাঁহার আদেশে জগদানন্দ নীলাচল হইতে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সমাচার লইয়া তাঁহাকে জানাইতেন। এই সাংসারিক গুপ্ত সংবাদ বহনের ভার ছিল পণ্ডিত জগদানন্দের উপর। মহাজন-কৃত প্রাচীন পদে পণ্ডিত জগদানন্দের নবদ্বীপ-আগমন-কাহিনী পাঠ করিলে নয়নের জল সম্বরণ করা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলারস-লোলুপ কৃপাময় পাঠকবৃন্দের আস্বাদনের নিমিত্ত এসম্বন্ধে দুইটি প্রাচীন পদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

(১) ধানশী।

নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে, দেখে নদীয়ারে, গোকুল পুরের ছন্দ ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।

পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে, এই অনুমানে যায়।
লতা তরু যত দেখি শত শত, অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ, না হয় স্ফুরণ, মেঘগণ দেখে রাতা ॥
শাখে বসি পাখী, মুদি দুটি আঁখি, ফল জল তেয়াগিয়া।
কাঁদয়ে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি, গোরাচাঁদ নাম লৈয়া ॥
ধেনু যূথে যূথে দাঁড়াইয়া পথে, কার মুখে নাই রা।
মাধবী দাসের, ঠাকুর পণ্ডিত, পড়িল আছাড়ি গা ॥

(২)

ক্ষণেকে রহিয়া, চলিল উঠিয়া, পণ্ডিত জগদানন্দ।
নদীয়া নগরে, দেখে ঘরে ঘরে, কাহার নাহিক স্পন্দ ॥
না মেলে পসার,না করে আহার,কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী, কাঁদয়ে গুমরি, থাকয়ে বিরলে বসি ॥
দেখিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর, প্রবেশ করিল যাই।
আধমরা হেন, পড়ি আছে যেন, অচেতনে শচীমাই ॥
প্রভুর রমণী, সেই অনাথিনী, প্রভুরে হইয়ে হারা।
পড়িয়া আছেন মলিন বসনে, মুদিত নয়নে ধারা ॥
বিশ্বাসী প্রধান, কিঙ্কর ঈশান, নয়নে শোকাশ্রু ঝরে।
তবু রক্ষা করে, শাশুড়ী বধূরে সর্ব্বদা শুশ্রূষা করে ॥
দাস দাসী সব, আছয়ে নীরব, দেখিয়া পথিক জন।
সুধাইছে তারে, কহ মো সবারে, কোথা হৈতে আগমন ॥
পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন, নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গ সুন্দরে,পাঠাইল মোরে, তোমা সবারে দেখিতে ॥
শুনিয়া বচন, সজল নয়ন, শচীরে কহল গিয়া।
আর একজন, চলিল তখন, শ্রীবাস মন্দিরে ধাঞা ॥
শুনিয়া উল্লাস, মালিনী শ্রীবাস, যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল, পরাণ পাইল আসি।
মালিনী আসিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠাইল ত্বরা করি।
বলে চাহি দেখ, পাঠাইলা লোক, তত্ত্ব লৈতে গৌরহরি ॥
শুনি শচী মাত, সচকিত চাই, দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে ওরে ভাই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কত দূরে ॥
দেখি প্রেমসীমা, স্নেহের মহিমা, পণ্ডিত কাঁদিয়া কয়।
সেই গৌরমণি, যুগে যুগে জানি, তুয়া প্রেমে বশ হয় ॥
গৌরাঙ্গচরিত, হেন নীতরীত,সবাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা, নদীয়া নগরে, সবাকারে সুখ দিয়া ॥
এ চন্দ্রশেখর, পশুর সোসর, বিষয়-বিষেতে প্রীত।
গৌরাঙ্গচরিত, পরম অমৃত, তাহাতে না লয় চিত ॥

এই মধুর পদটি মহাপ্রভুর মেসো মহাশয় চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের রচিত বলিয়াই বোধ হয়। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর তিনি নবদ্বীপে ছিলেন। মহাপ্রভুর বিরহে তিনি প্রাণে মরিয়া ছিলেন। পণ্ডিত জগদানন্দের দেখা পাইয়া, এবং তাঁহার নিকট প্রভুর নীলাচল লীলাকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার গৌরবিরহদগ্ধ মৃত প্রাণে যেন সঞ্জীবনী সুধা বর্ষিত হইল। তিনি নয়নের জল দিয়া এই পদরত্নটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তিনি জগন্নাথের একখানি বহুমূল্য প্রসাদী বস্ত্র জগদানন্দের হস্তে, জননীর উদ্দেশে পাঠাইয়াছেন এবং এইসঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রসাদও দিয়াছেন। এই যে বস্ত্র খানি, ইহা সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথায় পাইলেন? তিনি ত সন্ন্যাসী, তিনি

বস্ত্র কোথায় পাইলেন? মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র প্রতি বৎসর রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমীর উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে এক একখানি বহুমূল্য পট্টবস্ত্র দান করিতেন। মহাপ্রভু যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অপূর্ব্ব প্রেমনৃত্য করিতেন, সেই সময় জগন্নাথদেবের সেবকগণ রাজার আদেশে এই বহুমূল্য পট্ট-বস্ত্রখানি তাঁহার শ্রীমস্তকে বান্ধিয়া দিতেন। বাহ্যজ্ঞান শূন্য মহাপ্রভু প্রেমাবেগে নৃত্য করিতে করিতে যখন ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িতেন, এই বহুমূল্য বস্ত্র তাঁহার শিরোদেশ হইতে রাজপথের ধূলায় নিপতিত হইত। তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য গোবিন্দ তাঁহার নিকটেই থাকিতেন। রাজার ইচ্ছায় এবং পার্যদ ভক্তমহাজনগণের ইঙ্গিতে এ সকল বস্ত্র গোবিন্দ অতি যত্নে সংগ্রহ করিয়া লুকাইয়া রাখিতেন, যখন কেহ নবদ্বীপে যাইত, মহাপ্রভুর সম্মতিক্রমে এই বস্ত্র তাঁহার গৃহে পাঠাইতেন। মহাপ্রভু জানেন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এই বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিবেন না। তবে কাহার জন্য তিনি এই বস্ত্র নবদ্বীপে পাঠান? ইহার মর্ম্ম কৃপাময় পাঠক বৃন্দ বুঝিয়া লউন। মহাপ্রভু কি তাঁহার চিরদুঃখিনী চরণের দাসী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ভুলিতে পারিয়াছেন? কখনই নহে। মুখে নাম না করুন, প্রাণে তাঁহার জন্য তিনি কাঁদেন। তাঁহার জন্যই মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এই সকল উত্তম পট্টবস্ত্র গোপনে নবদ্বীপে ভক্তগণের হাতে দিয়া পাঠান হইত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস যে কপট সন্ন্যাস, তাহা মহাজনগণ অতি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর নবহরি তাঁহার গৌরাঙ্গাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই প্রভুর সন্ন্যাসবেশকে কপট সন্ন্যাসবেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য ঠাকুর লোচনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে প্রভুর কপট সন্ন্যাসীর ভাবটি সাধক শিরোমণি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্তিতে যেরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন, মহাপ্রভুর মধুর ভজননিষ্ঠ ভাগ্যবান ভক্তবৃন্দের মনে সেই মধুর ভাবটি বড় ভাল লাগে। সেই রসময় কথাটি এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথম নীলাচলে উদয় হইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনে বহু ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি "এই নবীন সন্ন্যাসী এত কাঁদেন কেন? রাধা রাধা বলিয়া এত বিমনা হন কেন?" তাঁহার মনে ধারণা হইল—

ঘর মনে পড়ে তেঞি রাধা বলি কান্দে।
বিপাকে পড়িলা ন্যাসী সন্ন্যাসীর ফান্দে॥ চৈঃ মঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অতিশয় বিচক্ষণ প্রাচীন লোক,—তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার সমাধান করিয়া লইলেন। তখন মহাপ্রভু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন তাঁহার ছাত্র পড়াইতেছিলেন এবং এই বিষয়টি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন এবং নিজের মনোভাব গোপন করিতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্যগণের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় মহাপ্রভু হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যেন চমকিয়া উঠিলেন। মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ দুই একজন ভক্তও ছিলেন। তিনি আসনে উপবেশন করিয়া অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি আমাকে যে বেদান্ত পড়াইতে চাহেন, তাহা অতি উত্তম। আমি এই তরুণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভাল করি নাই—

"তরুণ বয়স নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম"।

আমার পক্ষে আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহাই ব্যবস্থা করুন। আপনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

"ঘর মনে পড়ে তেঞি কান্দি রাধা বলি।
কীর্ত্তনের মাঝে তেঞি করিয়ে বিকলি॥" চৈঃ মঃ

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার মনের ভাব এরূপ সুস্পষ্ট বাক্যে শুনিয়া কীয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। তিনি মনে মনে বড় সঙ্কুচিত হইয়া ভাবিলেন আমার মনের কথা এই নবীন সন্ন্যাসী জানিলেন কিরূপে? তাঁহার এই কথা কি প্রকৃত না বিদ্রূপাত্মক? এই ভাবিয়া মুখে তিনি কিছুই আর

বলিতে পারিলেন না (১)। মহাপ্রভুও সেদিন অধিক আর কিছু বলিলেন না। উভয়ের মনের ভাব উভয়ের মনেই রহিল।

মহাপ্রভুর এই লীলাটি তাঁহার সর্ব্বোত্তম নরলীলার সম্পূর্ণ পরিচায়ক। তাঁহার যে এই কপট সন্ন্যাস,—তাহা তিনি লুকাইলেন না। মহাপ্রভুর এই গুপ্ত ভাবটি সিদ্ধ মহাজন কবি ঠাকুর লোচনদাসের মনে তিনিই উদয় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সূত্ররূপে তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এখন সাধারণ ভক্তসমাজে অনধিকারীগণের মধ্যে মহাপ্রভুর কপট সন্ন্যাসভাবটি গৃহীত হইতে পারে না। তাহার কারণ তাঁহারা বলেন শিক্ষাগুরু শ্রীগৌরভগবান কপটতা আচরণ করিয়াছিলেন,—এভাব শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ এবং ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ। একথা সত্য, কিন্তু স্বয়ং ভগবানে সর্ব্ববিধ ভাব সন্নিবিষ্ট,—স্বয়ং ভগবান সর্ব্বভাবের সমষ্টি এবং সর্ব্বভাবের অতীত। তিনি ভাবগ্রাহী,—চৌরাভাব, লম্পটভাব, কপটতাভাব তাঁহার প্রতি আরোপ করিয়াছেন,—সিদ্ধ মহাজনগণ,—শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন তাঁহার চৌরাষ্টকে,—"চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি",—ঠাকুর নরহরি সরকার লিখিয়াছেন, "লম্পটগুরু" ইত্যাদি। এই ভাবেও ভাবগ্রাহী শ্রীগৌরভগবানের ভজন সিদ্ধ—তবে এই ভাবের অধিকারী—একান্ত বিরল। তাই বলিয়া এ ভাবকে নিন্দা করা মহাপাপ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধমহাজনগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিবার সাহসকে আমরা দুঃসাহস বলি। মহাপ্রভুর কপট সন্ন্যাসের প্রমাণ নিম্নে কিছু উদ্ধৃত হইল (১)

(১) এথা না কহিল কথা নিজ শিষ্য সনে।
একথা সকল ন্যাসী জানিল কেমনে॥
মনে অনুমান করি লজ্জায় পীড়িত।
কিছু না কহিল হিয়ায় রহিল বিস্মিত। চৈঃ মঃ

(১) প্রভু বলে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥ চৈতন্যভাগবত।

(২) সেহ ত কপট-ন্যাসী, তার লীলা ভালবাসি,
মধুমাখা কথা শুনি তার।

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! কথায় কথায় বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি,- লীলারসভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইয়াছি! নিজ গুণে আপনারা অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। দুষ্ট মন লীলারসে মগ্ন হইতে চাহে না, জানিবেন লেখকের দুষ্ট মনকে শাসন করিবার প্রকৃত কর্ত্তা আপনারাই। কৃপা করিয়া হস্তে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করুন, -মস্তক পাতিয়া আছি। মহাপ্রভুকে কপট-সন্ন্যাসী বলায় অনেকে আমাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইবেন, তাহা জানিয়াও এই প্রার্থনা করিতেছি।

পণ্ডিত জগদানন্দের সহিত মহাপ্রভুর লীলাকথা অতিশয় রসময়। সেই সকল রসময় অপূর্ব্ব কথা এখন বলিব।

নবদ্বীপে আসিয়া পণ্ডিত জগদানন্দ কি করিলেন, তাহা কবিরাজ গোস্বামীর কথায় শুনুন—

আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র কৈল নিবেদন॥
প্রভুর নাম করি মাতারে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনতি স্তুতি মাতারে কহিলা॥

যে ভাব ব্রজেতে ছলে, পুনঃ সেই ভাব এবে,
বুঝেও না বুঝি আর তাহে॥ পণ্ডিত জগদানন্দ

(৩) বমস্থং মাধুর্য্যময়মধিনিব কোটিবর শশু-
ছটাভি স্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাস কপটং॥
শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী।

(৪) "আশ্চর্য্যং সখি। পশ্য লম্পটগুরো সন্ন্যাসিবেশং স্থিতো"
ঠাকুর নরহরি।

(৫) মাতৃসেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ।
* * * *
"যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন।" চৈতন্য ভাগবত।

(৬) কি করিলাম কাজ, সন্ন্যাসে পড়ুক বাজ,
মোর বড় হৃদয় পাষাণ।
নাহি যাব নীলাচলে, থাকিব জনক কোলে,
ইহা বলি হইল পেয়ান॥
মহাপ্রভুর উক্তি—বাসুঘোষ।

(৭) কপট সন্ন্যাস গোঁসাইর কে বুঝিতে পারে।
কত রূপে উদ্ধারিল জগৎ সংসারে॥ সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়।

এরূপ বহু প্রমাণ মহাপ্রভুর কপট সন্ন্যাসের মহাজনী গ্রন্থে আছে।

জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে।
তিঁহো প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রিদিনে॥
জগদানন্দ কহে মাতা! কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ ভরিয়া॥
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাৎ আমি খাই তিঁহো স্বপ্ন করি মানে॥
মাতা কহে ভোগ রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাই ইহা খায় ইচ্ছা হয় মোর মন॥
নিমাই খায়েন ঐছে হয় মোর মন।
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন॥
এই মতে জগদানন্দ শচীমাতা সনে।
চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্রিদিনে॥ চৈঃ চঃ

সন্ন্যাস করিবার সময় মহাপ্রভু তাঁহার শোকাতুরা জননীকে বলিয়াছেন "মা! তুমি কাঁদিও না। তুমি অনুরাগ ভরে আমাকে ডাকিলেই আমি তোমার নিকট আসিব,—তোমাকে দেখা দিব,—তোমার হাতের রন্ধন অন্ন ব্যঞ্জন খাইব"। দয়াময় শ্রীগৌরভগবান শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের বশীভূত হইয়া নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্নেহময়ী জননীর মনস্তুষ্টির জন্য, ঠাকুরের ভোগ খাইয়া যাইতেন। মায়ামুগ্ধ শচীমাতা ভাবিতেন তাঁহার ঠাকুরের ভোগ কে খাইয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ হইল! তিনি পুনরায় রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন! মহাপ্রভু এসকল কথা তাঁহার মর্ম্মীভক্ত দিয়া পূজনীয়া জননীকে বলিয়া পাঠাইতেন,—তবে শচীমাতার বিশ্বাস হইত। মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত আবির্ভাব ও তাঁহার ভোজন-লীলারঙ্গকথা পূর্ব্বে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

পণ্ডিত জগদানন্দ নবদ্বীপ হইয়া শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈত প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরে শিবানন্দ সেনের বাটীতে গেলেন। সেখান হইতে তিনি মহাপ্রভুর এক কলস চন্দনাদি তৈল সংগ্রহ করিলেন। পণ্ডিত জগদানন্দ মনে.করেন বায়ু ও পিত্তাধিক্যজনিত মহাপ্রভুর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে,—এইজন্য তিনি তাঁহার কথা শুনেন না,—ভাল খান না, ভাল পরেন না, উত্তম শয্যায় শয়ন করেন না। এই চন্দনাদি তৈল নীলাচলে গিয়া তিনি মহাপ্রভুকে মাখাইবেন,—তাঁহার মস্তকে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার মস্তিষ্ক সুশীতল এবং স্থির হইবে। এই ভাবিয়া পণ্ডিত জগদানন্দ স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া এই এক কলস চন্দনাদিতৈল অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক বঙ্গদেশ হইতে নীলাচলে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভুকে লুকাইয়া তিনি তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য গোবিন্দের হস্তে এই সুগন্ধ তৈলের কলসটি দিয়া কহিলেন—গোবিন্দ! এই তৈলের কলসটি যত্ন করিয়া রাখ,ইহার দ্বারা মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবা করিবে (১)। গোবিন্দ একথা মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন, আর বলিলেন, "পণ্ডিত বড় যত্ন করিয়া এই উত্তম সুগন্ধি তৈল গৌড় দেশ হইতে আপনার ব্যবহারের জন্য আনিয়াছেন, ইহা মস্তকে লাগাইলে আপনার বায়ুপিত্ত প্রকোপ প্রভৃতি শান্তি হইবে"। মহাপ্রভু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—

——"সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥ চৈঃ চঃ

গোবিন্দ প্রভুর এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তিত হইলেন। তিনি পণ্ডিত জগদানন্দকে একথা কি করিয়া বলিবেন, তাই ভাবিতে লাগিলেন। কারণ তিনি জানেন, এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত মনে বিষম ব্যথা পাইবেন। বৈষ্ণবের ভগবৎপ্রীতি ও ধর্ম্মনীতি গোবিন্দ উত্তমরূপ জানেন। "প্রাণী মাত্রে উদ্বেগ না দিবে" একথা তাঁহার মনে পড়িল। কিন্তু তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর আদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। কাজে-কাজেই এই বিষম মনঃপীড়াদায়ক কথাটি তিনি পণ্ডিত জগদানন্দকে একদিন ভয়ে ভয়ে বলিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত কি প্রকৃতির লোক, তাহা গোবিন্দ উত্তমরূপ জানেন তিনি মহাপ্রভুর অভিমানী ভক্ত। কথায় কথায় তাঁহার সহিত বিষম

(১) গোবিন্দের ঠাঁই তৈল ধরিয়া রাখিলা।
প্রভু অঙ্গে দিও তৈল গোবিন্দে কহিলা॥ চৈঃ চঃ

রস-কোন্দল করেন। কাজেই গোবিন্দ ভয়ে ভয়ে প্রভুর আদেশ তাঁহাকে জানাইলেন।

পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর এই আদেশ শুনিয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন,—কিছুই বলিলেন না। (১) তাঁহার তাৎকালিক ভাব দেখিয়া গোবিন্দের ভয় অধিকতর হইল। তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। জগদানন্দও নিজ কুটীরে গেলেন। এইভাবে দশ দিন চলিয়া গেল, এসম্বন্ধে আর কোন কথাই নাই। জগদানন্দের সহিত গোবিন্দের নিত্য দেখা হয়,—তিনিও কিছু বলেন না,—গোবিন্দও কিছু বলিতে সাহস করেন না। কিন্তু জগদানন্দের মুখের ভাব দেখিয়া গোবিন্দ বুঝিতে পারেন, তিনি মহাপ্রভুর বাক্যে ও ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছেন, এবং তিনিই এই মর্ম্মান্তিক দুঃখজনক আদেশবাহক। গোবিন্দ মনে মনে ভাবিলেন আর একবার মহাপ্রভুকে এসম্বন্ধে বলিয়া দেখি। এই ভাবিয়া তিনি সুযোগ বুঝিয়া একদিন রাত্রিতে তাঁহার চরণসেবা করিতে করিতে অতিশয় ভয়ে ভয়ে কহিলেন "প্রভু হে! পণ্ডিত জগদানন্দের বড় ইচ্ছা যে আমি তাঁহার আনীত সুগন্ধি তৈল দ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ সেবা করি"। এইকথা শুনিবামাত্র মহাপ্রভু পরম গম্ভীরভাবে সক্রোধে গোবিন্দকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন।
> "মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন॥
> এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
> আমার সর্ব্বনাশ, তোমা সবার পরিহাস॥
> পথে যাইতে তৈল গন্ধ মোর যে পাইবে।
> দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন,—আর কোন কথাই কহিতে পারিলেন না, মহাপ্রভুও আর কিছু বলিলেন না।

পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পণ্ডিত জগদানন্দ আসিলেন। তিনি তখন শ্রীহস্তে মালা লইয়া আসনে উপবিষ্ট। জগদানন্দকে দেখিয়াই প্রথমেই বলিলেন—

> ——"পণ্ডিত! তৈল আনিলা গৌড় হৈতে।
> আমি ত সন্ন্যাসী তৈল নারিব লৈতে॥
> জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জ্বলে।
> তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে॥" চৈঃ চঃ

পণ্ডিত জগদানন্দ গোবিন্দের মুখে মহাপ্রভুর এই আদেশ-বাণী পূর্ব্বে একবার শুনিয়া মৌনী ছিলেন,—কোন কথা কহেন নাই। তিনি অভিমানী ভক্ত। মনে ভাবিতেছিলেন মহাপ্রভু স্বয়ং একথা তাঁহাকে কেমন করিয়া বলেন, তাহা দেখিবেন। গোবিন্দকে বলিয়াছেন—সে স্বতন্ত্র কথা। দশ দিন কাল তিনি মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিলেন। গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন পণ্ডিত জগদানন্দ এই দশ দিনকাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সে পরীক্ষা আজ শেষ হইল। তিনি দেখিলেন এবং বুঝিলেন মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকাল সমভাবে কার্য্যকরী। তাঁহার মনের মধ্যে আরও একটি গুপ্তভাব-তরঙ্গ লুক্কায়িতভাবে খেলা করিতেছিল। তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর গোবিন্দ প্রভুর ভৃত্য। ভৃত্য দ্বারা তাঁহার প্রিয়তমার প্রতি যে আদেশ জারি করিয়াছেন, তাহা সাক্ষাতে প্রিয়তমার সমক্ষে কার্য্যকরী হয় কি না ইহাও জগদানন্দের পরীক্ষার বিষয় ছিল। এই পরীক্ষাই শেষ পরীক্ষা। কঠোর সন্ন্যাসীঠাকুরের নিকট জগদানন্দের এই শেষ পরীক্ষার ফল কিছুই হইল না,—তাহাও এক্ষণে তিনি বুঝিলেন,—আরও বুঝিলেন, এই যে অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীটি একমাত্র তাঁহারই প্রাণবল্লভ নহেন; তিনি বহুবল্লভ,—বহুজনের মন তাঁহাকে রাখিতে হয়। কাজেই তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। বহুবল্লভের বহুদায়ীত্ব,—বহুভাবে বহুজনের মনস্তুষ্টি করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। প্রত্যেক অনুরাগিনীর মনস্তুষ্টি করিতে তিনি বাধ্য। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং" একথা তিনি শ্রীগীতামুখে বলিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি জগদানন্দপণ্ডিতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন

(১) এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিলা পণ্ডিত কিছু না কহিল॥ চৈঃ চঃ

না। ইহাতে অভিমানী ভক্তের অভিমান-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। জগদানন্দ, চোক মুখ রাঙ্গাইয়া, অভিমানিনী প্রোষিত ভর্তৃকার ন্যায়, প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্রের প্রতি রোষকষায়িত নয়নে একবারমাত্র চাহিয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন—

——"কে তোমারে কহে মিথ্যাবাণী।
আমি গৌড় হইতে তৈল কভু নাহি আনি॥" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ "কে তোমাকে এই মিথ্যাকথা বলিয়াছে? আমি ত গৌড় হইতে তোমার জন্য তৈল আনি নাই। যে তোমাকে একথা বলিয়াছে, সে মিথ্যাবাদী।" এই বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সুগন্ধি তৈলের কলসটি লইয়া তাঁহার অগ্রে আঙ্গিনার মাঝে সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। কলস ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল,—সুগন্ধি তৈলের স্রোত সমুদয় আঙ্গিনায় প্রবাহিত হইল,—গন্ধে আশ্রম আমোদিত হইল।

এই কার্য্য করিয়া অভিমানী ভক্ত জগদানন্দপণ্ডিত ক্রোধে গরগর হইয়া নিজ কুটীরে গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া অভিমান ভরে শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি যেন মহাপ্রভুর অভিমানিনী রমণী এবং তাঁহার সকল কার্য্যের উপর যে তাঁহার বলিবার ও কহিবার একটা অধিকার আছে, এবং বলিলে ও কহিলে তিনি যদি তাহা না শুনেন, তাহার পর কি করিবে অবাধ্য স্বামীকে নিজবশে আনিতে হয়, পণ্ডিত জগদানন্দ তাহাই তাহার এই কার্য্যে দেখাইলেন। তিনি নিজ কুটীরে ভূমি-শয্যায় শয়ান আছেন,—ক্রোধে এবং অভিমানে তাঁহার অন্তর জর জর,—আহার নিদ্রা ত্যাগ,—একমাত্র চিন্তা মহাপ্রভুর চন্দ্রবদন এবং শুনিবার ইচ্ছা তাঁহার শ্রীমুখের মধুর বাণী। এ সময়ে এই মধুর বাণী কি? মানভঞ্জনের অনুরাগময়ী সুমধুর তোষামোদবাণী; প্রাণবল্লভ স্বয়ং আসিয়া বহুভাবে তোষামোদ পূর্ব্বক তাঁহার এই দুর্জ্জয় মানভঞ্জন করিবেন—তবে তাহার এই অভিমানী ভক্তের ক্রুদ্ধমনের শান্তি হইবে,—তবে তিনি তাঁহার সহিত কথা প্রথমে বক্রভাবে কহিবেন,—তাঁহার প্রাণবল্লভ তেমন তোষামোদ করিলে তবে আহারাদি করিবেন। পরিপূর্ণ তিন দিবসকাল পর্য্যন্ত অভিমানী ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিতের মনে এই দুর্জ্জয় অভিমান প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিল এবং তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে উৎপীড়িত করিল। গৌরাভিমানিনী নদীয়ানাগরীভাবে তিনি এখন বিভাবিত,—দুর্জ্জয় অভিমান-জ্বরে তিনি এখন বাণবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় ছটফট করিতেছেন। এদিকে মহাপ্রভুর মনেও বিন্দুমাত্র সুখ নাই। তাঁহার এ অবস্থাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্ত্রী অভিমান করিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ঘরে দুয়ার দিয়া শুইয়া থাকিলে স্বামীর মন স্থির থাকিতে পারে না। মহাপ্রভুর অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু পুরুষের হৃদয় অপেক্ষাকৃত কঠিন,—সহজে তাঁহাদের স্বাভাবিক পুরুষভাব ব্যক্ত হয় না। প্রথম দিন গেল, মহাপ্রভু কাহাকেও কিছু বলিলেন না,—মাত্র গোবিন্দ সকলই জানেন। তিনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং ভৃত্য। তিনি দেখিতেছেন মহাপ্রভুর সেদিন ভজনে মন লাগিল না। দ্বিতীয় দিন গেল। মহাপ্রভু সেদিন সিন্ধুস্নানেও যাইলেন না,—জগন্নাথ দর্শনেও যাইলেন না। গোবিন্দ সকলি জানেন ও বুঝিতেছেন,—কিন্তু কোন কথা বলিতেছেন না। সে দিবস মহাপ্রভু ভাল করিয়া আহারই করিলেন না। ইহা দেখিয়া গোবিন্দের মনে বড় দুঃখ হইল, তিনি আর ইহার কি করিবেন? স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকোন্দলে কি দাসদাসী কোন কথা বলিতে পারে না,—সাহস করে? গোবিন্দের অবস্থাও তদ্রূপ। জগদানন্দ যে তিন দিন অনাহারে ঘরে দুয়ার দিয়া পড়িয়া আছেন মহাপ্রভু তাহা ভক্তবৃন্দের মুখে শুনিয়াছেন,—চক্ষেও দেখিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। স্বরূপ গোসাঞি প্রভৃতি জগদানন্দকে তাঁহার কুটীর হইতে বাহির করিতে পারেন নাই, তাহাও মহাপ্রভুর কর্ণে গিয়াছে। তৃতীয় দিনের দিন তাঁহার হৃদয় আর স্থির রহিল না,—মন আর মানিল না—তিনি প্রাতে প্রাতঃকৃত্য করিয়াই একেবারে জগদানন্দের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারের কবাটে করাঘাত করিয়া মধুরস্বরে প্রেমগদগদকণ্ঠে কহিলেন"পণ্ডিত! উঠ, আজ আমি তোমার এখানে ভিক্ষা করিব। তুমি রন্ধন করিয়া আমাকে প্রসাদ দিবে। আমি এক্ষণে জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি,—মধ্যাহ্নকালে আসিয়া তোমার কুটীরে প্রসাদ

পাইব"। (১) এই কথা বলিয়াই তিনি নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

জগদানন্দের কর্ণে তাঁহার পরম প্রেমময় প্রাণবল্লভের প্রেম-পরিপ্লুত মধুর বাণী প্রবেশমাত্র, তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকপূর্ণ হইল,—অভিমানিনী রমণীর সকল অভিমান দূর হইল; স্বামীর একটি মধুর অথচ সরস কথাই এসময়ে তাঁহার অভিমানবিষজর্জ্জরিত প্রাণ বাঁচাইবার একমাত্র মহৌষধি। বৈদ্যরাজ মহাপ্রভু জগদানন্দের এই অকথন ব্যাধির মহামহৌষধি দিয়া চলিয়া গেলেন। ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ পড়িলেই রোগী উঠিয়া বসে। জগদানন্দও উঠিয়া বসিলেন, তিনি ব্যাধি-মুক্ত হইতেছেন,—মনে ও শরীরে কিছু বল পাইবেন এই বিশ্বাসে গৃহদ্বার খুলিলেন। গোবিন্দ সময় বুঝিয়া রন্ধনের সকল যোগাড় করিয়া দিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত বিনা বাক্যব্যয়ে স্নান করিয়া রন্ধনগৃহে গেলেন।

এত বলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু নানা প্রকার ব্যঞ্জন ভালবাসেন, তাই তিনি স্বহস্তে নানা প্রকার শাক ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন। জগদানন্দের প্রিয়জন রাঘব পণ্ডিত ও রঘুনাথ, জগদানন্দের এই পাককার্য্যে সেদিন সহায় ছিলেন। বহু প্রকার শাক, মোচার ঘণ্ট,—মুগ ও নারিকেল ব্যঞ্জন, যাহা মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয়, জগদানন্দ তাহাই প্রচুর পরিমাণে রন্ধন করিলেন। উত্তম শাল্যন্ন পাক করিলেন। মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন কৃত্য শেষ করিয়া তাঁহার কথামত জগদানন্দের কুটীরে একাকী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে একাকী দেখিয়া জগদানন্দের মনে বড় আনন্দ হইল। কেন তাহা সুচতুর পাঠকবৃন্দ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। সঙ্গে কেহ আসিলে প্রভু সঙ্কুচিত হইয়া প্রসাদ পাইবেন এবং তাঁহাদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া প্রসাদ পাওয়াইবেন, তবে তিনি কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইবেন। জগদানন্দ ইহা উত্তম জানেন। স্বামীর চরিত্র স্ত্রী যেমন বুঝেন, অন্যে তাহা কিরূপে বুঝিবেন? মহাপ্রভুকে একেশ্বর আসিতে দেখিয়া জগদানন্দের সেদিন আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমল প্রক্ষালন করিয়া দিয়া আসনে বসাইলেন। মহাপ্রভু পাক গৃহে বসিয়া অন্ন ব্যঞ্জনের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, আর জগদানন্দ তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র ভোগ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সে কিরূপ শুনুন—

সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলা দোণি ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল ॥
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী।
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠা পানা আগে ধরি ॥ চৈঃ চঃ

অর্থাৎ জগন্নাথের প্রসাদ অগ্রে পৃথক করিয়া রাখিয়া মহাপ্রভুর জন্য অনিবেদিত স্বতন্ত্র অন্ন ব্যঞ্জনের ভোগ প্রস্তুত করিলেন। কলার খোলায় করিয়া পাতের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজাইলেন। সঘৃত অন্নের উপর নবীন তুলসী মঞ্জরী দিয়া মহাপ্রভুর ভোগ দিলেন। গণ্ডূষের জল হস্তে দিয়া তাঁহাকে ভোজনে বসাইবেন, এমন সময় রসরাজ রসিকশেখর মহাপ্রভু ঈষৎ মধুর হাসিয়া জগদানন্দের মুখের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া পরম রসিকতার সহিত কহিলেন—

——"দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন
তোমায় আমায় একত্রে আজি করিমু ভোজন ॥" চৈঃ চঃ

এই বলিয়া ভক্তবৎসল প্রভু শ্রীহস্ত উত্তোলন করিয়া আসনে বসিয়া রহিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন "জগদানন্দ! তুমি আর একখানি পাতে প্রসাদ বাড়, আজ আমরা দুইজনে একত্রে ভোজন করিব"। রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর এই কথাটি অতিশয় প্রীতির কথা,—মধুর রসের সর্ব্বশেষ কথা, ইহা প্রভু ভৃত্যের কথা নহে, ভৃত্যকে কখন প্রভু একথা বলিতে পারেন না। মহাপ্রভুর এই কথাতেই বুঝিতে হইবে জগদানন্দের সহিত তাঁহার প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নহে। ইহা দাস্য ভাবের কথা নহে,—মধুরোজ্জ্বল পরকীয়া মধুর ভাবের

(১) তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা।
উঠহ পণ্ডিত করি কহেন ডাকিয়া ॥
আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে ॥
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশনে ॥ চৈঃ চঃ

কথা পরম সিদ্ধ। পূর্ব্বলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সত্যভামার যে প্রণয় সম্বন্ধ ছিল, মহাপ্রভুর সহিত পণ্ডিত জগদানন্দের ঠিক সেই সম্বন্ধ। অভিমানিনী স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য পুরুষে নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া, নানাভাবের প্রীতিব্যঞ্জক কথা কহে। ইহা স্বাভাবিক পতি-প্রেমের লক্ষণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু নরবপু ধারণ করিয়া সর্ব্বোত্তম নরলীলা প্রকট করিতেছেন, তিনি পূর্ব্বলীলার নায়করূপে নায়িকা জগদানন্দের মনস্তুষ্টির জন্য এই প্রীতিব্যঞ্জক কথাটি তাঁহাকে বলিলেন। পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী নিজপ্রাণপতির মুখে এইরূপ প্রেমরসরঙ্গপূর্ণ পরমা প্রীতির কথা শুনিয়া যেমন কথঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসেন, এবং পতির এই অনুরোধবাক্য রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া যেমন সলজ্জিতভাবে প্রেমগদগদ বচনে কহেন—"তুমি আগে খাও, তবে আমি খাইব" পণ্ডিত জগদানন্দ ঠিক তাহাই করিলেন। তিনি মহাপ্রভুর বদন-চন্দ্রের প্রতি বিলোল নয়নে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া সপ্রেম বচনে কহিলেন—

"আপনি প্রসাদ লহ পাছে মুঞি খাইব।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব ॥ চৈঃ চঃ

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু মনে বড় আনন্দ পাইলেন এবং তিনি পরমানন্দে ভোজন করিতে বসিলেন, জগদানন্দ উত্তম করিয়া ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভু তাহা ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া রঙ্গ করিয়া কহিলেন—

"ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় এত স্বাদ।
এইত জানিয়ে তোমারে কৃষ্ণের প্রসাদ ॥
আপনি খাইবে কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন ॥" চৈঃ চঃ

কলির প্রচ্ছন্ন অবতার মহাপ্রভু তাঁহার উপযুক্ত কথাই বলিলেন "স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিবেন বলিয়া তুমি নিজহস্তে পাক করিয়া এই অমৃত তুল্য অন্নব্যঞ্জনের ভোগ দাও, তুমি পরম ভাগ্যবান।" জগদানন্দ কাহার জন্য এই সকল উত্তম উত্তম ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছেন? সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু কি তাহা জানেন না? অন্তর্যামী গৌরভগবান ছলে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট নিজ তত্ত্বই প্রকাশ করিলেন। জগদানন্দের মত রসিক ও চতুর ভক্তরাজের তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনিও ছলে ও কৌশলে মহাপ্রভুর কথার উত্তর যাহা দিলেন, তাহাও নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ। তিনি বলিলেন—

———"যে খাইবে সেই পাক কর্ত্তা।
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী আহর্ত্তা ॥" চৈঃ চঃ

রসিক ভক্তচূড়ামণি জগদানন্দ সকল কর্তৃত্ব শ্রীভগবানে আরোপ করিলেন। এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর মন অধিকতর প্রফুল্ল হইল।

মহাপ্রভু প্রেমানন্দে জগদানন্দের কুটীরে বসিয়া ভোজন-লীলারঙ্গ করিতেছেন,—জগদানন্দ নিকটে বসিয়া প্রেমানন্দে তাঁহার প্রাণ-বল্লভকে প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইতেছেন। মহাপ্রভু শাক ব্যঞ্জন বড় ভালবাসেন,—তাই তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহার পাতে শাক ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন। তিনি ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করিতেছেন না, পাছে জগদানন্দের পুনরায় অভিমান হয়,—তিনি যাহা দিতেছেন তাহাই পরমানন্দে মহাপ্রভু ভোজন করিতেছেন।

পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে ॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু ভোজনানন্দে আছেন,—জগদানন্দও পরিবেশনানন্দে বিভোর আছেন। মহাপ্রভুর ভোজন করিয়া সুখ, জগদানন্দের সুখ তাঁহাকে ভোজন করাইয়া। মহাপ্রভুর সুখ অপেক্ষা জগদানন্দের সুখ অধিক। ভোক্তা অতিথির সুখের অপেক্ষা ভোজনদাতার সুখ অধিক। কারণ অতি-ভোজনে ভোক্তার কষ্ট আছে,—কিন্তু ভোজন দানে দাতার কোন কষ্টই নাই। অন্য দিন অপেক্ষা মহাপ্রভু সে দিন দশগুণ ভোজন করিলেন,—বারম্বার তাঁহার উঠিবার মন হইতেছে,—কারণ উদর পরিপূর্ণ হইয়াছে,। কিন্তু তিনি কি করিবেন,—উঠিব উঠিব মনে করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে জগদানন্দ পুনরায় তাঁহার পাতে ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন। ভক্তবৎসল প্রভু কিছুই বলিতে পারিতেছেন

না—এক এক একবার তাঁহার মুখের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিতেছেন আর ভয়ে ভয়ে কিছু কিছু খাইতেছেন (১)। ভয় এই জন্য পাছে তাঁহার অভিমানী ভক্ত পুনরায় রাগ করিয়া সেদিনও উপবাস করেন। মহাপ্রভুর এই যে ভয়,—ইহা পরম প্রীতির লক্ষণ। তিনি বিশ্বম্ভর,—তিনি ভোজনে কাতর নহেন। মহাপ্রকাশের দিন নবদ্বীপে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া যিনি শত সহস্র ভক্তবৃন্দদত্ত রাশি রাশি ভোজ্যবস্তু অনায়াসে একদিনে আহার করিয়া নিঃশেষ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় আরও লইয়া আইস বলিয়া ভক্তগণকে বিষম লজ্জা দিয়াছিলেন,—সর্ব্বশেষে স্তুপাকার তাম্বুল খাইয়া ভোজন-লীলারঙ্গ সাঙ্গ করিয়াছিলেন। নীলাচলে বসিয়া যিনি এক দিন নদীয়ার ভক্তবৃন্দের আনীত রাশিকৃত ভোজ্যবস্তু আহার করিয়া ভক্তবৃন্দের মনে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন,—তিনি যে জগদানন্দের নিকট ভোজন লীলারঙ্গে পরাজয় স্বীকার করিবেন, তাহা সম্ভব নহে, ভক্তের ভগবান ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য সকলি করিতে পারেন। জগদানন্দ তাঁহার মর্ম্মীভক্ত, তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য মহাপ্রভু দশগুণ আহার করিলেন,—ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে।

জগদানন্দ যখন কিছুতেই পরিবেশনে নিরস্ত হন না,—তখন মহাপ্রভু কাতর ভাবে বিনয় করিয়া পরম সম্মানের সহিত জগদানন্দের মুখের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া কাতরস্বরে কহিলেন—

"দশ গুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাপন।" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর তাৎকালিক বিনয়কাতর চন্দ্রবদন দেখিয়া প্রকৃতই জগদানন্দের মনে দুঃখ হইল, এবং তাঁহার শ্রীমুখে সম্মানসূচক কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি মনে মনে দয়ার উদ্রেক হইল। মহাপ্রভুর আকণ্ঠ ভোজন করিয়া প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে—তিনি আসন হইতে উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া কাহার মনে না দুঃখ হয়? আর তিনি যে অতি কাতর ভাবে মিনতি করিয়া বলিতেছেন "রক্ষা কর,—আর খাওয়াইও না, পেট্ ফাটিয়া গেল, জগদানন্দ! তোমার হাতে ধরি তুমি আর কিছু দিও না।" আকণ্ঠপূর্ণ ভোক্তার মুখে এই রূপ কাতরোক্তি শুনিয়া কাহার মনে না তাঁহার উপর দয়া হয়? জগদানন্দত মহাপ্রভুর শত্রু নহেন? তিনি তাঁহার এই অতিভোজন দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাকে আর পীড়াপিড়ি করিলেন না। মহাপ্রভু ভোজন-লীলা সমাধান করিয়া অতি কষ্টে উঠিলেন,—জগদানন্দ ঝারিপূর্ণ জল আনিয়া দিলেন, তিনি আচমন করিলেন। তাহার পর তিনি মহাপ্রভুকে মুখশুদ্ধি দিয়া মালা চন্দনে ভূষিত করিলেন। মহাপ্রভু এক্ষণে স্থির হইয়া সেই স্থানেই কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিলেন। তাঁহার আর উঠিবার শক্তি নাই—অতি গুরুতর ভোজনে তিনি কাতর হইয়াছেন। তিনি তখন জগদানন্দের মুখের দিকে কৃপাদৃষ্টি করিয়া সহাস্যবদনে প্রেম গদ-গদ বচনে কহিলেন "জগদানন্দ! তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া অন্ন ভোজন কর, আমি তোমার প্রসাদ-ভোজন-লীলা দেখিয়া নয়ন সার্থক করি।"

"আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজন"। চৈঃ চঃ

রসরাজ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এই রসিকতা শুনিয়া জগদানন্দ মুচকিয়া হাসিলেন, তাঁহার হাসির মর্ম্ম এই, কি লজ্জার কথা প্রভু বলিলেন? ইহাও কি কখন হয়? স্বামীর সম্মুখে বসিয়া স্ত্রী ভোজন করিবে? ইহা কখনই হইতে পারে না।

প্রভু যে এই কথাটি বলিলেন, তাঁহার মনের ভাব ইহাতে দুই ভাবে ব্যক্ত হইল। প্রথম, জগদানন্দ তিন দিন উপবাসী আছেন,—তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ভোজন করিলে তাঁহার মনে বড় সুখ হয়,—আনন্দ হয়; দ্বিতীয়তঃ জগদানন্দের রাগ হইয়াছিল, তিনি তিন দিন অনাহারে আছেন, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া তবে মহাপ্রভুর অন্ন

(১) আগ্রহ করি পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশ গুণ ॥
বার বার প্রভুর হয় উঠিবারে মন।
পুনঃ সেই কালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥
কিছু বলিতে নারে প্রভু খায় সব ত্রাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥ চৈঃ চঃ

কাজ। গুরু ভোজনের পর বিশ্রাম একদিকে,—আর এই কার্য্যটি একদিকে। মনে মনে ইহাই ভাবিয়া তিনি এই কথাটি বলিলেন। জগদানন্দ শুদ্ধ রসিকভক্ত, চতুর-শিরোমণি, তাঁহার ভাব, ভঙ্গী অভিমানিনী সত্যভামার মত। তিনি মহাপ্রভুর সাধ্বী স্ত্রী। পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী কখনই স্বামীর সমক্ষে ভোজন করিতে পারেন না। স্বামীর অবশেষ পাত্রই তাঁহার গ্রহণীয়। এই স্বকীয়াভাবে বিভাবিত হইয়া জগদানন্দ প্রভুর চরণে করযোড়ে নিবেদন করিলেন,

———"প্রভু যাইয়া, করুন বিশ্রাম।

মুঞি এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান॥

রন্ধয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ।

ইঁহা সবারে দিতে চাহিয়ে কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥" চৈঃ চঃ

ভাবগ্রাহী সন্দজ্ঞ মহাপ্রভু তাঁহার মর্ম্মীভক্তের মনের ভাব বুঝিয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে আর কোনরূপ অনুরোধ করিলেন না। তিনি জগদানন্দের কথায় বুঝিলেন, তাঁহার অভিমান-জনিত রাগের উপশম হইয়াছে,—আর ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার মনে উদয় হইল জগদানন্দকে বিশ্বাস নাই। গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। তিনি গোবিন্দকে বলিলেন।

———"গোবিন্দ! তুমি ইহাই রহিবে।

পণ্ডিত ভোজন করিলে আমারে কহিবে।" চৈঃ চঃ

জগদানন্দ কি করেন, ভোজন করেন কি না, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার বিশ্বাসী একান্ত অনুগত ভৃত্যটিকে তাঁহার নিকট রাখিলেন।

মহাপ্রভুর বাসা কাশীমিশ্রের বাটীতে, এবং জগদানন্দের কুটীর সেই বাটী-সংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া তিনি কাতর ছিলেন, বহুদূর যাইতে হইল না, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে আনন্দ হইল। "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া তিনি সেখান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিজ বাসায় গেলেন। এখন জগদানন্দ দেখিলেন মহাপ্রভু গোবিন্দকে এখানে পাহারা দিতে রাখিয়া গেলেন,—তিনি অতিরিক্ত ভোজন করিয়াছেন,—ভোজনান্তে গোবিন্দ তাঁহার পদসেবা না করিলে তাঁহার বিশ্রাম পূর্ণ হয় না। ইহা জগদানন্দ উত্তমরূপ জানেন,—গোবিন্দও তাহা জানেন। গোবিন্দ কি করিবেন, মহাপ্রভুর আদেশ। তখন জগদানন্দ একটী ফন্দি করিলেন। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গোবিন্দকে কহিলেন—

"তুমি শীঘ্র যাই কর পাদ সম্বাহনে।

কহিও পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে॥

তোমার তরে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।

প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া॥" চৈঃ চঃ

এই বলিয়া জগদানন্দ গোবিন্দকে বিদায় দিলেন। তাহার পর তিনি, রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ এবং রঘুনাথের জন্য প্রসাদান্ন ব্যঞ্জন বণ্টন করিলেন, সর্ব্বশেষে তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের অধরামৃত প্রসাদ পাইলেন।

গোবিন্দ মহাপ্রভুর পদসেবায় নিযুক্ত আছেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি কিছুই গোপন করেন না। জগদানন্দের কথায় তিনি তাঁহার পদসেবা করিতে আসিয়াছেন, তাহা তিনি তাঁহাকে বলিলেন। জগদানন্দ তখনও প্রসাদ পান নাই, তাহাও তিনি মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন। জগদানন্দ তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দিয়াছেন,—তাহাও বলিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসির মর্ম্ম গোবিন্দ বুঝিলেন। গোবিন্দকে জগদানন্দের নিকটে রাখা,—ইহা প্রভুকর্তৃক জগদানন্দের সর্ব্বশেষ পরীক্ষা। মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্য রীতি অত্যদ্ভুত। তিনি তাঁহার ভক্তকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করেন, তবে নিজজন করিয়া লন। মহাপ্রভু তাঁহার পদসেবা ত্যাগ করাইয়া গোবিন্দকে জগদানন্দের নিকটে কড়া পাহারায় রাখিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য, জগদানন্দের গৌরাঙ্গপ্রীতির পরীক্ষা মাত্র। জগদানন্দ মহাপ্রভুর এই শেষ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলেন দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া গোবিন্দকে কহিলেন—

"দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।

শীঘ্র সমাচার আনি কহত আমায়॥" চৈঃ চঃ

তিনি গোবিন্দকে এই ছলনায় পুনরায় জগদানন্দের কুটীরে পাঠাইলেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ মহাপ্রভুর মনের একটি ভাব, কিন্তু আর একটী ভাব-তরঙ্গ মহাপ্রভুর মনে মনে খেলিতেছে, তাহা এক্ষণে বুঝিবার চেষ্টা করিব। জগদানন্দ তাঁহার অভিমানী মর্ম্মীভক্ত তাঁহার বিষম অভিমান এবং দুর্জ্জয় মান মহাপ্রভু স্বয়ং যাহা দেখাইয়াছেন তাহা অন্যের অনমুভবনীয়। জগদানন্দকে তাঁহার বিশ্বাস নাই। অভিমানভরে তিনি সকলি করিতে পারেন। এত করিয়াও মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তের মন পাইয়াছেন কি না, ইহাতে তাঁহার ঘোর সন্দেহ। তাই গোবিন্দকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন "শীঘ্র যাইয়া দেখিয়া এস, জগদানন্দ ভোজন করিল কি না"।

গোবিন্দ তখন ছুটিয়া গিয়া দেখিয়া আসিয়া মহাপ্রভুকে সমাচার দিলেন পণ্ডিত ভোজন করিয়াছেন, তবে তিনি সুস্থির হইয়া শয়ন করিলেন।

গোবিন্দ দেখি আসি কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিলা শয়ন॥ চৈঃ চঃ

এক্ষণে সুচতুর রসিক গৌরভক্তবৃন্দ বিচার করুণ জগদানন্দের প্রেম-ভক্তি মহাপ্রভুর প্রতি অধিক, কি মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্য জগদানন্দের প্রতি অধিক। এই বিচারের ভার আপনারাই লউন,—ভক্তের নিকট ভগবানের পরাজয় এত কাল শুনিয়া আসিতেছেন,—এক্ষণে এই লীলাপ্রসঙ্গে ইহা দিব্যচক্ষে দর্শন করুন। এই সকল অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ স্বচক্ষে দেখিয়া রঘুনাথদাস গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে বলিয়াছেন আর তাহাই কবিরাজগোস্বামী তাঁহার অমূল্য শ্রীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা॥

বস্তুতঃ জগদানন্দের চরিত্র ও শ্রীচৈতন্যপ্রেম অতীব অদ্ভুত, এবং বড়ই মধুময়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রেমরঙ্গ-কাহিনী শুনিয়াছিলেন মাত্র, নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও জগদানন্দের অপূর্ব্ব প্রেমবিবর্ত্ত-বিলাসরঙ্গ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া মহাজনগণ যাহা পদে বা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে প্রেমানন্দে মন গৌর-রসে মগ্ন হয়—হৃদয় অপূর্ব্ব প্রেমরসে সিক্ত হয়,—দেহ গৌর-লীলারঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়। ভগবতপ্রেম যে কি বস্তু,—আর ইহার স্বরূপ কি, তাহা এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ পাঠ ও আস্বাদন করিলে জানিতে পারা যায়। অমূল্য প্রেমধন আহরণ করিবার যদি কোন উপায় থাকে, তাহা এই সকল মধুর লীলারসাস্বাদনেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব হে কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামধু পাঠে ও শ্রবণে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে মনোনিবেশ করুন,—রসিক চূড়ামণি গৌরভক্ত-বৃন্দের সঙ্গ করুন,—তাঁহাদিগের সহিত এই সকল গৌরলীলারসরঙ্গ আস্বাদন করুন,—ভগবতপ্রেম কি বস্তু তাহা জানিতে পারিবেন এবং তাহা অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতে পারিবেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে বসিয়া তাঁহার রসিক-ভক্ত জগদানন্দের সহিত বহুবিধ প্রেমলীলা-রঙ্গ করিয়াছিলেন। মহাজনকবি তাঁহাদিগের পদে তাহার কয়েকটী মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মধুর লীলাকাহিনী গুলি রসিক গৌরভক্তবৃন্দের প্রাণস্বরূপ। পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাপ্রভু যে সন্ন্যাস করিয়াছেন, ইহা জগদানন্দের একেবারেই ভাল লাগে না। তাঁহার সন্ন্যাস শ্রীমূর্ত্তির প্রতি চাহিলে জগদানন্দের বুক ফাটিয়া শতধা হইয়া যায়,—তাঁহার আহার, ব্যবহার, দৈন্য কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। কৃষ্ণ-বিরহে মহাপ্রভুর হৃদয় জর্জ্জরিত, মন ব্যাকুলিত, শরীর ক্লিষ্ট, তিনি এক্ষণে অতিশয় ক্ষীণকায় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রীবদনের প্রতি চাহিলে আর তাঁহাকে চেনা যায় না। ইহা পণ্ডিত জগদানন্দের পক্ষে মৃত্যু-তুল্য। তিনি মহাপ্রভুর শ্রীবদনের প্রতি নয়ন তুলিয়া চাহিতে পারেন না,—তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইলে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সকলি জানেন ও বুঝেন, কিন্তু বুঝিয়াও তিনি অবুঝ। তিনি কঠোরতা করেন এবং দিন দিন তাহা বৃদ্ধিই করিতেছেন। ইহাতে

জগদানন্দের হৃদয়ের ব্যথা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে,—ইহা তিনি বুঝিয়াও বুঝেন না। ইহা তাঁহার বড় দোষ। শ্রীভগবানের দোষ কেহ দেখিতে পান না। কিন্তু জগদানন্দ তাহা দেখিতে পান। তিনি ভগবত-সেবা-প্রেমান্ধ হইয়া ভগবানের দোষ দেখেন বলিয়াই তাঁহার দুঃখ,—আর এই দুঃখই তাঁহার সুখ ও আনন্দ, এবং সৌভাগ্য। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা"।

এক্ষণে মহাপ্রভু কঠোরতার চরম সীমা দেখাইতেছেন তাঁহার অবস্থা কবিরাজ গোস্বামীর মুখে শুনুন—

কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দুঃখে ক্ষীণ মনঃ কায়।
ভাবাবেশে কভু প্রভু প্রফুল্লিত হয়॥
কলার শরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়॥

মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিত হইয়া অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছেন; তাঁহার আদেশে শুষ্ক কলার খোলা পাতিয়া গোবিন্দ শয্যা রচনা করিয়া দেন, তাহাতে তিনি নিজ মন্দিরে শয়ন করেন। মহাপ্রভুর সেই নবনটবর নবীন মধুর দেহখানি এক্ষণে অস্থিমালা হইয়াছে—শুষ্ক কাষ্ঠবৎ কলার খোলাতে অস্থি সকল বিদ্ধ হইলে দেহে বেদনা অনুভূত হয়। ইহা দেখিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। জগদানন্দ ত ইহা দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুইটি অন্ধ করিতে বসিয়াছেন। মহাপ্রভুর এইরূপ দৈহিক কষ্ট দূরীকরণের নিমিত্ত ভাবিয়া ভাবিয়া এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এই উপায় কি শুনুন—

সূক্ষ্মবস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রঙ্গাইল।
শিমুলের তুলা দিয়া তাহা ভরাইল॥
এই তুলা বালীশ গোবিন্দের হাতে দিল।
প্রভুরে শোয়াইহ ইহায় তাহারে বলিল॥ চৈঃ চঃ

প্রেমের রীতিই এইরূপ। জগদানন্দ জানেন মহাপ্রভু এইরূপ তুলার শয্যায় শয়ন স্বীকার করিবেন না। তবুও তাঁহার মন বুঝে না,—তাই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। এই প্রেম-চেষ্টাতেও সুখ আছে। গোবিন্দের হাতে এই তুলার শয্যা দিয়া জগদানন্দ তাঁহাকে কহিলেন "গোবিন্দ! মহাপ্রভুকে এই শয্যায় শয়ন করাইও"। গোবিন্দ জানেন মহাপ্রভু ইহা অঙ্গীকার করিবেন না। তিনি তাঁহার ভৃত্য,—যিনি যাহা প্রীতিপূর্ব্বক প্রভুকে দেন,তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাই এই জগদানন্দ-দত্ত তুলার শয্যা তিনি প্রভুর জন্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জগদানন্দের এত কথার কোনই উত্তর দিলেন না। জগদানন্দও মনে মনে জানেন মহাপ্রভু গোবিন্দের কথায় কখনই এই শয্যা অঙ্গীকার করিবেন না। তাই তিনি স্বরূপ গোসাঞির হস্ত ধারণ করিয়া নির্জ্জনে লইয়া গিয়া মহা অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলেন "গোসাঞি! আজি তুমি মহাপ্রভুকে আপনি যাইয়া শয়ন করাইও (১) আজি আমি তাঁহার জন্য নূতন শয্যা প্রস্তুত করিয়া গোবিন্দের হাতে দিয়াছি"। স্বরূপ গোসাঞিও জগদানন্দকে ভয় করেন,—তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন। মহাপ্রভুর শয়নকালে স্বরূপ গোসাঞি জগদানন্দ-দত্ত শয্যা পাতিয়া দিলেন। মহাপ্রভু তুলার শয্যা বালিস দেখিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"ইহা করাইল কোন জন?" চৈঃ চঃ

স্বরূপগোসাঞি যখন জগদানন্দের নাম লইলেন,—মহাপ্রভু আর কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু গোবিন্দকে দিয়া সেই তুলার শয্যা উঠাইয়া অন্যত্র রাখাইয়া দিলেন, এবং কলার শরলার শয্যার উপর পূর্ব্ববৎ তিনি শয়ন করিলেন। স্বরূপ-গোসাঞি তখন ধীরে ধীরে প্রভুকে কহিলেন—

—"তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি।
উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর ক্রোধ মনে মনে ছিল, কেবল জগদানন্দের নামে নীরব ছিলেন। কারণ জগদানন্দকে তিনি বড় ভয় করিতেন। কিন্তু যখন স্বরূপ গোসাঞি পুনরায় তাঁহাকে সেই তুলা-শয্যায় শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন

(১) স্বরূপ গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ।
আজি আপনি যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন চৈঃ চঃ

পুনরায় তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। তিনি ক্রোধভরে স্বরূপের প্রতি কটমট করিয়া চাহিয়া কহিলেন—

——"খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট তুলি বালিশ মস্তক মুণ্ডন॥" চৈঃ চঃ

স্বরূপ গোসাঞি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর ক্রোধ উপশম করিবার জন্য কৃষ্ণকথা তুলিলেন। তিনি পরমানন্দে তাঁহার পত্র শয্যায় শয়ন করিয়া স্বরূপের মুখে মধুর কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইলেন। স্বরূপগোসাঞি গোবিন্দের উপর রাত্রিকালে মহাপ্রভুর ভার সমর্পণ করিয়া নিজ কুটীরে আসিয়া শয়ন করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি জগদানন্দকে সকল কথা বলিলেন,—শুনিয়া তিনি মনে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলেন। তিনি মনের দুঃখ মনেই রাখিলেন,—কাহাকেও কোন কথাই কহিলেন না। স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দের বদনের প্রতি চাহিয়া বুঝিলেন, তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন ধূ ধূ অনল জ্বলিতেছে—তাঁহার মধ্যে অত্যান্তিক দুঃখের একটা প্রবল স্রোত বহিতেছে। তিনি তখন তাঁহার প্রাণবল্লভের মনের মত শয্যা রচনার একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কদলীর শুষ্কপত্র বহুপরিমাণে তিনি আহরণ করিয়া আনিলেন। সেইগুলি নখ দ্বারা চিরিয়া চিরিয়া অতি সূক্ষ্ম করিলেন। মহাপ্রভুর দুইখানি বহির্বাসের মধ্যে এই সকল সূক্ষ্ম শুষ্ক কদলী-পত্র সূত্রগুলি বিছাইলেন,—এবং তদ্দ্বারা একখানি তোসক ও একখানি লেপ তৈয়ার করিলেন। একখানি ভূমিতে পাতিয়া তাহার উপর মহাপ্রভু শয়ন করিবেন আর একখানি তিনি গায়ে দিবেন। কারণ তখন শীতকাল। স্বরূপগোসাঞি মহাপ্রভুকে জগদানন্দপণ্ডিতকৃত এই অভিনব শয্যা দেখাইলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মন উঠিল না,—তিনি কোন কথাই বলিলেন না। পরিশেষে কিছু না বলিয়া মহাপ্রভু যেন ভয়ে ভয়ে মহা অনিচ্ছায় এই সুখ-শয্যা অঙ্গীকার করিলেন। ইহাতে স্বরূপাদি ভক্তগণের মনে সুখ হইল। কিন্তু—

"জগদানন্দ ভিতরে বাহিরে মহা দুঃখী" চৈঃ চঃ

কারণ তাঁহার মনের মত শয্যা ইহা নহে,—আর মহাপ্রভুর উপযুক্তও নহে। তিনি এখন আর মহাপ্রভুকে কিছুই বলেন না। মনের দুঃখে মরমে মরিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর তীব্র বৈরাগ্য ভাব ক্রমশঃ তীব্রতর হইতে তীব্রতম হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার কঠোরতা ক্রমশঃ ঘন হইতে ঘনীভূত ঘনতম হইতেছে। জগদানন্দ আর তাহা দেখিতে পারেন না। তিনি বিষম শঙ্কটে পড়িলেন। তাঁহার মনে এক একবার ইচ্ছা হয়, নীলাচলে আর থাকিবেন না,—চক্ষে আর মহাপ্রভুর এ অবস্থা দেখিবেন না,—বৃন্দাবনে পলায়ন করিবেন। বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে যাইবেন,—ইহ তাহার মনোগতভাব নহে। চক্ষে মহাপ্রভুর এই দশা দেখিতে হইবে না, এই জন্যই তাঁহার এই বৃন্দাবন গমনেচ্ছা। কিন্তু মহাপ্রভুকে না দেখিয়া তিনি কি করিয়া থাকিবেন, ইহাও তাহার এক বিষম চিন্তা। জগদানন্দ পণ্ডিত উভয়শঙ্কটে পড়িয়া বিষম চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জগদানন্দ স্থির করিলেন তাঁহার পক্ষে বৃন্দাবনে পলায়নই মঙ্গল। পূর্ব্বে একবার মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার এই বৃন্দাবন-দর্শনেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তখন অনুমতি দেন নাই। জগদানন্দের ভাগ্যে বৃন্দাবনদর্শন লাভ ঘটে নাই। তিনি মনে করিতেন মহাপ্রভু যেখানে,সেই তাঁহার বৃন্দাবন,—নীলাচলই তাঁহার বৃন্দাবন। "যাঁহা তুমি,—তাঁহা বৃন্দাবন" এই তাঁহার কথা। এক্ষণে মহাপ্রভুর বিকট বৈরাগ্য-জনিত দুঃখে তিনি অধীর হইয়া মনে মনে নীলাচল-ত্যাগের সংকল্প করিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন "আমি মথুরা যাইব, অনুমতি দিন"। অন্তর তাঁহার অভিমান ও ক্রোধে পরিপূর্ণ,—বাহিরে কিন্তু তাঁহার প্রকাশ নাই।

ভিতরে ক্রোধ দুঃখ বাহ্যে প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিল॥ চৈঃ চঃ

অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু জগদানন্দের মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন—

——' মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি।

আমায় দোষ লাগাইঞা হইবে ভিখারী॥" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ "আমার উপর ক্রোধ করিয়া তুমি মথুরা যাইবে ভিখারী হইবে,—আমাকে তুমি দূষিবে এবং লোকেও দূষিবে, তাহা হইবে না"। জগদানন্দ তখন ছল ধরিলেন। মহাপ্রভুর দুইখানি রাতুলচরণ বক্ষে ধরিয়া অতি কাতর ভাবে নিবেদন করিলেন 'না প্রভু, তুমি যাহা ভাবিয়াছ তাহা নয়। পূর্ব্ব হইতেই আমার বড় ইচ্ছা, একবার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই, জীবন সফল করি। একথা পূর্ব্বে তোমাকে একবার জানাইয়াছিলাম। তখন তুমি অনুমতি দাও নাই,—এখন কৃপা করিয়া অনুমতি কর, আমি শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া ধন্য হই।" মহাপ্রভু হাসিয়া উত্তর করিলেন "না, তাহা হইবে না"। জগদানন্দ মনে মনে বুঝিলেন মহাপ্রভু তাঁহাকে সহজে ছাড়িবেন না,—তাঁহার অন্তিম দশা দেখাইয়া তবে ছাড়িবেন। মনের ভাব মনে রাখিয়া,—প্রাণের দুঃখ প্রাণে চাপিয়া তিনি পুনঃপুনঃ মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবার আজ্ঞা চাহিতে লাগিলেন। প্রভু কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না!

প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার।

তিঁহো প্রভু ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বারে বার॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর এই যে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ, ইহার মর্ম্ম অতিশয় নিগূঢ়। তিনি জগদানন্দকে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে অনুমতি দিতেছেন না কেন? ব্রজের ভজনসাধন-তত্ত্ব একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুশীলন করিলেই বুঝিতে পারা যায় ব্রজ গোপিকা-গণের অনুগা না হইলে কেহ ব্রজের মধুরভজনের অধিকারী হইতে পারে না। জগদানন্দ এই ব্রজগোপিকার অনুগা না হইয়া,ব্রজের ভজন শিক্ষা না করিয়া একেবারে ব্রজেন্দ্রনন্দনের চরণ-প্রাপ্তির বাসনা করিয়াছেন। ব্রজগোপিকার প্রধানা সখি ললিতা স্বরূপদামোদররূপে নীলাচলে বর্ত্তমান রহিয়া-ছেন। জগদানন্দ তাঁহার নিকট না গিয়া একেবারে মহা-প্রভুর নিকট বৃন্দাবন-গমনের জন্য অনুমতি লইতে আসিয়া-ছেন। সেইজন্য ধর্ম্ম মর্য্যাদারক্ষক এবং ধর্ম্ম নীতিপালক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাহাকে ব্রজগমনের অনুমতি দিলেন না, বা দিতে পারিলেন না। মর্য্যাদালঙ্ঘন মহাপ্রভু স্বয়ং কখন করেন নাই, এবং তাঁহার অনুগত নিজজনকেও করিতে দেন নাই। বিশেষতঃ ভজনরাজ্যে এরূপ মর্য্যাদা লঙ্ঘন অর্থাৎ "ঘোড়া ডিঙ্গিয়া ঘাস খাওয়া" বড় বিষম কথা। মহাপ্রভু জগদানন্দকে ব্রজের ভজন-রীতি শিক্ষা দিবার জন্য এই লীলারঙ্গটি প্রকট করিলেন।

জগদানন্দ যখন মহা পীড়াপীড়ি করিয়াও প্রভুর অনুমতি পাইলেন না,—তখন স্বরূপ দামোদরগোসাঞির শরণাপন্ন হইলেন। ইহাই মহাপ্রভুর ইচ্ছা এবং ইহাই জগদানন্দের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ব্রজের ভজনরাজ্যে ব্রজ-গোপিকাগণই অধীশ্বরী তাঁহাদিগের অনুগত হইয়া তবে ব্রজের ভজন-রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ হয়। ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভুর এই লীলাভঙ্গী।

জগদানন্দ স্বরূপ গোসাঞিকে কি কহিলেন শুনুন,—

স্বরূপের ঠাঞি পণ্ডিত কৈল নিবেদন।

পূর্ব্বে হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন॥

প্রভুর আজ্ঞা বিনা তাতে যাইতে না পারি।

এবে আজ্ঞা দেন মোরে ক্রোধে যাহ বলি॥

সহজেই তাহা মোর যাইতে না হয়।

প্রভুর আজ্ঞা লঞা দেহ করিয়া বিনয়॥ চৈঃ চঃ

এই যে স্বরূপ দামোদরগোসাঞি ইনিই পূর্ব্বলীলার ললিতা সখি মহাপ্রভুর প্রেরণায় এক্ষণে জগদানন্দের মনে ব্রজের প্রকৃত ভজনতত্ত্ব-রহস্য স্ফুরিত হইল,—প্রকৃত ভজনপন্থা অনুভূত হইল। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে স্বরূপ গোসাঞির শরণ লইতে শিখাইয়া দিলেন। জগদানন্দ অকপটভাবে স্বরূপ দামোদর গোসাঞির চরণে মনের কথা সকল ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন "গোসাঞি! বৃন্দাবন যাইতে পূর্ব্ব হইতেই আমার মন বড় চঞ্চল। মহা-প্রভুর অনুমতি ভিন্ন কি করিয়া যাইতে পারি? তাঁহার চরণে আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে গেলাম,—তিনি তাহা দিলেন না। ক্রোধভরে কহিলেন "যাও"। এরূপ স্থলে আমার বৃন্দাবন যাওয়া উচিত নহে। কিন্তু মন মানিতেছে

না।—ব্রজলীলাস্থলী দর্শন করিতে মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে,—তুমি মহাপ্রভুর বড় প্রিয়পাত্র, তুমি একবার আমার জন্য তাঁহার চরণে এই কথাটি নিবেদন কর। আমি তোমার চরণে ধরিয়া বিনয় করিয়া বলিতেছি,—তুমি আমার এই কার্য্যটি করিয়া আমাকে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখ।" ইহাই হইল সখির আনুগত্য,—ইহাই ব্রজের মধুর ভজনের রীতি।

স্বরূপ দামোদর গোসাঞি তখন মহাপ্রভুর নিকট গিয়া জগদানন্দের বৃন্দাবন-দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা জানাইয়া কহিলেন—

"জগদানন্দের বড় ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবনে।
তোমার ঠাঁই আজ্ঞা এহো মাগে বার বার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার॥
আই দেখিবারে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার, তাঁহার প্রচ্ছন্ন-লীলার সকলি প্রচ্ছন্ন ভাব। ললিতা সখিরূপা স্বরূপ দামোদর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপী মহাপ্রভুর চরণে জগদানন্দের মনবাসনা জানাইলেন। এ নিবেদনও প্রচ্ছন্নভাবে করিলেন। তিনি বলিলেন "জগদানন্দ ত তোমার জননী দেখিবার জন্য নবদ্বীপে মধ্যে মধ্যে যায়,—সেইরূপ এবার একবার বৃন্দাবন হইয়া আসুক না"। অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু সুচতুর স্বরূপের চতুরতাপূর্ণ এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া জগদানন্দের বৃন্দাবনগমনের আদেশ দিলেন। ভিতরের কথা কেহই কাহারও নিকট ভাঙ্গিলেন না।

মহাপ্রভু তখন জগদানন্দকে পুনরায় নিকটে ডাকাইলেন। জগদানন্দ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন,—স্বরূপ গোসাঞি স্বয়ং মহাপ্রভুর আদেশ তাঁহাকে শুনাইলেন। তিনি শুনিয়া নীরব রহিলেন। মহাপ্রভু জগদানন্দের মুখের প্রতি এক বার করুণ নয়নে চাহিলেন,—উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন মাত্র উভয়েই অধোবদন হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনী রহিলেন। মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে,—ইহা ভাবিয়া জগদানন্দ পরম বিহ্বল হইলেন,—জগদানন্দকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া মহাপ্রভুও পরম বিহ্বল হইলেন। দুই জনেরই নয়নে ঝর ঝর নীরধারা লক্ষিত হইল। স্বরূপ দামোদরগোসাঞি তাহা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিলেন এবং বুঝিলেন উভয়েই বিষম বিরহকাতর হইয়াছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। চতুর চূড়ামণি মহাপ্রভু নিজ মনভাব গোপন করিতে বিলক্ষণ পটু। তিনি ভাব সম্বরণ করিয়া জগদানন্দকে হাতে ধরিয়া নিকটে বসাইলেন এবং বৃন্দাবন-যাত্রার কথা তুলিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। জগদানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর এই সকল অমূল্য উপদেশগুলি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত হইল। এই উপদেশ গুলি ভক্তবাৎসল্যের সীমা।

"বারানসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে।
আগে সাবধান যাইহ ক্ষত্রিয়াদি সাথে॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে বড়ই প্রমাদে॥
মথুরা গেলে সনাতনের সঙ্গে সে রহিবা।
মথুরার স্বামী সবার চরণ বন্দিবা॥
দূরে রহি ভক্তি করিবা, সঙ্গে না রহিবা।
তা সবার আচার চেষ্টা লইতে নারিবা॥
সনাতনের সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা এক ক্ষণ॥
শীঘ্র আসিহ, তথা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল॥
আমিও আসিতেছি, কহিও সনাতনে।"
আমার তরে এক স্থান করে বৃন্দাবনে॥

মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনের পথের বিপদের কথা তুলিয়া এবং তাহা হইতে উদ্ধারের পন্থা সকল বলিয়া দিয়া জগদানন্দকে সর্ব্বপ্রথমে সনাতন গোস্বামীর সঙ্গ করিতে বলিলেন। তাহার পর বলিলেন ব্রজবাসীর প্রতি বিধিমত সম্মান করিবে,—কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্গে একত্রে বাস করিবে না, কারণ তাঁহাদিগের আচার, ব্যবহার, কৃষ্ণপ্রীতি এবং প্রেমচেষ্টা সকলি অদ্ভুত এবং আমাদের পক্ষে নূতন এবং অননুভবনীয়। তাহা অনুকরণ করিবার চেষ্টা বিফল,

তাহা অনুকরণীয় নহে,—অনুভবনীয়। দূর হইতে তাঁহাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে,—এক দণ্ডের জন্যও সনাতন গোস্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করিবে না,—কারণ এমন সৎসঙ্গ জীবনে আর কোথাও পাইবে না চিরকাল বৃন্দাবনে বাস করিও না,—শীঘ্র চলিয়া আসিও।" মহাপ্রভুর এই কথাটির দ্ব্যর্থ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তিনি জগদানন্দকে বড় ভাল বাসেন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না, বলিয়া এই কথা বলিলেন, দ্বিতীয়তঃ বৃন্দাবন-বাস অপেক্ষা, বৃন্দাবন-বিরহব্যথা সুখকর। শ্রীবৃন্দাবনে শারীরিক বাস অপেক্ষা মানসিক বাসই পরম শ্রেয়ঃ। বৃন্দাবনে বাস করিলে বৃন্দাবনবাসীর প্রতি বৃন্দাবন-প্রীতির অভাবজনিত অপরাধ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু দূরে থাকিয়া বৃন্দাবনের ধ্যান ও চিন্তায় ব্রজবাসীর প্রতি প্রীতি বৰ্দ্ধিত হয়। মিলন অপেক্ষা বিরহে সুখ আছে,—ইহা শাস্ত্রবাক্য এই জন্যই বোধ হয় মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন নাই। সর্ব্বশেষে তিনি জগদানন্দকে আদেশ দিলেন—

"গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল"।

গোবর্দ্ধনগিরির উপরে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীসেবিত বালগোপালমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণরূপী গিরিরাজকে লঙ্ঘন করিতে হয়। গোবর্দ্ধনগিরি শ্রীকৃষ্ণের কলেবর, তাহা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীবালগোপালমূর্ত্তি দর্শন করিতে জগদানন্দকে নিষেধ করিয়া মহাপ্রভু বুঝাইলেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি এবং গোবর্দ্ধন অভিন্নতত্ত্ব। মহাপ্রভুর ইচ্ছা আর একবার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তাই জগদানন্দকে সর্ব্বশেষে বলিলেন—

"আমিও আসিতেছি কহিও সনাতনে।"

এই সকল কথা বলিয়া ভক্তবৎসল মহাপ্রভু জগদানন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতকৃতার্থ করিয়া বিদায় দিলেন। জগদানন্দ প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ গৌর জগদানন্দ-বিদায়-লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। কারণ মহাপ্রভুর কমল নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা লক্ষিত হইতেছে,—জগদানন্দের বিরহ তাঁহার অসহনীয় হইয়াছে,—ভক্তবৃন্দ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। আর জগদানন্দকে তাঁহারা কিরূপ দেখিলেন,—তাহাও শুনুন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি বিদায় লইয়া করযোড়ে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আছেন, নয়ন ভরিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের অপরূপ রূপ দেখিতেছেন, আর অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন,—তাঁহার নয়নে পলক নাই,—তাঁহার নিমেষশূন্য নয়ন যেন মহাপ্রভুর চন্দ্রবদনে একেবারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে,—তাঁহার নয়নধারায় ভূমিতল সিক্ত হইতেছে। তিনি যেন আর মহাপ্রভুর আঙ্গিনা ছাড়িতে পারিতেছেন না। বহুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল, ভক্তবৃন্দ নীরবে ভক্ত ও ভগবানের এই অপূর্ব্ব প্রেমলীলারঙ্গ দর্শন করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন—

"জগদানন্দের সৌভাগ্যের কি কহব উপমা"

মহাপ্রভু এতক্ষণ অধোবদনে ছিলেন। এক্ষণে তিনি একবার সজল করুণনয়নে জগদানন্দের মুখের দিকে চাহিলেন,—আর জগদানন্দ লজ্জায় মুখ ফিরাইলেন এবং নিজ ভাব সম্বরণ করিলেন। বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগদানন্দ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব রক্ষা করিলেন। তাঁহার পর তিনি একে একে সকল ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বনপথে বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন।

এই যে জগদানন্দের মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া বৃন্দাবন-যাত্রা, ইহা নিগূঢ় রহস্যপরিপূর্ণ। তিনি মহাপ্রভুর দুঃখ ও কষ্ট দর্শনে অসমর্থ হইয়া নীলাচল ত্যাগ করিলেন, তাঁহার সেবা ত্যাগ করিলেন। এই যে ত্যাগ,—ইহা প্রকৃত পক্ষে ত্যাগ নহে,—ইহা প্রীতির পরাকাষ্ঠা এবং প্রেমভক্তির চরমাবস্থা। এই বৃন্দাবনযাত্রাকালে পণ্ডিত জগদানন্দের মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং এই বৃন্দাবন যাত্রা কিরূপ ছিল, তাহা তিনি তাঁহার রচিত "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব ও মধুর পদটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ ইহা আস্বাদন করুন।

গৌরাঙ্গ তোমার, চরণ ছাড়িয়া, চলিনু শ্রীবৃন্দাবনে।
পূর্ব্বলীলা তব, দেখিব বলিয়া, হইল আমার মনে॥

কেন সেই ভাব, হ'ল আমার, এখন কাদিয়া মরি।
তোমারে না দেখি, প্রাণ ছাড়ি যায়, না জানি এবে কি করি॥
ও রাঙ্গা চরণ, মম প্রাণ ধন, সমুদ্র বালিতে রাখি।
কি দেখিতে আইনু, নিজ মাথা খাইনু, উড়ু উড়ু প্রাণপাখি॥
যত চলি যাই, মন নাহি চলে, তবু যাই জেদ করি।
প্রেমের বিবর্ত, আমারে নাচায়, না বুঝিয়া আমি মরি॥
গৌরাঙ্গের রঙ্গ, বুঝিতে নারিনু, পড়িনু দুঃখ-সাগরে।
আমি চাই যাহা, নাহি পাই তাহা মন যে কেমন করে॥
গৌরাঙ্গের তরে, প্রাণ দিতে যাই, না হয় মরণ তবু।
মরিব বলিয়া, পড়িয়া সমুদ্রে, খাই মাত্র হাব ডুবু॥
সে চন্দ্রবদন, দেখিবার লোভে, শীঘ্র উঠি সিন্ধু তটে।
পুন নাহি দেখি, প্রাণ উড়ি যায়, চলি পুন টোটাবাটে॥
গোপীনাথাঙ্গনে, দেখি গোরামুখ, পড়ি অচেতন হঞা।
পণ্ডিত গোসাঞি, মোরে লঞা রাগে,দেখি পুনঃ সংজ্ঞা পাঞা॥
গৌর গদাধর, বসিয়া দুজনে, বলেন আমার কথা।
অমনি কাদিয়া, যাই গড়াগড়ি, না বিচারি যথা তথা॥
ক্ষণেক বিরহ, সহিতে না পারি, গৌর মোর হৃদে নাচে।
মরিতে না দেয়, বাঁচিলে কোন্দল, কিসে মোর প্রাণ বাঁচে॥
হেন অবস্থায়, গৌরপদ ছাড়ি, মোর বৃন্দাবন আসা।
এ বুদ্ধি হইল, কেন নাহি জানি, ইহ পরকাল নাশা।
আজ্ঞা লইনু যাইতে, আজ্ঞা না পালিলে, তাতে হয় অপরাধ।
গোরাচাঁদ মুখ, না দেখিয়া মরি, সব দিকে মোর বাধ॥
গোরাপ্রেম যার, শঙ্কট তাহার, প্রাণ লঞা টানাটানি।
গদাধর গণে, এইত দুর্দ্দশা, সবে করে কাণাকাণি।

আর একটী পদে পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর উক্তি দ্বারা তাঁহার ভক্ত-বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা যে বিড়ম্বনা, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—

ভাই রে বৃন্দাবনে যাওয়া আর হলো না।
গোরামুখ না দেখিয়া, গোরারূপ ধেয়াইয়া,
পথ ভুলে যাই অন্য দেশ।
সেখান হইতে ফিরি, পুন যদি ধীরি ধীরি,
পুন আসি দেখি সে প্রদেশ॥
এইরূপে কত দিনে, যাব আমি বৃন্দাবনে,
না জানি কি হবে দশা মোর।
বৃক্ষতলে বসি বসি, কাটি আমি অহর্নিশি,
কভু মোর নিদ্রা আসে ঘোর॥
স্বপ্নে বহুদূর গিয়া, সিন্ধুতটে প্রবেশিয়া,
দেখি গোরার অপূর্ব্ব নর্ত্তন।
গদাধর নাচে সঙ্গে, ভক্তবৃন্দ নাচে রঙ্গে,
গায় গীত অমৃত বর্ষণ।
নৃত্য গীত অবসানে, গোরা মোর হাত টানে,
বলে "তুমি ক্রোধে ছাড়ি গেলে।
আমার কি দোষ বল, তব চিত্ত সুচঞ্চল,
ব্রজে গেলে আমা হেথা ফেলে॥
আইস আলিঙ্গন করি, তব বক্ষে বক্ষ ধরি,
ছাড়ো মুঞি চিত্তের বিকার।
মধ্যাহ্নে করিয়া পাক, দেহ মোরে অন্ন শাক,
ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হউক আমার॥
ছাড়িয়া জগদানন্দে, মোর মন নিরানন্দে,
ভোজনাদি নৈল কতদিন।
কি বুঝিয়া গেলে তুমি, দুঃখেতে পড়িনু আমি,
জগা মোর সদা দয়াহীন॥
শীঘ্র ব্রজ নিরখিয়া, আইস তুমি সুখী হঞা,
মোরে দেহ শাকান্ন ব্যঞ্জন।
তবেত বাঁচিব আমি, তাতে সুখী হবে তুমি,
ক্রোধে মোরে না ছাড় কখন॥"
নিদ্রা ভাঙ্গি দেখি আমি, বহুদূর ব্রজভূমি,
নিকটেতে জাহ্নবী পুলিন।
আহা! নবদ্বীপ-ধাম, নিত্য গৌর-লীলা গ্রাম,
ব্রজসার অতি সমীচীন।
আনন্দেতে মায়াপুরে, প্রবেশিনু অন্তঃপুরে,
নমি আমি আই-মাতা-পদ।
গৌরাঙ্গের কথা বলি, শীঘ্র আইলাম চলি,
দেখি নবদ্বীপ সুসম্পদ॥

ভাবিলাম বৃন্দাবন, করিলাম দরশন,
আর কেন যাব দূর দেশ।
গৌর দরশন করি, সব দুঃখ পরিহরি,
ছাড়ি দিব বিরহজ ক্লেশ॥

এই যে জগদানন্দপণ্ডিতের নবদ্বীপ-দর্শনে ব্রজদর্শন ভাব,—ইহা তাঁহার গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার পূর্ণ পরিচয়। যেমন অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর,—তেমনি অভিন্ন বৃন্দাবন তাঁহার জন্মলীলাস্থলী—শ্রীনবদ্বীপধাম। পণ্ডিত জগদানন্দ আর একটী পদে লিখিয়াছেন—

* * * * *

"ষোল ক্রোশ নবদ্বীপে বৃন্দাবন মানি"।
যশোদানন্দনে আর শচীর নন্দনে।
যে জন পৃথক দেখে সে না মরে কেনে॥
নবদ্বীপে না পাইল যেই বৃন্দাবন।
বৃথা সে তার্কিক কেন ধরয়ে জীবন॥

প্রেমবিবর্ত্ত।

জগদানন্দের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীতির উপমা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রধান পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিত জগদানন্দের অদ্ভুত গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

ঐছে চৈতন্য-নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥ চৈঃ চঃ

সেই অদ্ভুত লীলা-কাহিনীটি এস্থলে বর্ণনা করিব। জগদানন্দ বৃন্দাবনে যাইয়া মহাপ্রভুর আদেশ মত সনাতন গোস্বামীর কুটীরে আছেন। সনাতন গোস্বামী মাধুকরী করিয়া জীবন ধারণ করেন,—আর জগদানন্দ দেবালয়ে স্বহস্তে পাক করিয়া মহাপ্রভুকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পান। কিন্তু দুই জনে এক কুটীরে থাকেন। একদিন পণ্ডিত জগদানন্দ সনাতন গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া দেবালয়ে পাক আরম্ভ করিলেন। মহাবনে মুকুন্দ সরস্বতী নামক একজন অন্য সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি সনাতন গোস্বামীকে একখানি গেরুয়া রঙ্গের বহির্ব্বাস দিয়াছেন; সনাতন গোস্বামী সেই বহির্ব্বাস খানি মস্তকে বান্ধিয়া জগদানন্দ যেখানে পাক করিতেছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু অরুণ বসন পরিধান করেন, সনাতনের মস্তকে অরুণ বর্ণ বহির্ব্বাস দেখিয়া জগদানন্দের মনে হইল এই বসন প্রভুদত্ত এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গসেবিত প্রসাদী বস্ত্র। এই কথা মনে হইতেই তিনি পরম প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পরে সুস্থির হইয়া সনাতন গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গোসাঞি! মহাপ্রভুর প্রসাদী এই রাতুল বস্ত্রখানি কোথায় পাইলে?"

রাঙ্গা বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাঁহারে পুছিলা॥
কোথায় পাইলে এই রাতুল বসন? চৈঃ চঃ

সনাতন গোস্বামী তখন উত্তর দিলেন, "ইহা মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র নহে,—মুকুন্দ সরস্বতী ইহা আমাকে দিয়াছেন" এই কথা শুনিবামাত্র একনিষ্ঠ গৌরভক্তরাজ জগদানন্দের হৃদয় দুঃখে ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইল। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। তিনি তখন রন্ধন করিতেছিলেন,—ভাতের হাঁড়ি উঠাইয়া সনাতন গোস্বামীকে মারিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে কত গালাগালি করিলেন। তখন তাঁহার কাণ্ডাকাণ্ড কিছুই জ্ঞান নাই। সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান পার্ষদভক্ত,—তিনি তাঁহার দ্বারে আজ নিমন্ত্রিত অতিথি,—মহাপ্রভুর আদেশ সনাতনকে বিশেষরূপে সম্মান করিবে,—এসকল কথা জগদানন্দ একেবারে সকলি ভুলিয়া গেলেন। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া নিমন্ত্রিত অতিথিকে কতই না গালাগালি করিলেন,—ভাতের হাঁড়ি ফেলিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন।

সনাতন গোস্বামী পণ্ডিত জগদানন্দকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। তাঁহার স্বরূপ ও স্বভাবও বিশেষরূপে জানিতেন। কি জন্য জগদানন্দের মনে এত বিষম ক্রোধ হইয়াছে,—তাহাও তিনি বুঝিয়াছেন,—তাই তিনি অতিশয় কুণ্ঠিত ও মহা লজ্জিতভাবে অপরাধীর ন্যায় অধোবদনে রহিলেন। জগদানন্দ তখন ভাতের হাঁড়ি চুলাতে রাখিয়া সক্রোধে তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিতে লাগিলেন—

"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥" চৈঃ চঃ

তখন সনাতন গোস্বামী জগদানন্দের ক্রোধাবিষ্ট বদনের প্রতি চাহিয়া স্থিরভাবে সসম্ভ্রমে কহিলেন—

"সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয়॥
ঐছে চৈতন্য-নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল॥
রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবে পরিতে না জুয়ায়।
কোন প্রদেশীকে দিব,—কি কাজ ইহায়॥" চৈঃ চঃ

জগদানন্দ মহাপ্রভুর প্রসাদ ভিন্ন অন্য প্রসাদ গ্রাহ্য করেন না,—ইহা তাঁহার একনিষ্ঠা ভক্তির পরিচয়। মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ সনাতন গোস্বামীকে অপর সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীর বস্ত্রপ্রসাদ মাথায় বাঁধিতে দেখিয়া তিনি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, ইহাতে সর্ব্বেশ্বর মহাপ্রভুকে খর্ব্ব করা হইল। তাই তিনি মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রধান পার্ষদকেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পণ্ডিত জগদানন্দের গৌরাঙ্গপ্রেমের গভীরতা কিরূপ,—কৃপাময় পাঠকবৃন্দ তাঁহার এই কার্য্যেই বুঝিতে পারিতেছেন। সনাতন গোস্বামীকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন,—অতিথির সকল অপরাধই ক্ষম্য। গৌরাঙ্গপ্রেমের প্রবল প্রতাপে জগদানন্দপণ্ডিত নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেন। তিনি ভাতের হাঁড়ি দিয়া নিমন্ত্রিত অতিথিকে মারিতে উদ্যত হইলেন। সনাতন গোস্বামীর অপরাধ অতি সামান্য,—কিন্তু জগদানন্দ তাঁহাকে অতি গুরুতরভাবে শাস্তি দিলেন।

সনাতন গোস্বামীর এই কার্য্যটি ছলমাত্র, তাহা তাঁহার নিজের উক্তিতেই সুস্পষ্ট বুঝা গেল। তিনি বলিলেন, যাহা দেখিবার জন্য এই বস্ত্র মাথায় বাঁধিলাম—সেই অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ-প্রেমলীলারঙ্গ আজ স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। তিনি জগদানন্দের গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার কথা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন,—আজ তাহা প্রত্যক্ষে দেখিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন এবং অকপটে স্বীকার করিলেন ইহা তিনি জগদানন্দের নিকট শিক্ষা করিবার জন্যই এই ছল-পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু সাধনভজন সম্বন্ধে সকল শিক্ষাই দিয়াছিলেন,—এই শিক্ষাটুকু বাকি রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরণায় জগদানন্দ আজ তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পার্ষদকে সেই শিক্ষা দান করিলেন। সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা আজ পূর্ণ হইল। তাই তিনি প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া জগদানন্দকে বলিলেন—

"তুমি না শিখাইলে ইহা শিখিব কেমনে।"

এই কার্য্যে জগদানন্দপণ্ডিতকে তিনি গৌরাঙ্গৈক-নিষ্ঠা-ভক্তিদাতা গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। গৌরভক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে জগদানন্দের অতি উচ্চ আসন। তাঁহার সহিত মহাপ্রভুর লীলারঙ্গ অনন্ত। এ মধুময় লীলা বিস্তার করিবার শক্তি জীবাধম গ্রন্থকারের নাই। যাহা কিছু মহাপ্রভু কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া লিখাইলেন, কৃপাময় গৌরভক্তবৃন্দ তাহাও সূত্ররূপে মনে করিবেন। শক্তিশালী মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র ভাগ্যবান যোগ্য লীলা-লেখকগণ তাঁহার এই মধুর লীলা অধিকতর বিস্তার করিয়া লিখিবেন, যাহা পাঠ করিয়া কলিহত জীবের ভবতাপ দূর হইবে। ঠাকুর নরহরি লিখিয়াছেন—

"গৌর-লীলা দরশনে, বাঞ্ছা হয় মনে মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞিত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি কেহ ইহা দেখি,
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ,
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা।"

জগদানন্দ মহাপ্রভুর আদেশমত অতি শীঘ্রই বৃন্দাবন

হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যে সংকল্প করিয়াছিলেন যে, আর নীলাচলে ফিরিব না,—সে সংকল্প আর রাখিতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর বিরহ-জ্বালা তাঁহার হৃদয়ে ধূধূ জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্র তিনি বহুদিন দেখেন নাই,—তিনি এক দণ্ডও বৃন্দাবনে থাকিতে পারিলেন না। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি অতি শীঘ্র নীলাচলে চলিয়া আসিলেন। কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

"শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ।"

পণ্ডিত জগদানন্দ নীলাচলে আসিয়াই সর্ব্ব প্রথমে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার চন্দ্রবদন দর্শন করিলেন। বহুদিবসের পর তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ হইল। মহাপ্রভুও জগদানন্দকে পাইয়া প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইলেন। প্রেমালিঙ্গন দানে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয় জুড়াইলেন। ভক্ত যেরূপ ভগবানের বিরহে কাতর, ভগবান তদপেক্ষা ভক্তবিরহে অধিকতর কাতর হন। সেই কথাটি মহাপ্রভু এই লীলারঙ্গে দেখাইলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরণতলে দীঘল হইয়া পড়িয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ শ্রীহস্তে ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন, জগদানন্দও প্রেমাবেগে পুনঃ পুনঃ প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া প্রেমাশ্রুবর্ষণে তাঁহার চরণকমল বিধৌত করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব প্রেমলীলারঙ্গের মনোরম দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিরহের পর ভক্ত ও ভগবানের মধু-মিলন যে কিরূপ মধুময়,—তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আজ ধন্য মনে করিলেন।

জগদানন্দপণ্ডিত মহাপ্রভুর জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভেট আনিয়াছেন। প্রেমাবেশে ও প্রেমাবেগে তাহা তাঁহাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা মনে পড়িল। বহির্ব্বাসের এক পুটুলি খুলিয়া তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে ধরিলেন। তাঁহার মধ্যে শ্রীরাসস্থলীর রজ আছে,—রাধারাণীর প্রসাদী বস্ত্র আছে, - নিধুবনের মৃত্তিকা আছে, আরও কত কি আছে এবং বৃন্দাবনের সুমিষ্ট পিলু ফলও আছে। মহাপ্রভু প্রেমানন্দে ব্রজের রজের জন্য শ্রীহস্ত পাতিলেন এবং প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন—"জগদানন্দ। সর্ব্বাগ্রে আমাকে কিঞ্চিৎ ব্রজের রজ দাও, আমি শিরে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হই।" জগদানন্দের কর্ণে এ কথা গেল না। তিনি তাড়াতাড়ি শিল নোড়া লইয়া আসিয়া পিলু ফলগুলি তাহা দ্বারা বাঁটিয়া মহাপ্রভুকে খাইতে দিলেন (১)। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু জগদানন্দের মনের ভাব বুঝিয়া স্বহস্তে ব্রজরজ উঠাইয়া লইয়া প্রেমানন্দে শিরে ধারণ করিলেন—কিছু শ্রীবদনেও দিলেন। তাহার পর জগদানন্দ-দত্ত পিলুফল ভোজন করিয়া তাঁহার প্রেমিক রসিক ভক্তের মনস্তুষ্টি করিলেন। তাহার পর উপস্থিত ভক্তগণ বৃন্দাবনের সেই পিলু ফলের কিরূপ রসাস্বাদন করিলেন, কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শুনুন।

> যেই জানে সেই আঁঠি সহিত গিলিলা।
> যে না জানে গোঁড়িয়া, পিলু চিবাইয়া খাইলা॥
> মুখে তার জ্বাল গেল জিহ্বায় বহে লালা।
> বৃন্দাবনের পিলু খায় এই এক লীলা॥ চৈঃ চঃ

লীলাময় মহাপ্রভু এইরূপে তাঁহার রসিক ভক্তরাজ জগদানন্দকে লইয়া অপূর্ব্ব প্রেমলীলা রসরঙ্গে মত্ত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া আজ তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই। নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ জগদানন্দকে বহুদিন পরে দেখিয়া প্রেমানন্দ-রসে নিমগ্ন হইলেন।

এই জগদানন্দপণ্ডিত প্রণীত "প্রেম-বিবর্ত্ত" শ্রীগ্রন্থ প্রাচীন ও প্রমাণিক গ্রন্থ। তিনি পদকর্ত্তাও ছিলেন। তাঁহার পদ গুলি বড়ই মধুর। তাঁহার রচিত মধুর রসের গৌরাঙ্গ বিষয়ক একটী পদ কৃপাময় পাঠকবৃন্দের আস্বাদনের জন্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীরাগ।

> চাঁদ নিঙ্গাড়ি কেবা, অমিয়া ছানলরে, তাতে মাজল গোরামুখ।
> মোতিম দরপণ, সিন্দুরে মাজল, হেরইতে কতই সুখ॥

(১) সব দ্রব্য রাখি পিলু দিলেন বাঁটিয়া।
বৃন্দাবনের ফল বলি খায় হৃষ্ট হৈয়া॥ চৈঃ চঃ

ভূতলে কি উয়ল চাঁদ ॥
মদন বেয়াধ কি, নারী-হরিণী, পাতল নদীয়ামে ফাঁদ ॥ ধ্রু ॥
গেও মঝু ধরম, গেও মঝু সরম, গেও মঝু কুলশীল মান।
গেও মঝু লাজ ভয়, গুরুগঞ্জনা চায়, গোরা বিনু আথির পরাণ ॥
গৌর-পীরিতে হম, ভেল গরবিত, কুল মানে আনল ভেজাই।
জগদানন্দ কহ, ধনি ধনি তুয়া লেহ মারি যাও লৈয়া বালাই ॥
গৌর-পদতরঙ্গিনী

এই যে নদীয়ানাগরী ভাবের পদ,—এই যে মধুর রসের অফুরন্ত উৎস,—ইহার মূল প্রাচীন গৌরাঙ্গ-পার্ষদগণ। নদীয়া-নাগরী-ভাব নূতন নহে,—ইহা প্রাচীন সিদ্ধ ভক্ত মহাজনগণের ভাব,—ইহা বৈষ্ণব-ভজনরাজ্যে শ্রেষ্ঠতম ভজনপন্থা। এখন কোন সাহসে এই সকল মহাজনী পদের অমর্য্যাদা করিয়া কেহ কেহ বলেন নদীয়ানাগরী ভাবের পদ আধুনিক এবং এই ভাব শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ। ঠাকুর নরহরি, পণ্ডিত জগদানন্দ, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণের ভজনপন্থা অনুসরণ করিয়া যদি নরকেও যাইতে হয় তাহাও স্বীকার,—তথাপি আমরা কোন মতে তাঁহাদের মতের অনাদর করিতে পারিব না। গৌরাঙ্গ নাগর তাঁহার নদীয়ানাগরী ভাবসিদ্ধ রসিক ভক্তবৃন্দের প্রাণবল্লভ ছিলেন। তিনি গদাধরের প্রাণনাথ,—নরহরির চিতচোরা,—জগদানন্দের প্রাণবল্লভ,—বাসু ঘোষের প্রাণপতি! মহাজন কবি কৃষ্ণদাস গাইয়াছেন,—

"স্মররে মন গৌরচন্দ্র নাগর বনোয়ারী।

এই যে নাগরত্ব ইহাই তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অষ্ট চত্বারিংশ অধ্যায়।

—:০:—

নীলাচলে বল্লভ ভট্ট ও মহাপ্রভু।

ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥ চৈঃ চঃ

প্রয়াগতীর্থের অপর পারে অম্বুলিগ্রামে (১) বল্লভভট্টের বাস। প্রয়াগে অবস্থানকালীন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহার বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে যে ভাবে কৃপা করিয়াছিলেন, সে সকল লীলাকথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষ ভাগবত-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। তিনি বাল-গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত এবং বালগোপাল উপাসক। তাঁহার বাৎসল্যভাবের ভজন (১)। তাঁহার কৃত একটি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যও আছে। তাঁহার একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আছে,—তাহাকে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় বলে। গোকুলের গোসাঞিগণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত, এবং তাঁহারা বল্লভ ভট্টকে সাম্প্রদায়িক আচার্য্য এবং গুরুজ্ঞানে মহাপ্রভু বলেন। এই মহাপুরুষের মনে মনে বড় অহঙ্কার ছিল, তিনি উত্তম ভাগবতবেত্তা পণ্ডিত এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-কর্ত্তা। সর্ব্ব গর্ব্বখর্ব্বকারী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ইঁহাকে কেশে ধরিয়া নীলাচলে আনিয়া তাঁহার সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। তিনি যাঁহাকে একবার কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি আত্মসাৎ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার ভক্ত বাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় এবং কৃপার অবধি।

বর্ষান্তে নবদ্বীপের ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। এবৎসরও সকলে আসিয়াছেন। তিনিও প্রেমানন্দে মত্ত আছেন। এই সময় বল্লভ ভট্ট নীলাচলে আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া পরম সমাদর করিয়া নিকটে আসনে বসাইলেন। বল্লভ ভট্ট তখন সবিনয় বচনে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন,—

"বহুদিনের মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল, দেখিল তোমারে ॥
তোমার দর্শন যেই পায় সেই ভাগ্যবান।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান ॥
তোমাকে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে কৃতার্থ হয়ে ইথে কি বিচিত্র ॥
কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥

---

(১) আধুনিক ঝুসিগ্রামের নিকটবর্ত্তী আমুলিয়া গ্রাম।

(১) বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য উপাসন।
বালগোপাল মন্ত্রে তিঁহো করেন সেবন। চৈঃ চঃ

তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু তাঁহার বদনচন্দ্র অবনত করিয়া বল্লভভট্টের মুখে এই আত্মস্তুতিবাক্য শুনিয়া যেন মরমে মরিয়া গেলেন। তিনি দৈন্যের অবতার। আত্মস্তুতি কর্ণে শুনিলে তাঁহার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। এই আত্মগ্লানি ক্ষালনের জন্য তিনি শতমুখে ভক্তের গুণগান করিতে মানস করিলেন, এবং বল্লভ ভট্টকে ভক্তমহিমা বুঝাইবার জন্য এই সুযোগ পাইয়া তাঁহার নদীয়ার ও নীলাচলের প্রধান প্রধান ভক্তবৃন্দের নাম করিয়া তাহাদের গুণগান করিতে লাগিলেন। বল্লভভট্টের ভাগ্যে গৌরভক্তের সঙ্গলাভ ঘটে নাই।—গৌরভক্তের যে কিরূপ মহিমা ও প্রভাব, তাহা তিনি জানিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ এতদিন পান নাই। নদীয়ার সকল ভক্তগণই এক্ষণে নীলাচলে বর্ত্তমান, মহাপ্রভু তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম করিয়া এবং গুণ বর্ণনা করিয়া বৈষ্ণবোচিত দৈন্য সহকারে বল্লভ ভট্টকে কহিলেন—

——"শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হৈল নির্ম্মল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যার সম।
অতএব অদ্বৈত আচার্য্য যার নাম॥
যাহার কৃপায় হয় ম্লেচ্ছের কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তার বৈষ্ণবতা শক্তি॥
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর॥
ষড়দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ষড়দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম॥
তিঁহো দেখাইল মোরে ভক্তিযোগের পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তিযোগ সার॥
রামানন্দ রায় কৃষ্ণরসের নিধান।
তিঁহো জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান॥
তাঁতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাঁহার॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানযুক্ত, কেবল ভাব আর।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে নাহি পাইয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
আত্মভূত শব্দে কহে পারিষদগণ। (১)
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন॥
মোর সখা মোর পুত্র এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন॥ (২)
ঐশ্বর্য্য দেখিলে শুদ্ধার না হয় ঐশ্বর্য্য জ্ঞান।
ঐশ্বর্য্য হৈতে কেবলা-ভাব প্রধান॥
সে সব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
যার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধ ভাব।
দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান্।
যার সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর-রস-জ্ঞান॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন॥
গোপীগণের শুদ্ধভাব ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভৎর্সনা করে এই তার চিহ্ন॥

---

(১) নায়ং সুখাপ ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথাভক্তি মতামিহ॥

(২) ইত্থং সতা ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বশক্তি যিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার ঋণী।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হৈতে কেবলা ভাব প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান॥
তিঁহো যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এসব শিক্ষণ॥
হরিদাস ঠাকুর মহা ভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তিঁহো তিন লক্ষ নাম॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাই শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর॥
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি॥
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু এতগুলি উপদেশপূর্ণ নিগূঢ় শাস্ত্রতত্ত্ব এবং নিজ দৈন্যব্যঞ্জক ও ভক্তমহিমাসূচক মধুর বাক্য বল্লভ ভট্টকে কেন বলিলেন? এতকথা তিনি সহজে কাহাকেও বলেন না। বিশেষতঃ বহিরঙ্গ লোকের সহিত এরূপ নিগূঢ় ব্রজরসতত্ত্ব-বিচার তাঁহার পক্ষে এই নূতন। বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর যে অন্তরঙ্গ ভক্ত নহেন, তাহা সকলেই জানেন, তিনিও জানেন। তাঁহার হৃদয় অভিমানে পরিপূর্ণ, তিনি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত উত্তম বুঝেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস। বাৎসল্যভাব ভিন্ন অন্য ভাবে যে ব্রজের ভজন হয়, তাহা তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না বা জানেন না। তিনি ঐশ্বর্য্যভাবে বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়া ভাগবতের ব্যাখ্যা উত্তম করিতে পারেন। তাঁহার এই সকল অভিমান খর্ব্ব করিবার জন্য, তাঁহাকে ব্রজের মধুর ভজনতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য, শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-ভজন যে কি বস্তু তাহা, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য মহাপ্রভু ভঙ্গী করিয়া এতগুলি কথা তাঁহাকে কহিলেন। বল্লভ ভট্ট অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান, মহাপ্রভুর কথার ভঙ্গীতে তিনি সকলি বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহার মনে দীর্ঘকালের যে অভিমান সঞ্চিত ছিল, মহাপ্রভুর দৈন্যপূর্ণ মধুর কথাগুলি শুনিয়া তাহা অনেক পরিমাণ খর্ব্ব হইল। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে তাঁহার ভক্তবৃন্দের নাম ও গুণগান শুনিয়া তাঁহার মনে বড় ইচ্ছা হইল, তিনি ঐ সকল মহাপুরুষদিগের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহাদের সঙ্গ করেন।

প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ সবারে দেখিবার॥ চৈঃ চঃ

তিনি তখন মহাপ্রভুকে কহিলেন,—

——"এ সব বৈষ্ণব রহেন কোন স্থানে।
কোন প্রকারে ইহা সবার পাইয়ে দর্শনে॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া তখন উত্তর করিলেন "সকলেই এখানে আছেন, কেহ কেহ নবদ্বীপে আছেন। যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন তাঁহারা বাসা করিয়া নানাস্থানে আছেন,—আমার এখানেই তুমি তাঁহাদিগের দর্শন পাইবে"। ইহা শুনিয়া বল্লভভট্ট সবিশেষ আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভুকে তিনি বহু অনুনয় বিনয় করিয়া একদিন গণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন; দয়াময় শ্রীগৌরভগবান তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর বাসাতেই জগন্নাথ দেবের নানাপ্রকার প্রসাদ আনাইয়া মহামহোৎসব করিলেন ভক্তবৃন্দ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাসায় একত্রিত হইলেন। তিনি স্বয়ং বল্লভ ভট্টকে একে একে সকল ভক্তগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন।

"সবার সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা"

বল্লভভট্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধুগণের তেজোময় মূর্ত্তি দেখিয়া, পরম বিস্মিতভাবে একদৃষ্টে তাঁহাদিগের প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং তাহাদিগের সহিত তুলনায় প্রতিক্ষণেই আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন (১)। তিনি অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত সকলের চরণ বন্দনা করিলেন। পরে মহা-মহোৎসবে ভোজন-লীলা আরম্ভ হইল। বল্লভ ভট্ট বহুবিধ প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে আনাইয়াছেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ

(১) বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ সবার আগে ভট্ট খদ্যোত আকার॥ চৈঃ চঃ

পুরীর সহিত বৈষ্ণবসন্ন্যাসীগণ একদিকে বসিলেন। মহাপ্রভু বসিলেন মধ্যস্থলে, তাঁহার দুই পার্শ্বে শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-প্রভু বসিলেন। ইঁহাদের অগ্রপশ্চাৎ গৌড়ীয় ভক্তগণ বসিলেন। পরিবেশক হইলেন স্বরূপগোসাঞি, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, রাঘব, দামোদর এবং শঙ্করপণ্ডিত। ভোজনানন্দে বৈষ্ণবগণ হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে বল্লভভট্ট মাল্যচন্দনে ভক্তগণকে ভূষিত করিয়া তাম্বুলাদি মুখশুদ্ধি দিয়া তাঁহাদিগকে পরম আপ্যায়িত করিলেন।

মহাপ্রভু যে এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন, ইহার এক মাত্র উদ্দেশ্য বল্লভ ভট্টকে তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত মিলন করাইবার জন্য। এই ভক্ত-সম্মিলনীতে সাধু বৈষ্ণবদর্শনে বল্লভ ভট্টের পরম মঙ্গল সাধিত হইল। তিনি সাধুসঙ্গলাভ করিয়া নিজ ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিলেন এবং ভক্তপূজা করিয়া মহা আনন্দিত হইলেন।

"সবার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল।"

রথযাত্রা সম্মুখে উপস্থিত। মহাপ্রভু গণসহ প্রেমানন্দে অধীর। পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক করিয়া সঙ্কীর্ত্তন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইল। এক এক জন এক এক সম্প্রদায়ের কর্ত্তা হইলেন। এই সাতজন কে কে শুনুন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, ঠাকুর হরিদাস, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীবাসপণ্ডিত, রাঘবপণ্ডিত এবং গদাধরপণ্ডিত। মহাপ্রভু বাছিয়া বাছিয়া এই সপ্ত কীর্ত্তন-মহারথীকে সম্প্রদায়ের কর্ত্তা করিয়াছেন। সাত দিকে কীর্ত্তনরণরঙ্গ সর্ব্বত্র সমভাবে চলিতেছে। মহাপ্রভু মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া হুঁঙ্কার করিয়া তাঁহার সেই সুবলিত আজানুলম্বিত হেমদণ্ড বাহু দুইটি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতেছেন। চতুর্দ্দশ মাদলের গগনভেদী উচ্চ ধ্বনিতে শ্রীনীলাচলভূমি কম্পান্বিত বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর এই সকল অদ্ভুত লীলৈশ্বর্য্য দর্শনে একেবারে বিস্ময়রসে বিহ্বল হইয়াছেন। প্রেমানন্দে তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি আর আপনাকে আপনি সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না (১)।

(১) দেখি বল্লভ ভট্টের হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপনা সম্ভাল॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু অতঃপর সকলের নৃত্য বন্ধ করাইয়া তাঁহার ক্ষীণ কটি দোলাইয়া স্বয়ং মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে নয়নরঞ্জন অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী যিনি দেখিলেন তিনিই মজিলেন। তিনিই কুলশীল মান হারাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। যাঁহাদিগের এরূপ সৌভাগ্য লাভ হইল, তাঁহারাই মহাপ্রভুর এই অপরূপ নৃত্যভঙ্গী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নিজকৃত পদে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ দুইটি মধুর পদ কৃপাময় পাঠকবৃন্দের আস্বাদনের জন্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

(১)

নাচত গৌর সুনাগর-মণিয়া।

খঞ্জন গঞ্জন, পদযুগ রঞ্জন, রণরণি মঞ্জীর মঞ্জুল ধ্বনিয়া। ধ্রু।
সহজই কাঞ্চন কান্তি কলেবর, হেরইতে জগজনমনমোহনিয়া॥
ঠমকি কত কোটি, মদন মন মূরছল, অরুণ কিরণ অম্বর বনিয়া।
চাঁদ মুখ দেহ, থেহ নাহি বান্ধই হেরি দিঠি মেহ নয়নে বরিখনিয়া॥
প্রেমক সায়রে, ভুবন ডুবায়ই, লোচনকোণে করুণ নিরখনিয়া॥
ওরসে ভোর ওর নাহি পাওই, পাতকি কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি।
কহ বলরাম, লম্ফ দন হুঙ্কৃত, হেরি পাষণ্ড হৃদয় অতি কাঁপি॥

(২)

বলিকলিদমন শমনভয়ভঞ্জন, নিখিল ভুবনজনরঞ্জনকারী।
ভুলহ প্রেমধনবিতরণপণ্ডিত, সুরতরু নিকর গরব-ভয়হারী॥
নাচত শচীসুত কীর্ত্তন মাঝ॥
কনক ধরাধরনিন্দ রুচিরতনু, বিলসত জনু নব মনমথরাজ। ধ্রু॥
পদতলতালে ধরণীকরু টলমল, ললিতভঙ্গী ভুজ বহত পসারি।
হাসত মৃদু মৃদু, অধর কম্প অতি অথির গদাধর বদন নেহারি।
ডগ মগ নয়ন কমল ঘন থুরত নিরুপম পুরবরঙ্গ পরকাশ।
উলসিত পরম চতুর পরিকরগণ, ইহ রসে বঞ্চিত নরহরিদাস।

মহাপ্রভুর এই কীর্ত্তনরণরঙ্গ দেখিয়া এবং তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া বল্লভভট্টের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা কবিরাজ গোস্বামীর কথায় শুনুন,—

প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়।
"এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ" ভট্টের হইল নিশ্চয়॥

বল্লভভট্ট কৃষ্ণভক্ত, মহাপ্রভু সাক্ষাৎ সে ব্রজেন্দ্রনন্দন

শ্রীকৃষ্ণ, তাহা এক্ষণে তাঁহার মনে বিশ্বাস হইল। মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেন, বল্লভভট্ট তাহা শুনিতেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস হইত না। এক্ষণে তাহা বিশ্বাস হইল। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে তাঁহাকে স্বস্বরূপ দেখাইয়া এই বিশ্বাস করাইলেন।

রথযাত্রা শেষ হইয়া গেল। বল্লভভট্ট নীলাচলেই আছেন। মহাপ্রভুর বাসায় প্রত্যহই তিনি আসেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হয়। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য লিখিয়াছেন, বড় ইচ্ছা তিনি তাহা মহাপ্রভুকে শুনান। মনের কথা খুলিয়া বলিতে সাহস করেন না,—কিন্তু না বলিলেও আর চলে না। বল্লভভট্ট মনে মনে ভাবেন ভাগবতে তিনি বড় পণ্ডিত, তাঁহার কৃত টীকা শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা হইতেও উত্তম। মহাপ্রভু ইহা শুনিলে বড় আনন্দ পাইবেন। মনে মনে এইরূপ দুরাশা পোষণ করিয়া একদিন তিনি তাঁহার চরণে করযোড়ে নিবেদন করিলেন "গোসাঞি! আমি ভাগবতের টীকা লিখিয়াছি। যদি আপনি কৃপা করিয়া শ্রবণ করেন কৃতার্থ হইব।" মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ এবং অন্তর্যামী,—বল্লভভট্টের মনের ভাব সকলি জানেন, তিনি যে শ্রীধর স্বামীর টীকার দোষ ধরিয়াছেন, তাহাও জানিতে মহাপ্রভুর বাকি নাই। তিনি ভঙ্গী করিয়া উত্তর করিলেন—"ভট্ট! শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আমি বুঝিতে পারি না, আমি এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি-শাস্ত্রের অর্থ-শুনিবার অধিকারী নই। কেবল মাত্র বসিয়া বসিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি, তাহারও রাত্রি দিনে সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারি না, এই ত আমার অবস্থা. আমাকে তুমি ক্ষমা করিবে" (১)। বল্লভভট্ট মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই সদৈন্য অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তের মুখে ভাগবতার্থ শ্রবণ করিতে ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন কেন? ইহার মর্ম্ম পরে তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে বলিবেন, তজ্জন্য এস্থানে ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন।

বল্লভভট্ট যখন দেখিলেন মহাপ্রভু তাঁহার কৃত ভাগবতের টীকা শুনিলেন না, তিনি তখন তাঁহার চরণে তাঁহার আর একটি নিবেদন করিলেন। তিনি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল, মহাপ্রভু অবশ্যই কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা শুনিবেন। তাই তিনি পুনরায় করযোড়ে নিবেদন করিলেন "গোসাঞি! আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থবিস্তার করিয়া লিখিয়াছি, আপনি দয়া করিয়া তাহা একবার শ্রবণ করুন।" মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া যে উত্তর করিলেন তাহাতে বল্লভভট্ট স্তম্ভিত হইলেন। তিনি পরম গম্ভীরভাবে কহিলেন,—

———"কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ নাহি মানি।
শ্যাম সুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥
এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥ (২)" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু কৃষ্ণনামের পরম ও চরম অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি অতি সুস্পষ্ট ভাষায় সর্ব্বসমক্ষে শ্লাঘার সহিত বলিলেন যে তিনি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ একেবারেই মানেন না। কৃষ্ণনামের একটি মাত্র অর্থ তিনি জানেন ও মানেন, তাহা এই। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামসুন্দর, এবং তিনি যশোদানন্দন। অন্য অর্থ শুনিতে বা জানিতে তাঁহার অধিকার নাই। মহাপ্রভুর মতে ইহাই কৃষ্ণনামের চরম ব্যাখ্যা।

বল্লভভট্টকৃত কৃষ্ণনামের বহু ব্যাখ্যা যে অসার, তাহা সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু বুঝিয়াই এইরূপ কথা বলিলেন। তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর এইরূপ উপেক্ষার ভাব দেখিয়া বল্লভভট্ট মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং অন্যমনস্কভাবে রহিলেন। তিনি আর তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। তিনি সেদিন মহাপ্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ

(১) প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী॥
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে॥ চৈঃ চঃ

(২) তমাল শ্যামল ত্বিষি শ্রীযশোদা স্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্ব শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ

করিয়া নিজ বাসায় গেলেন, কিন্তু মনে মনে কিছু বিরক্ত হইলেন। মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার যে ভক্তির উদয় হইয়াছিল, তাহার বন্ধন যেন কিছু শ্লথ হইল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"প্রভু-বিষয়ে ভক্তি কিছু হইল অন্তর"।

বল্লভভট্ট আর মহাপ্রভুর নিকটে যান না, বা যাইতে সাহস করেন না। প্রভু যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃত ভাগবতের টীকা ও কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন নাই, একথা সকল ভক্তবৃন্দ শুনিয়াছেন, কারণ মহাপ্রভু লুকাইয়া কিছু বলেন নাই। বল্লভভট্টের মনের প্রবল বাসনা তাঁহার টীকা ও ব্যাখ্যা আর সকলকে শুনান,—মহাপ্রভু শুনেন আর নাই শুনেন। কিন্তু মহাপ্রভুর গণগুলি যে তাঁহারই মত, তাহা বল্লভ ভট্টের জ্ঞান ছিল না। তিনি যাহার নিকট যান, তিনিই তাঁহার টীকা ও ব্যাখ্যা শুনিতে চান না।

প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করেন শ্রবণ॥ চৈঃ চ,

প্রভুর গণ ত দূরের কথা, নীলাচলবাসীও কেহ ভট্টের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাতে বল্লভভট্ট বিশেষ লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করিয়া গদাধর পণ্ডিতের নিকট যাইয়া অতিশয় দৈন্যভাবে কহিলেন—

———"লৈনু তোমার স্মরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥
কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥" চৈঃ চঃ

গদাধর পণ্ডিত মহা শঙ্কটে পড়িলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "একি মহাপ্রভুর পরীক্ষা। তিনি স্বয়ং যাহা শুনেন নাই, তাঁহার ভক্তগণ যাহা শুনেন নাই,—আমি কি করিয়া তাহা শ্রবণ করি। হে কৃষ্ণ! তোমার চরণে শরণ লইলাম, তুমি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমি শুনিতে চাই না,—তবু বল্লভভট্ট আমাকে জোর করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা শুনাইতে চাহেন। আমি কি করি? মহাপ্রভু আমার বিপদ বুঝিবেন, তাঁহাকে আমার তত ভয় নাই, কিন্তু তাঁহার গণকে আমি বড় ভয় করি, তাঁহারা একথা শুনিলে আমাকে কি বলিবেন?

অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু জানিব মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু বিষম তাঁর গণ॥ চৈঃ চঃ

এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া কোন গতিকে তিনি বল্লভভট্টকে সেদিন বিদায় করিলেন। বল্লভভট্ট নীলাচলের কোন স্থানেই তাঁহার ভাগবতের টীকা ও কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যার শ্রোতা পাইলেন না। তখন অগত্যা পুনরায় মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। এক্ষণে পুনরায় তিনি পূর্ব্ববৎ তাঁহার বাসায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর বাসায় সকল ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ আসেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুও আসেন। তাঁহার সঙ্গে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত লইয়া বল্লভভট্ট তর্কবিচার করেন এবং তিনি প্রতিকথায় পরাস্ত হন। কিন্তু তিনি নিজ প্রকৃতি ছাড়িতে পারেন না। একদিন তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে প্রশ্ন করিলেন "আচার্য্য! আপনাদের মতে জীবপ্রকৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পতিজ্ঞানে ভজনা করে, পতিব্রতানারী স্বামীর নাম গ্রহণ করেন না, আপনারাও কৃষ্ণকে পতিজ্ঞানে ভজনা করেন, কিন্তু কৃষ্ণনামও করেন, ইহাতে কি পাতিব্রত্যধর্ম্মহানি হয় না?" বল্লভভট্টের এই প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ঈষৎ হাসিয়া মহাপ্রভুকে দেখাইয়া উত্তর করিলেন "ভট্ট! তোমার অগ্রে সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এ প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিবেন"। মহাপ্রভু তখন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন 'ভট্ট! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই বুঝ না। স্বামীর আজ্ঞা পালনই পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্ম্ম। আমাদের স্বামীর আজ্ঞা, নিরন্তর তাঁহার নাম গ্রহণ কর, অতএব আমরা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। এইজন্য আমরা শ্রীকৃষ্ণনাম লই, নামের ফলও পাই, নামের ফলে শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেম জন্মে' (১)।

(১) প্রভু কহেন তুমি না জান ধর্ম্ম-মর্ম্ম।
স্বামীর আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশবাক্য শুনিয়া বল্লভভট্টের মুখে আর কথা বাহির হইল না। তিনি মহাদুঃখে নিজ বাসায় গমন করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "এক্ষণে আমি কি করি, প্রত্যহই মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ সকলে মিলিয়া আমার মত খণ্ডবিখণ্ড করেন, আমি কি উপায়ে এখানে স্বমত স্থাপন করি? যদি একটি বিষয়েও আমার মত গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলেও আমার মনে কিছু সুখ হয় এবং লজ্জা দূর হয়"। এইরূপ মনে ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন "মহাপ্রভু আমার কৃত ভাগবতের টীকা শ্রবণ করেন নাই, কিন্তু শ্রীধরস্বামীর টীকা যে আমি খণ্ডন করিয়াছি, সে কথা আমি তখন তাঁহাকে বলি নাই। আমার কৃত টীকার নাম শুনিয়া তিনি তাহা শুনিতে চান নাই। শ্রীধরস্বামীর টীকা খণ্ডন দুঃসাধ্য, কিন্তু আমি এই অসাধ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছি, একথা মহাপ্রভু শুনিলে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন, এবং আমার বিচারপ্রণালী ও খণ্ডনবাক্য শুনিবেন"। বল্লভভট্টের এই অভিমানপূর্ণ ও দুর্দ্দমনীয় আত্মগর্ব্বপ্রকাশক মনোভাব সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভুর নিকট গুপ্ত থাকিবার বস্তু নহে। তিনি সর্ব্বগর্ব্বখর্ব্বকারী স্বয়ং ভগবান। বল্লভভট্টের এই দুর্দ্দমনীয় বিদ্যাভিমান দূর করিবার জন্য দর্পহারী শ্রীগৌর ভগবান তাঁহার মনে এইরূপ আত্মগরিমা উদয় করিয়া দিয়াছেন।

এইরূপ গর্ব্বপূর্ণ মনোভাব লইয়া বল্লভভট্ট একদিন মহাপ্রভুর বাসাতে আসিলেন। তিনি তখন সর্ব্বভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তারকামধ্যে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বল্লভ ভট্ট সেই সভার মধ্যে "হংস মধ্যে বক যথা" হইয়া বসিলেন। ইহা কবিরাজ গোস্বামীর কথা, যথা—

"রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়।"

তিনি সেই সভার মধ্যে বসিয়া মহাপ্রভুর শ্রীবদনের দিকে চাহিয়া গর্ব্বিত বচনে কহিলেন—

"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তার ব্যাখ্যার বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাহা যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি॥" চৈঃ চঃ

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর প্রতি বল্লভভট্টের এই গর্ব্বপূর্ণ অবজ্ঞা-সূচক বাক্য শ্রবণে সভাস্থ সকল ভক্তবৃন্দই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া কটমট নয়নে চাহিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুকে উদ্দেশ করিয়া ভট্ট এই কথা বলিয়াছেন, এবং তিনিই ইহার উত্তর দিবেন, ইহা মনে করিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিতেছেন না। সকলেই প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। নিরপেক্ষ ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষক স্পষ্টবাদী মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া শ্রীবদন ফিরাইয়া মহা বিরক্তভাবে উত্তর করিলেন—

—————"স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥ চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়াই তিনি মৌন রহিলেন। সমস্ত ভক্তগণ অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার শ্রীমুখের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে এই উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া সকলেরই মনে অপার আনন্দ হইল। সেখানে তখন উচ্চ হাসির উৎস উঠিল। বল্লভ ভট্ট লজ্জায় অপমানে অধোবদন হইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার চন্দ্রবদন উঠাইয়া একবার ভক্তবৃন্দের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন, অমনি সকলেই তখন নীরব হইলেন। মহাপ্রভুর এই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতের মর্ম্ম "তোমরা মানীর মান রাখিতে জান না?" ভক্তবৃন্দ যে উচ্চ হাসি হাসিয়া বল্লভভট্টকে টিটকারী দিয়াছিলেন, তাহা মহাপ্রভুর ভাল লাগে নাই। বল্লভভট্ট পরম পণ্ডিত এবং তাঁহার ভক্ত। তবে এই যে উপেক্ষা, ইহা মহাপ্রভুর তাঁহার প্রতি কৃপাদণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ তাঁহার বিদ্যাগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই এই সকল মহাপ্রভুর লীলাভঙ্গী। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার॥
নানা অবজ্ঞায় ভট্টে শোধে ভগবান।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে॥ চৈঃ চঃ

বল্লভ ভট্ট-উদ্ধার-লীলারঙ্গ এখনও শেষ হয় নাই। এই

মধুর লীলারঙ্গের শেষাঙ্কই মধুর হইতেও মধুর। বল্লভভট্ট নিজ বাসায় আসিয়া সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না,—গভীর চিন্তাসাগরে তিনি নিমগ্ন হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন এরূপ হইল কেন? প্রয়াগে পূর্ব্বে প্রভু আমাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন, আমার গৃহে যাইয়া স্বগণসহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া স্বগোষ্ঠী আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার মন ফিরিয়া গেল কেন? ইহাতে বোধ হইতেছে, তাঁহার নিকট আমি অপরাধী হইয়াছি. আমি এমন বিশেষ কিছু অপরাধ করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না. তবে—

আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান॥ চৈঃ চঃ

ইহা আমারই দোষ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি এবং এই দোষ যে বিষম দোষ, এবং ভক্তিপথের বিষম বাধক ও ভীষণ কণ্টক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের স্বভাবই সর্ব্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষা,—আমার মঙ্গলার্থেই তিনি আমাকে পদে পদে এইরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতেছেন। আমি অধম জীব, ঈশ্বরের কার্য্যে দোষ দেখি এবং তজ্জন্য মনে বিষম দুঃখ পাই।

"আমার হিত করেন ইহো আমি মানি দুঃখ"। চৈঃ চঃ

সমস্ত রাত্রি ভট্ট এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং অনুতাপানলে নিজ হৃদয় দগ্ধ করিয়া শোধন করিলেন। প্রাতে উঠিয়াই অতিশয় দীনভাবে মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে আসিয়া করযোড়ে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন—

"আমি অজ্ঞ অজ্ঞোচিত যে কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল॥
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥
আমি অজ্ঞ হিত স্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা করিলা অজ্ঞান॥
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব অন্ধ গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে এবে জ্ঞান হৈল॥
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥" চৈঃ চঃ

ভট্টের মন এক্ষণে প্রভুর কৃপায় পরিশুদ্ধ হইয়াছে, অবিশুদ্ধ স্বর্ণ দগ্ধ করিলে তবে বিশুদ্ধ হয়, বল্লভ ভট্ট স্বর্ণ ছিলেন নিঃসন্দেহ, কারণ তিনি কৃষ্ণভক্ত, কিন্তু মন তাঁহার অভিমান রূপ মলিনতায় অবিশুদ্ধ দিল। মহাপ্রভু তাঁহাকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষারূপ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইলেন। এক্ষণে অনুতাপ-বহ্নিতে তিনি স্বয়ং দগ্ধ হইতেছেন, ইহাতে তিনি বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতর হইতেছেন। তিনি এক্ষণে মহাপ্রভুর কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন,—আপনার দোষ আপনি দেখিতে শিখিয়াছেন, আত্মনিন্দা কীর্ত্তন করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহার আত্মনিবেদনে এক্ষণে কপটতার চিহ্ন মাত্র নাই—তিনি নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া মহাপ্রভুর অভয় পদে শরণ লইলেন। দয়ার অবতার শ্রীগৌরভগবান তখন তাঁহার শরণাগত ভক্তকে উপযুক্ত উপদেশ দানে কৃতার্থ করিলেন। সে উপদেশামৃত যে কি বস্তু, তাহা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শুনুন—

প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত॥
শ্রীধর স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর স্বামী নাহি মান, এত গর্ব্ব ধর॥
শ্রীধর স্বামীর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
অর্থ ব্যর্থ লিখন সেই, লোক না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

সর্ব্ব ধর্ম্মরক্ষক শিক্ষাগুরু মহাপ্রভু ভট্টকে যে উপদেশ দিলেন, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও অতি সারবান। তিনি বলিলেন (১) পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর অনুগত হইয়া ভাগবতার্থ ব্যাখ্যা কর (২) অভিমানশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর (৩) অপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন কর। মহাপ্রভুর শেষ দুইটি উপদেশ বড় কঠিন। বল্লভভট্ট তাঁহার উপদেশগুলি বেদবাক্য অপেক্ষাও বলবান মনে করিয়া অতিশয় প্রসন্নচিত্তে হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে আর একদিন মহাপ্রভু ভট্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া গণসহ আনন্দোৎসব করিলেন। অপমানিত বল্লভ-ভট্টের মনে সুখ দিবার জন্যই মহাপ্রভুর, এই ভোজন-লীলারঙ্গ। তিনি ভক্তের ভগবান, ভক্তসুখই তাঁহার এই লীলার তাৎপর্য্য।

বল্লভ ভট্টের প্রতি মহাপ্রভুর শেষানুগ্রহ এখন বলিব। ব্রজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর ভজনের অধিকারী—কোটির মধ্যে একজন। পরম দয়াল মহাপ্রভু ভট্টকে এই কোটির মধ্যে একজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। বল্লভভট্ট বালগোপাল উপাসক, এবং বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত। গদাধর পণ্ডিত এবং জগদানন্দপণ্ডিত ব্রজরসরসিক এবং মধুর-ভজননিষ্ঠ একান্ত গৌরভক্ত। ইচ্ছাময় মহাপ্রভুর ইচ্ছায় বল্লভ ভট্ট ইঁহাদিগের সঙ্গ করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ সত্যভামার ভাবে মহাপ্রভুকে মধুরভাবে ভজনা করেন, গদাধর রুক্মিণীর ভাবে প্রভুর মন হরণ করেন। ইঁহাদিগের দুইজনের অভিমান ও প্রণয়রোষজনিত রসকথাবার্ত্তা শুনিতে মহাপ্রভুর বড়ই ভাল লাগে। বল্লভভট্ট তাঁহাদের নিকট মহাপ্রভুর এই সকল অপূর্ব্ব লীলাকথা শুনিলেন তিনি ঐশ্বর্য্যভাবে বালগোপাল উপাসনা করেন। এক্ষণে তাঁহার কিশোরগোপাল উপাসনা করিতে মন ফিরিয়া গেল। গদাধর ও জগদানন্দ পণ্ডিতদ্বয়ের নিকট তিনি এই মধুর ভজনতত্ত্বের সন্ধান পাইয়া এই সম্বন্ধে পরম গুহ্য মন্ত্রাদি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গদাধরপণ্ডিত কহিলেন—

"এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে
আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র॥
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই মহাপ্রভু দেন ওলাহন॥" চৈঃ চঃ

বল্লভ ভট্ট এই কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে মধুর ভজনতত্ত্ব কিছুই বলিলেন না, বরঞ্চ ভয় দেখাইলেন। ইহাতে মহাপ্রভুর কি ইচ্ছা, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া তিনি কয়েক দিন চিন্তায় কাটাইলেন। কিন্তু তাঁহার মধুর ভজনতত্ত্ব জানিবার প্রবল ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী রহিল। তিনি মহাপ্রভুকে নিত্য দর্শন করেন, কিন্তু মনের ভাব মনে রাখেন, সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু এক্ষণে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন। তিনি নিমন্ত্রণের দিনে গদাধর পণ্ডিতকে নিজ বাসায় ডাকাইলেন। তাঁহার আদেশে স্বরূপ গোসাঞি, জগদানন্দ পণ্ডিত এবং গোবিন্দ তিন জনে তাঁহাকে ডাকিতে গেলেন। বল্লভ ভট্টের তিনি সঙ্গ করেন, এজন্য একদিন মহাপ্রভুর নিকট গদাধর বড়ই লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই ভয়ে তিনি আর তাঁহার বাসায় আসেন নাই। পথে স্বরূপ গোস্বামী গদাধরকে কহিলেন "মহাপ্রভু তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এরূপ করিয়াছিলেন। বল্লভভট্টকে এখন তিনি বিশেষ প্রীতি করেন। তুমি কেন তাঁহাকে বলিলে না তিনিও ত বল্লভভট্টের সঙ্গ করেন'। মহাপ্রভুর প্রতি গদা-ধরের ভাব জগদানন্দের মত সত্যভামার ভাব নহে, তাঁহার ভাব রুক্মিণীর দক্ষিণাভাব। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে পরিহাস ছলে ক্রোধব্যঞ্জক কথা কহিলে তাঁহার মনে ত্রাস উপস্থিত হইত। গদাধরের সেইরূপ হইয়াছিল। তিনি ভট্টের সঙ্গ করেন, মহাপ্রভু একথা যখন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে বিষম ত্রাস হইয়াছিল। সেই ভয়ে তিনি তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করেন নাই। গদাধরের ভাব ও স্বভাব চিরদিন পরম নম্র, তিনি মুখ তুলিয়া মহাপ্রভুর সহিত কথা কহিতে

পারেন না। তিনি স্বরূপ গোসাঞির কথার উত্তর নিজ স্বভাবানুরূপ দিলেন। তিনি বলিলেন—

———প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করি ভাল নাহি মানি॥
যেই কহেন সেই-সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনি করিবেন কৃপা দোষাদি বিচারি॥" চৈঃ চঃ

রসিক ভক্ত স্বরূপদামোদর গোসাঞি গদাধরের ভাব জানেন। তিনি আর কোন কথা কহিলেন না।

গদাধরকে যখন মহাপ্রভুর প্রেরিত তিন জন বিশিষ্ট ভক্ত প্রহরীতে তাঁহার বাসায় ধরিয়া আনিলেন, তিনি তাঁহার চরণে দীঘল হইয়া পড়িয়া অঝোর নয়নে কেবল ঝুরিতে লাগিলেন। রঙ্গিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে শ্রীহস্তে ধরিয়া উঠাইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ বকে ধরিয়া হৃদয় জুড়াইলেন, পরে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন-পাশমুক্ত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে মধুর বচনে কহিলেন—

"আমি চালাইল তোমা তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা।" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ মহাপ্রভু কহিলেন "আমি তোমাকে রাগাইলাম তুমি রাগিলে না,—আমি ক্রোধ করিয়া তোমাকে গালি দিলাম,—তুমি তাহা সহ্য করিলে। আমার পরীক্ষায় তুমি অটল রহিলে,—এই গুণে আমাকে তুমি কিনিয়া রাখিলে"। গদাধর মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন, ভক্তবৃন্দ গৌর-গদাধরমিলনরঙ্গ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। সেদিন মহাপ্রভুর বাসায় সর্ব্বভক্তগণ বল্লভ ভট্টের নিমন্ত্রণমহোৎসবে প্রেমানন্দে যোগদান করিয়া তাঁহাকে সুখী করিলেন।

ইহার পর একদিন গদাধরপণ্ডিত মহাপ্রভুকে গণসহ নিজ কুটীরে নিমন্ত্রণ করিলেন। বল্লভ ভট্টও তাঁহার মধ্যে আছেন, কারণ তিনি এক্ষণে প্রভুর গণমধ্যে গণ্য হইয়াছেন। এইস্থানে মহাপ্রভু গদাধরকে আদেশ দিলেন বল্লভ ভট্টকে তাঁহার পূর্ব্বপ্রার্থিত মধুর ভজনতত্ত্ব শিক্ষাদান কর। তাঁহার আদেশ পাইয়া ভট্ট গদাধরপণ্ডিতের নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলভজনরীতি শিক্ষা করিলেন এবং যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তিনি কোটীর মধ্যে একজন হইলেন। (১)

মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি এইরূপে কৃপার অবধি দেখাইলেন। গদাধরপণ্ডিতের কৃপায় বল্লভভট্ট শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ভজনতত্ত্বজ্ঞ হইলেন। তিনি এখন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের গণের নিজজন হইলেন। তিনি অভিমান-পঙ্কে নিমজ্জিত ছিলেন, জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন, পরম দয়াল মহাপ্রভু শ্রীহস্তে তাহার মনের অভিমান-পঙ্ক বিধৌত করিলেন, কৌশলে তাঁহার জ্ঞানগর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। এই লীলারঙ্গে শিক্ষাগুরু শ্রীগৌরভগবান লোকশিক্ষা দিলেন। তিনি বাহ্যে বল্লভ ভট্টের প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভাব দেখাইলেন মাত্র, অন্তরে অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"বাহ্য অর্থ যেই লয় সেই যায় নাশ"।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলারহস্য অতিশয় নিগূঢ়, তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। মহাজনগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এইসকল রসময়-লীলারঙ্গ অনুধ্যান, স্মরণ, মনন ও অনুশীলন করিলে হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমরসতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া, মনের মলিনতা সর্ব্বতোভাবে বিধৌত করিয়া দেয়। অতএব হে কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! গৌরাঙ্গ-লীলা পাঠ করুন, গৌরলীলা অনুধ্যান করুন, অনুশীলন করুন, চিত্তশুদ্ধি হইবে, মনের মলিনতা দূরীভূত হইবে। এইজন্য একদিন মনের আবেগে লিখিয়াছিলাম—

গাওরে মন, গৌরাঙ্গগুণ, গৌরনাম কর সার।
জনে জনে ধরি, জাতি না বিচারি, নাম কর পরচার॥

---

(১) তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঁই পূর্ব্ব প্রার্থিত সব সিদ্ধি কৈলা॥ চৈঃ চঃ

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

—:০:—

নীলাচলে নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সহিত মহাপ্রভুর ইষ্টগোষ্ঠী এবং ভোজনানন্দ।

—:০:—

শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল॥ চৈ: চ:

পূর্ব্বে বলিয়াছি নদীয়ার ভক্তবৃন্দ রথযাত্রা উপলক্ষে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়া নীলাচলে অদ্যাবধি অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য করিয়া তবে নদীয়ায় ফিরিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ও আছেন। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপিও তিনি আসিয়াছেন। অনুরাগী ভক্ত বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে পারেন না। মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্যই তাঁহার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন, ইহাতে অনুরাগী ভক্তগণ আপনাকে দোষী মনে করেন না। ইহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে রাসস্থলী হইতে গৃহে যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজযুবতীবৃন্দ কৃষ্ণসঙ্গ ত্যাগ করিয়া গৃহে গেলেন না, এবং শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা অনায়াসে অবহেলা করিয়া রাসস্থলীতে রহিলেন। শাস্ত্র বলেন—

আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যত পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে কোটি গুণ সুখপোষ॥ চৈ: চ:

রাগানুগীয় ভজন পন্থাই এইরূপ। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আজ্ঞা অক্লেশে অবহেলা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিয়াছেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ অনেকেই সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী, শ্রীবাসগৃহিণী মালিনীদেবী, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যগৃহিণী সর্ব্বজয়া দেবী, শ্রীশিবানন্দ-গৃহিণী শ্রীমুরারীগৃহিণী প্রভৃতি অনেক নারায়ণীশক্তি বৈষ্ণবগৃহিণী স্বামী সমভিব্যাহারে নীলাচলে মহাপ্রভু দর্শনে আসিয়াছেন। বাসুদেব দত্ত, বাসুদেব ঘোষ, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শ্রীমান সেন, শ্রীমানপণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত, মুরারি পণ্ডিত, গরুড়পণ্ডিত, ভগবানপণ্ডিত, বক্রেশ্বর খান, সঞ্জয়, পুরুষোত্তমপণ্ডিত, শুক্লাম্বর এবং নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি নদীয়ার সকল ভক্তবৃন্দই নীলাচলে আসিয়াছেন। কুলীনগ্রাম-বাসীভক্তগণ ও খণ্ডবাসী নরহরিসরকার সগোষ্ঠী আসিয়াছেন। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত রাঘবপণ্ডিত তাঁহার ভক্তিমতী ভগিনী দময়ন্তীর সহিত মহাপ্রভুর জন্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যে ঝালি সাজাইয়া আনিয়াছেন। এই মহাপুরুষের নিবাস পানিহাটী গ্রামে। মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে নবদ্বীপে শুভাগমন করেন, তখন তিনি রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একদিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই রাঘবপণ্ডিতের গৃহেই গদাধর দাস, পুরন্দরপণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস এবং রাঘবের শিষ্য মকরধ্বজ করের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঘবের গৃহে তিন মাস কাল বাস করিয়া সগোষ্ঠী তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিলেন। রাঘবপণ্ডিতের বিধবা ভগিনী পরমা ভক্তিমতী দময়ন্তী দেবীর গৌরাঙ্গপ্রীতি অতুলনীয়। তিনি স্বহস্তে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া একটি ঝালি ভরিয়া মাথায় করিয়া প্রতি বৎসর মহাপ্রভুর জন্য নীলাচলে লইয়া যাইতেন। বারমাস ধরিয়া মহাপ্রভু তাহা ভোজন করিতেন। এই রাঘবের ঝালির নাম না জানেন এখন এমন গৌরভক্ত নাই (১)। এবৎসর রাঘবের আদেশে দময়ন্তী দেবী দ্বিগুণ ভোজ্য দ্রব্যাদি পরম যত্নে প্রস্তুত করিয়া অতি পরিপাটীর সহিত ঝালি সাজাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। তিনজন বাহকে এই ঝালি পালা-

(১) রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর মুখ্যশাখা এক মকরধ্বজ কর॥
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী এক ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লৈয়া যায় গোপন করিয়া॥
বার মাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধ যাহার॥ চৈ: চ:

পালি করিয়া বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। মকরধ্বজ করের উপর এই ঝালির তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ ভার ছিল। তিনি নিজ প্রাণ অপেক্ষাও এই ঝালিটিকে প্রিয়তম বস্তু মনে করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত পাণিহাটী হইতে ইহা নীলাচলে লইয়া আসিয়াছেন (১)

এক্ষণে এই ঝালির মধ্যে মহাপ্রভুর নিমিত্ত কি কি খাদ্যবস্তু আনীত হইয়াছে, তাহার বিবরণ কবিরাজ গোস্বামীর কথায় শুনুন,—

নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করেন উপভোগ॥
আম-কাসুন্দি, আদা কাসুন্দি, ঝাল কাসুন্দি আর।
নেম্ব আদা, আমকলি বিবিধ প্রকার॥
আমসি আমখণ্ড, তিলাম, আমলা।
যত্ন করি কৈলা গুণ্ডা পুরাণ সুকুতা॥
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
সুক্তায় যে প্রীতি প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
সুক্তাপাতা কাসুন্দিতে মহা সুখ হয়॥
মনুষ্য বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু ভোজনে উদরে প্রভুর আম হঞা যায়॥
সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥
ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া॥
শুণ্ঠীখণ্ড লাড়ুয়া আম পিত্ত হর।
পৃথক পৃথক বান্ধিয়াছে কুথলী ভিতর॥
কোলি শুণ্ঠী, কোলি চূর্ণ (২) কোলি খণ্ড আর।
কত নাম লব যত প্রকার আচার॥
নারিকেল খণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার॥
শালিকাচটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় বড় কুথলী ভরি॥
কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে লাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস॥
শালি ধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটি কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈলা।
কহিতে না জানি নাম এজন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর অনুরাগিনী ভক্তা দময়ন্তী দেবী তাঁহার ভ্রাতার আজ্ঞায় এই সকল অতি উত্তম ভক্ষ্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া তাঁহার সহিত নীলাচলে আসিয়াছেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর মর্ম্মী ভক্ত ও বিশ্বাসী ভৃত্য এবং ভাণ্ডারী। এই সকল সযত্নে আনীত ভক্ষ্য দ্রব্যাদি তাঁহার নিকট রাখিয়া ভক্তবৃন্দ নিশ্চিন্ত আছেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুকে সময় ও সুযোগ মত নদীয়ার ভক্তদত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যাদি ভোজন করান। ভক্তগণ গোবিন্দের নিকট সমাচার পান, ভক্তবৎসল মহাপ্রভু কোন দিন কাহার কোন্ দ্রব্য স্বীকার করিলেন। রাঘবের ঝালি ছাড়া মহাপ্রভুর ভাণ্ডারে অন্যান্য ভক্তদত্ত বহু বহু ভক্ষ্যদ্রব্য থরে থরে সাজান রহিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা হয়ত কিছু কিছু স্বীকার করেন, না হইলে গোবিন্দকে বলেন 'আজ রাখ, রাখ'। গোবিন্দ মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করেন, অমুক, ভক্ত ইহা দিয়াছেন —অমুক ভক্ত ইহা আনিয়াছেন,—তাঁহাকে ভক্তের নাম করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ উপরোধ করেন, কিন্তু তিনি কেবল বলেন "রাখ, রাখ",—ভোজন করেন না। এইরূপে তাঁহার ভাণ্ডার ঘরটি পরিপূর্ণ হইয়া

ঝালি উপর মুন্সব মকরধ্বজ কর।
প্রাণ রূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর॥ চৈঃ চঃ

(২) কুলচূর্ণ, কুল ও চিনি মিশ্রিত খাদ্য দ্রব্যকে কোলি খণ্ড বলে

গেল,—শত লোকের আহারের উপযুক্ত দ্রব্যসম্ভার একত্রীভূত হইল। (১) সকলেই গোবিন্দকে পরম আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করেন "গোবিন্দ! মহাপ্রভু কি আমার দত্ত সামান্য যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যাদি ভোজন করিয়াছেন?" সকলেরই ইচ্ছা গোবিন্দের মুখে মহাপ্রভুর ভোজনলীলাবার্ত্তা শুনিয়া চিত্ত স্থির করেন। গোবিন্দ কি করিবেন,—কি উত্তর দিবেন? স্থির করিতে পারেন না। সত্যকথা বলিলে ভক্তগণ মনে দুঃখ পাইবেন, এই জন্য তাঁহাকে কখন কখন মিথ্যাকথা বলিয়াও এই সকল অনুরাগী ভক্তবৃন্দকে সুখী করিতে হয়। মহাপ্রভুর জন্য তাঁহারা সুদূর গৌড়দেশ হইতে মাথায় বহিয়া এই সকল ভক্ষ্য দ্রব্যাদি আনিয়াছেন, মহাপ্রভু গ্রহণ করিলে তাঁহারা কৃতার্থ হন, কিন্তু তিনি তাহা এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার গৃহকোণে স্তূপাকৃত সকল ভক্ষ্য দ্রব্যই পড়িয়া রহিয়াছে। গোবিন্দের ইহাতে বড় দুঃখ,—ততোধিক দুঃখ ভক্তবৃন্দের। গোবিন্দ এক দিন মহাপ্রভুর চরণে কাতরভাবে করযোড়ে নিবেদন করিলেন—

"আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে।
তুমি সে না খাও তাঁরা পুছেন বার বার।
বঞ্চনা করিব কত কেমতে আমার নিস্তার॥" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ "হে প্রভু! শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহাশয়গণ অতিশয় যত্ন করিয়া তোমাকে খাওয়াইবার জন্য আমার নিকট এই সকল পরম উপাদেয় খাদ্য বস্তু দিয়া যান,—তুমি ইহার কিছুই গ্রহণ কর না,—তাঁহারা আমাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি খাইয়াছ কি না, আমি কতবার আর মিথ্যাকথা বলিব, এবং বঞ্চনা করিব, কিসে আমার নিস্তার হবে?" এই বলিয়া দুঃখিতান্তকরণে সজলনয়নে করযোড়ে মহাপ্রভুর সম্মুখে গোবিন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া গোবিন্দকে কহিলেন—

(১) ধরিতে না ধরে ঘরের ভরিল এক কোন।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥ চৈঃ চঃ

—"আদি বস্যা! (১) দুঃখ কাহে মনে।
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে॥" চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র প্রেমানন্দে ভোজনে বসিয়া গেলেন। গোবিন্দের মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি প্রত্যেক ভক্তের নাম ধরিয়া তাঁহার দত্ত বা আনীত ভক্ষ্য দ্রব্যাদি একে একে মহাপ্রভুকে নিবেদন করিতে লাগিলেন, আর শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র সেই সকল অবলীলাক্রমে পরম প্রীতিসহকারে আস্বাদন করিতে লাগিলেন। শুধু আস্বাদন নহে, সমস্ত দ্রব্যাদি একেবারে শ্রীউদরসাৎ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের নিবেদন বাক্য-

(১) কৃপাময় পাঠকবৃন্দ এখানে প্রশ্ন করিতে পারেন মহাপ্রভু, গোবিন্দকে "আদিবস্যা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? আদি-বস্যা শব্দের অর্থ কি বোধ হয় অনেকে জানেন না। ইহা বাঙ্গালা শব্দ নহে। ইহা দ্রাবিড় ভাষায় সম্বোধনসূচক শব্দ। গোবিন্দ দ্রাবিড় ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, এই জন্য রঙ্গিয়া প্রভু তাঁহাকে এই ভাষায় সম্বোধন করিয়া সুখী হইতেন। আদি-বৈশ্যা শব্দের অর্থ "অতি প্রিয়"। এই দ্রাবিড় শব্দের প্রয়োগ তুলসীদাসের রামায়ণে দেখিতে পাই, যথা—শ্রীলক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রসঙ্গে—

নিজ জননী কো এক কুমারা;
আদি বস্যা, জীবন হামারা।

শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করিয়া সুগ্রীবকে কহিতেছেন "হে মিত্র! এই লক্ষ্মণ তাঁহার স্নেহময়ী মাতার অন্যতম পুত্র। আমার অতিপ্রিয়, এবং জীবনস্বরূপ, ইহার বিয়োগ আমার পক্ষে অসহ্য।

এই শব্দটি মহাপ্রভু গোবিন্দের প্রতি ব্যবহার করিতেন। তাহার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভু আর একদিন গোবিন্দকে বলিয়াছিলেন—

"আদিবস্যা। এতক্ষণ আছিস বসিয়া" চৈঃ চঃ
"আদিবস্যা! এই শ্লোকে না কর বর্জ্জন"

একথা সকল কখন বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠকবৃন্দ ইহার পরেই জানিতে পারিবেন। এই শব্দটীর ব্যাখার প্রয়োজন বিধায় এত কথা বলিতে হইল। ইহা গোবিন্দের প্রতি প্রভুর প্রীতিবাক্য। তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে কখন ক্রোধভরে কখন প্রীতি করিয়া "নাড়া" বলিতেন। বারেন্দ্র সমাজে সিদ্ধ শ্রোত্রীয় নৃসিংহ মিশ্র বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি কুলীন প্রধান মধু মৈত্রেকে কন্যাদান করিয়া বারেন্দ্রকুলে "কাপর" সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লাড়ুলি গ্রামবাসী বলিয়া নৃসিংহের বংশধরকে "লাড়িয়াল" বা "নাড়িয়াল" বলা হয়। এইজন্য মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে "নাড়া" বলিতেন।

গুলি বড়ই মধুর। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ তাহা শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করুন। গোবিন্দ বলিতেছেন,—

"আচার্য্যের এই পৈড় পানা সর পূপী।
এই অমৃত গুটিকা মণ্ডা, এই কপূর কূপী॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠা পানা অমৃত মণ্ডা পদ্মচিনি আর॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্যনিধির এই অনেক প্রকার॥
বাসুদেব দত্তের, মুরারি গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার॥
শ্রীমান সেনের এই বিবিধ উপহার।
মুরারি পণ্ডিতের এই বিবিধ প্রকার॥
শ্রীমান পণ্ডিত, আর আচার্য্য নন্দন।
তাঁ সবার দত্ত এই করহ ভোজন॥
কুলীন গ্রামীর এই সব দেখ আগে।
খণ্ডবাসীর তত এই দেখ অগ্রভাগে॥
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভু আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥ চৈঃ চঃ

এইরূপ নদীয়ার অবতার শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র এক দণ্ডের মধ্যে শত জনের ভক্ষ্য দ্রব্যাদি সকল নিঃশেষ করিয়া ভোজন-লীলা সাঙ্গ করিলেন এবং গোবিন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "আর কিছু আছে?"

শত জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
"আর কিছু আছে," বলি গোবিন্দে পুছিল॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর এই ভোজনলীলা অলৌকিক এবং পরম রহস্যপূর্ণ। তিনি সন্ন্যাসী, কোনরূপে জীবন ধারণ করেন। জগদানন্দ প্রভৃতি তাঁহার মর্ম্মী ভক্তগণও কিছুতেই তাঁহাকে উত্তম বস্তু খাওয়াইতে পারেন না,—তিনি সন্ন্যাসী, ভোগসুখে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। কিন্তু এ আবার কি লীলারঙ্গ? ইহা ত ত্যাগী সন্ন্যাসীর কাজ নয়। মহাপ্রভু আহার বিহার বিষয়ে জগদানন্দ প্রভৃতি মর্ম্মী ভক্তের কথা শুনেন না, কিন্তু নদীয়ার ভক্তবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি এ কি অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ করিলেন? গৃহী বৈষ্ণবদিগের প্রতি তিনি যেরূপ কৃপাবৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, এরূপ কৃপা তাঁহার উদাসীন ভক্তদিগের প্রতি দেখান নাই। জগদানন্দ উদাসীন ভক্ত, তিনি বৈষ্ণবসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে প্রভুর যেরূপ সম্প্রীতি, তাহাতে তিনি তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সকল কার্য্যই করিতে পারেন—কিন্তু তিনি তাহা করেন না, এই জন্য দুই জনে প্রায়ই প্রেমকোন্দল হয়। কেন তিনি জগদানন্দের কথামত স্বচ্ছন্দ আহার বিহার করেন না? ভক্তকে সুখদানই তাঁহার ব্রত,—জগদানন্দ তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত। তিনি কি অপরাধে এরূপ দণ্ডিত? ইহার মর্ম্ম আছে। জগদানন্দ উদাসীন, মহাপ্রভুও উদাসীন, প্রভুর সঙ্গেসঙ্গেই তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি গৃহী নহেন। মহাপ্রভুর প্রতি কার্য্যই,—প্রতি পদক্ষেপই ধর্ম্ম শিক্ষামূলক। তিনি শিক্ষাগুরু রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগদানন্দকে বৈরাগ্যশিক্ষা দিবার জন্যই মহাপ্রভু তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ করিতেন না। তিনি স্বয়ং আচরিয়া ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং কঠোর বৈরাগ্য আচরণ করিয়া জগদানন্দকে শিক্ষা দিলেন, বৈরাগীর বৈরাগ্যই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম,—বৈরাগ্য বিহীন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর শিক্ষণীয়।

নবদ্বীপের গৃহী বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর পরম প্রিয় ভক্ত। তিনি যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন তাঁহারা গৃহস্থ ধর্ম্ম-সম্মত নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন, শাক প্রভৃতি দ্বারা ঠাকুরের ভোগ দিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরম পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইতেন। মহাপ্রভু তখন স্বয়ং গৃহী ছিলেন,—এক্ষণে উদাসীন হইয়াছেন। তিনি উদাসীন হইয়া উদাসীনকে যেরূপে শিক্ষা দিতেছেন, সে শিক্ষা গৃহীর পক্ষে উপযোগী নহে। তিনি তাঁহার গৃহস্থ ভক্তদত্ত প্রীতি-উপহার সকল পরম প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া দেখাইলেন গৃহস্থধর্ম্ম উদাসীন-ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন, গৃহী বৈষ্ণবের ভজনপন্থাও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর ভজনপন্থা হইতে বিভিন্ন। গৃহী বৈষ্ণবের ঠাকুরসেবা, ঠাকুর ভোগ তাঁহাদিগের নারায়ণীশক্তি বৈষ্ণবগৃহিণীদিগের সহস্ত পাক উত্তম বস্তু

দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে, সেই সকল বস্তু প্রীতিপূর্ব্বক অতিশয় যত্ন করিয়া বহু দূরদেশ হইতে তাঁহারা মহাপ্রভুর ভোগের জন্য নীলাচলে আনিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের বিশেষ আগ্রহে তিনি তাহা গ্রহণ করেন। ভক্তের ভগবান তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের পরম তুষ্ট করিলেন। শিক্ষা-গুরু মহাপ্রভুর এই শিক্ষায় নদীয়ার ভক্তবৃন্দ গৃহস্থধর্ম্মে এবং ঠাকুর-সেবায় অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীবিগ্রহসেবা ও অতিথিসেবা গৃহীবৈষ্ণবগণ উত্তম করিয়া করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর এই ভোজন-লীলারঙ্গের তাৎপর্য্য বলিয়া বোধ হয়।

মহাপ্রভু ভোজনলীলা শেষ করিয়া যখন গোবিন্দকে কহিলেন "আর কিছু আছে?" গোবিন্দ মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন "রাঘবের ঝালি মাত্র আছে?" প্রভুও হাসিয়া উত্তর করিলেন "আজি রহুক তাহা দেখিব পাছে।" অর্থাৎ আজি তাহা থাকুক, পরে তাহা ভোজন করিব। গোবিন্দ আর কথা কহিলেন না। মহাপ্রভু আচমন করিয়া সেদিন শয়ন করিলেন।

পরদিন গোবিন্দ নদীয়ার সকল ভক্তবৃন্দকে প্রভুর এই অপূর্ব্ব ভোজনলীলার কথা বলিলেন। তাঁহারা শুনিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। ইহার দুই চারিদিন পরে একদিন মহাপ্রভু রাঘবের ঝালির দ্রব্যাদি আস্বাদন করিলেন। স্বরূপগোসাঞি পরিবেষ্টা। তিনি বাছিয়া বাছিয়া রাত্রিতে মহাপ্রভুকে কিছু কিছু দ্রব্য ভোগ দিতেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে প্রেমানন্দে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এদিকে চাতুর্ম্মাস্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের ইচ্ছা হইল মহাপ্রভুকে তাঁহারা এক একদিন করিয়া নিজ বাসাতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করান। বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের বড় সাধ তাঁহারা পূর্ব্বের মত স্বহস্তে পাক করিয়া মহাপ্রভুকে ভোজন করান। ভক্তবৎসল প্রভুর নিকট তাঁহাদের এই নিবেদন পৌছিল। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের নিমন্ত্রণ-পত্রী অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি মহাপ্রভুর রুচি-অনুরূপ বহুবিধ ব্যঞ্জন, শাক সুপ, প্রভৃতি রন্ধন করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

> ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন।
> শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল।
> নিম্ব বার্ত্তাকু আর ভৃষ্ট পটোল।
> ভৃষ্ট ফুলবড়ি আর মুদ্গদালি সুপ।
> নানা ব্যঞ্জন রাঁধে প্রভুর রুচি-অনুরূপ॥
> মরিচের ঝাল অম্ল মধুরাম্ল আর।
> আদা লবণ লেবু দুগ্ধ দধি খণ্ডসার॥

ইহার উপর আবার উত্তম উত্তম জগন্নাথের প্রসাদ আছে। মহাপ্রভু প্রায়ই একাকী এসকল স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান। স্থান বুঝিয়া কোন কোন স্থানে তাঁহার উদাসীন ভক্তগণকেও সঙ্গে লইয়া যান। শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া মহাপ্রভুকে পরম পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইলেন। মহাপ্রভু সেখানে সেদিন একাকী গিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীবাসগৃহিণী মালিনী দেবী, চন্দ্রশেখর আচার্য্যগৃহিণী সর্ব্বজয়াদেবী, বিদ্যানিধির গৃহিণী, নন্দনাচার্য্যের গৃহিণী, রাঘবপণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তী দেবী সকলেই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রভুকে পরমানন্দে ভোজন করাইয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ পত্নী। আর বাসুদেব দত্ত, বাসুদেব ঘোষ, গদাধর দাস, মুরারিগুপ্ত, শিবানন্দ সেন কুলীন গ্রামবাসী এবং খণ্ডবাসী ভক্তগণ জগন্নাথদেবের প্রসাদ আনিয়া মহাপ্রভুকে নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। শিবানন্দ-সেনের প্রতি মহাপ্রভুর বড় কৃপা। তাঁহার বাসায় নিমন্ত্রণে প্রভুর অপূর্ব্ব ভোজনলীলারঙ্গ শ্রবণ করুন। শিবানন্দসেনও সপরিবারে নীলাচলে আসিয়াছেন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্য-দাস আসিয়াছেন। মহাপ্রভুর সহিত চৈতন্যদাসের পরিচয় করাইয়া দিবেন, এইজন্যই শিবানন্দ তাহাকে এত দূরদেশে আনিয়াছেন। মহাপ্রভুর চরণে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া চৈতন্যদাস যখন দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, শিবানন্দ স্বয়ং পুত্রের পরিচয় দিলেন। মহাপ্রভু প্রথমেই তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

চৈতন্যদাস নাম শুনিয়া রঙ্গিয়া প্রভু ভঙ্গী করিয়া বালককে কহিলেন—

"কিবা নাম ধরিয়াছ, বুঝন না যায়" চৈঃ চঃ

শিবানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন "যে এই নামের মর্ম্ম বুঝিয়াছে, সেই ইহা ধারণ করিয়াছে" (১)। মহাপ্রভু আর কোন কথা কহিলেন না।

শিবানন্দ স্বগণ সহিতে প্রভুকে জগন্নাথের নানাপ্রকার বহুমূল্য প্রসাদ আনাইয়া পরম পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইলেন। তাঁহার ও তাঁহার ভক্তিমতী গৃহিণীর প্রীত্যর্থে ভক্তবৎসল মহাপ্রভু সেদিন সকলি ভোজন করিলেন। সেদিন তাঁহার অতি গুরুভোজন হইল, কারণ বহুবিধ মিষ্টান্ন ভোগও ছিল। ইহাতে মহাপ্রভুর মন তত প্রসন্ন বোধ হইল না—

শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।

অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন।। চৈঃ চঃ

ইহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। কিরূপেই বা বুঝিবেন? ইহা মহাপ্রভুর মনের ভাব। তিনি মিষ্টান্নভোগে তত পরিতুষ্ট নহেন,—অন্নব্যঞ্জন শাকে তাঁহার অতিশয় প্রীতি। ভোজনান্তে মহাপ্রভু নিজ বাসায় গেলেন। ইহার পর আর একদিন শিবানন্দের বালকপুত্র চৈতন্য দাস মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি মহাপ্রভুর মনের মত প্রসাদ স্বয়ং ক্রয় করিয়া আনিলেন; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

আর একদিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।

প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন।।

দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়ি লবন।

সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।।

মহাপ্রভু শিবানন্দের বাসায় সে দিনও একাকী আসিলেন। সেদিন প্রসাদের বন্দোবস্ত দেখিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইল। তিনি প্রসন্নচিত্তে শিবানন্দের প্রতি চাহিয়া প্রেমানন্দে কহিলেন—

———"এ বালক মোর মন জানে।

সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে।।" চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া দয়াময় মহাপ্রভু ভোজনে বসিলেন। দধি-ভাত এবং জগন্নাথের প্রসাদী ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া চৈতন্যদাসকে কৃপা করিয়া তাঁহার অধরামৃত দান করিলেন।

এত বলি দধিভাত করিল ভোজন।

চৈতন্যদাসেরে দিলা উচ্ছিষ্ট ভোজন।। চৈঃ চঃ

চৈতন্য-দাসের ভাগ্যের পরিসীমা নাই! ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার অধরামৃতের জন্য লালায়িত, আজ তাহা অনায়াসে শিবানন্দ-পুত্র চৈতন্যদাস পাইল! চৈতন্যদাসই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর প্রকৃত দাস। শিবানন্দ সেনের প্রতি তাঁহার অতিশয় কৃপা, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি কবিকর্ণপুর গোস্বামীর পিতা এবং মহাপ্রভুর একান্ত মর্ম্মীভক্ত। নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে সর্ব্বভাবে সমাধান করিয়া প্রতি বৎসরে নীলাচলে আনয়ন করার সম্পূর্ণ ভার একমাত্র তাঁহারই উপর। ভক্তসেবা কৃষ্ণসেবা হইতেও বড়, এইজন্য মহাপ্রভুর তাঁহার উপর এত প্রীতি। শিবানন্দ সেন যখন সকল ভক্তবৃন্দের সহিত প্রথম নীলাচলে আসিলেন,—এবং মহাপ্রভুর সহিত মিলিলেন, ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান গোবিন্দকে কিরূপ কৃপাদেশ দিলেন শুনুন :—

শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবত হেথায়।

মোর অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায়।। চৈঃ চঃ

এত কৃপা তিনি অন্য কোন ভক্তকে দেখান নাই। গৃহী বৈষ্ণবের প্রতি মহাপ্রভু অসীম দয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব হে গৃহী বৈষ্ণব পাঠকবৃন্দ! আপনাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। আপনারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের রক্ষক,—যুক্ত বৈরাগ্যের আপনারাই আদর্শ। দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালে মহাপ্রভু গৃহত্যাগোন্মুখ বিপ্র কূর্ম্মকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সকলে মনে রাখিবেন—

প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।

গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর নিবা।।

যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।

আমার আজ্ঞায় গুরু হয়ে তার এই দেশ।।

কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।

পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ। চৈঃ চৈঃ

(১) সেন কহে যে জানিল সেই সে ধরিল। চৈঃ চঃ

শ্রীগৌরলীলা-মধুপান আপনারা গৃহে বসিয়া করুন, আর তাহা অপরকে অকাতরে দান করুন,—ইহাই হইল প্রকৃত পরোপকার—অর্থাৎ পরম উপকার। আপনারা কৃপা করিয়া এই লীলাগ্রন্থ পাঠ করিবেন, এবং পাঠ করিয়া অপরকে শুনাইবেন, ইহাই হইল কীর্ত্তন। আপনাদের কুলের ঠাকুর গুণনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের ঋণ কথঞ্চিৎভাবে পরিশোধ করিতে হইলে, ইহাই কর্ত্তব্য। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়া গিয়াছেন—

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুইয়া করোঁ মুঞি পানে॥

ইহা অপেক্ষা অপূর্ব্ব দীনতা-প্রকাশক প্রাণের মর্ম্মকথা ভাষাতে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু ইহা পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর অকপট সরল মনের অতিশয় সরল কথা। গৌরভক্তবৃন্দ যে অকপট দীনতায় জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার জলন্ত প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামীর এই একটী কথা। আধুনিক বিদ্বৎসমাজ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিগ্রন্থের গ্রন্থকারের দৈন্যও তদ্রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমহাপ্রভু বল্লভভট্টকে কহিয়াছিলেন—

———"তুমি পণ্ডিত,—মহা ভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত।" চৈঃ চঃ

কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পরম পণ্ডিত এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর পরম ভক্ত। কাজেই গর্ব্বরূপ পর্ব্বত তাঁহার হৃদয়ে উদ্গম হইতে পারে নাই, অভিমান-শিলা তাঁহার মানসক্ষেত্রে স্থান পাইতে পারে নাই।

মহাপ্রভু নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দের বাসায় বাসায় নিত্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। এক্ষণে ভক্তের ভগবান ভক্তচিত্তবিনোদনার্থ প্রসাদভোজনানন্দ লীলামগ্ন। ভক্তবৃন্দও পরমানন্দে প্রসাদ পাইতেছেন। এইভাবে নীলাচলে চারি মাসকাল কাটিয়া গেল। তবুও সকল ভক্তের বাসায় শ্রীমন্মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চারিশত নদীয়ার ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিয়াছেন। এক এক জনের বাসায় যদি এক দিনও প্রভু ভিক্ষা করেন,—তাহা হইলে এক বৎসরেরও অধিক সময় লাগে। সুতরাং সকলের অদৃষ্টে মহাপ্রভুকে ভিক্ষাদান-সৌভাগ্য উদয় হইল না। কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

চারি মাস এইরূপ নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায়॥ চৈঃ চঃ

ইহার মধ্যে আবার মহাপ্রভুর বাধাবাধি বিধি নিয়ম আছে যে, মাসের মধ্যে এই দিনে বা এই তিথিতে গদাধর পণ্ডিত বা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাসায় ভিক্ষা করিবেন। সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে স্বয়ং মহাপ্রভুরও ক্ষমতা নাই। ইহার উপর নীলাচলের অন্যান্য ভক্তবৃন্দও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। ইহাদিগের মধ্যে গোপীনাথ আচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, ভগবান আচার্য্য, শঙ্কর ও বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রধান। সুতরাং নদীয়ার সকল ভক্তবৃন্দের মনবাঞ্ছা কি করিয়া মহাপ্রভু পূর্ণ করিবেন?

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর আদেশে প্রতিবৎসর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের যে সুখ হয়, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের ততোধিক সুখ ও আনন্দ হয়। আনন্দময় মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে নীলাচলে প্রতিবৎসর এইরূপ ভোজনলীলারঙ্গ করেন। ইহা দেখিয়া নীলাচলবাসী ও নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দের মনে বড় আনন্দ হয়। বিশেষতঃ জগদানন্দ প্রভৃতি অনুরাগী উদাসীন ভক্তবৃন্দের মনে ইহাতে আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না,—কারণ নদীয়ার ভক্তবৃন্দের নিকট মহাপ্রভুর কঠোর নিয়ম ও বৈরাগ্যভাব চলে না।

রামচন্দ্রপুরী গোসাঞির মত বৈষ্ণবের বিচারে অবশ্য ন্যাসীচূড়ামণি মহাপ্রভুর এই ভোজন-বিলাস দোষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি মহাপ্রভুকে এইজন্য কঠোর কথা

বলিয়া তাহার ভিক্ষা সঙ্কোচ করিয়াছিলেন সেই সকল লীলাকথা পরে বর্ণিত হইবে।

বৈষ্ণবের সকল কর্ম্মই কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবের ভোজনেও ভজনাঙ্গ লক্ষিত হয়। তাঁহারা শ্রীভগবানের অধরামৃতপ্রসাদ ভোজন করেন,—বণ্টন করেন, এবং প্রেমভরে সেই অপ্রাকৃত বস্তু সর্ব্বাঙ্গে লেপনও করেন। ভোজনাগ্রে এবং ভোজনান্তেও শ্রীনামকীর্ত্তন করেন। মধ্যে মধ্যে প্রেমধ্বনি দিয়া রসপুষ্টি করেন। মহাপ্রভুর এই যে ভোজনলীলারঙ্গ, ইহা তাঁহার ভক্তবৃন্দের অনুধ্যানের বস্তু। ঠাকুর নরোত্তমকৃত মহাপ্রভুর ভোজনলীলারঙ্গপদ তাঁহার ভোগআরতির সময় ভক্তগণকর্ত্তৃক শ্রীমন্দিরে নিত্য গীত হয়; যথা—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কর অবধান।
ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান॥
বামেতে অদ্বৈতপ্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোসাঞি॥
চৌষট্টি মোহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ।
শাক শুকুতা আদি নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা আর লুচী পুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া বিহারী॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈলা আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈলা দন্তের শোধন॥
বসিতে আসন দিলা রত্ন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বুল তার যোগায় প্রিয় ভক্তগণে।
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেওয়ারি।
ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মসারি॥
ফুলের মন্দিরে প্রভু করিলা শয়ন।
গোবিন্দদাস করেন পাদ সম্বাহন॥
ফুলের পাপড়ী সব উড়ি পড়ি গায়।
তার মাঝে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥

মহাপ্রভুর বৈরাগ্য জীবশিক্ষার জন্য কপট-বৈরাগ্য, এবং তাঁহার সন্ন্যাস জীবোদ্ধারকল্পে কপট সন্ন্যাস। তিনি একথা স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন। ভক্তের ভগবান রসরাজ শ্রীগৌরগোবিন্দ নদীয়া-নাগররূপে চিরদিন রসিকভক্তের নিকট রসিকশেখররূপেই প্রতীয়মান হন। তাঁহার মস্তকও মুণ্ডিত নহে,—তিনি কঠোরতাও করেন না। মহাজন কবি তাই গাহিয়াছেন,—

মধুকররঞ্জিত মালতীমণ্ডিত-জিতঘনকুঞ্চিতকেশং।
তিলকবিনিন্দিত-শশধররূপক যুবতী-মনোহরবেশং॥
সখি কলয় গৌরমুদারং।
নিন্দিত হাটক কান্তিকলেবর গর্ব্বিত মারকমারং॥ ধ্রু।
মধুমধুরস্মিত লোভিত তনুভৃতমনুপমভাববিলাসং।
নিধুবননাগরীমোহিতমানস বিকথিতগদগদ ভাষং॥
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চন নরগণ-করুণাবিতরণশীলং।
ক্ষোভিত দুর্ম্মতি রাধামোহন নাম নিরুপমলীলং॥

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ধ্যানেও দেখি; যথা—

শ্রীমন্মৌক্তিক দামবদ্ধচিকুরং সুস্মের চন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরু চারুচিত্রবসনং স্রক্‌দিব্যভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
গৌরাঙ্গং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে।

ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কপট সন্ন্যাসীভাবই সূচিত হইতেছে। শ্রীগৌরভগবান মাধুর্য্যরসময় রসিকশেখর আনন্দঘন শৃঙ্গাররসমূর্ত্তি,—বৈরাগ্য তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যের একটী ঐশ্বর্য্য মাত্র,—সন্ন্যাসী তিনি নামে,—সন্ন্যাস তাঁহার অনন্তলীলার একটি লীলা। তিনি যে কপট-সন্ন্যাসী তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ অন্যত্র লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

নীলাচলে রামচন্দ্রপুরী গোসাঞি ও মহাপ্রভু।

প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তেঁহ ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম॥ চৈঃ চঃ

রামচন্দ্রপুরী গোসাঞি নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞির শিষ্য এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোসাঞির গুরুভাই। মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুবুদ্ধিতে সম্মান করেন। পরমানন্দ পুরী গোসাঞির বাসায় তিনি থাকেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে যে দিন তাঁহার প্রথম মিলন হইল, তিনি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। পরমানন্দপুরী রামচন্দ্রপুরী এবং মহাপ্রভু এই তিনজনে বসিয়া অনেকক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী হইল। জগদানন্দপণ্ডিত সেদিন রামচন্দ্রপুরী গোসাঞিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। জগদানন্দ পূর্ব্বে তাঁহার কথা শুনিয়াছেন যে, তিনি বিশ্বনিন্দুক,—এই ভয়ে প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম প্রসাদ আনিলেন। অতিশয় যত্ন সহকারে রামচন্দ্রপুরী গোসাঞিকে তিনি আকণ্ঠ ভোজন করাইলেন। তবুও বহু পরিমাণে প্রসাদ রহিয়া গেল। রামচন্দ্রপুরী আচমন করিয়া আগ্রহ সহকারে সেই সকল প্রসাদ স্বয়ং পরিবেশন করিয়া জগদানন্দকে ভোজন করাইলেন। জগদানন্দও পরম পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে পুরী গোসাঞি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাবে জগদানন্দের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন—

শুনি চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন॥
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াই ধর্ম্ম কর্ম্ম নাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খাও, বৈরাগ্যে নাহি ভাস॥ চৈঃ চঃ

জগদানন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না, তিনি বুঝিলেন মানুষের স্বভাব কিছুতেই যায় না। রামচন্দ্রপুরী গোসাঞির নিন্দুক স্বভাব চিরবিখ্যাত এবং সর্ব্বজনবিদিত। এই রূপে দোষদর্শন এবং নিন্দুক স্বভাবের জন্য তিনি তাঁহার গুরু-কোপানলে পতিত হইয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী জগতগুরু,—তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের মূলমন্ত্র ছিলেন; আকাশে মেঘ দেখিলে তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি উদয় হইত। তিনি যে কৃষ্ণ-প্রেমের অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফলিত বৃক্ষ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু।

পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর॥ চৈঃ চঃ

তিনি যখন দেহত্যাগ করেন, তাঁহার শিষ্য এই রামচন্দ্রপুরী তাঁহার নিকট ছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি দিবারাত্রি কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনরসে মগ্ন থাকিতেন মধ্যে মধ্যে প্রেমাবেগে—

"মথুরা না পাইল" বলি করেন ক্রন্দন। চৈঃ চঃ

রামচন্দ্রপুরী তাঁহার পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের বিপ্রলম্ভ ভাবোত্থ এই কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ বাক্যের মর্ম্ম কি বুঝিবেন? তিনি শিষ্য হইয়া এই সময়ে গুরুকে প্রাকৃত অভাব জন্য শোক কাতর দেখিয়া উপদেশ দিতে গেলেন। তিনি গুরুদেবকে কহিলেন—

তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হৈয়া কেন করহ রোদন॥ চৈঃ চঃ

দেহত্যাগ কালে শিষ্যের মুখে এইরূপ শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শুনিয়া মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন এবং রামচন্দ্রপুরীকে পাপীষ্ঠ বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং ভৎর্সনা বাক্যে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—

কৃষ্ণ কৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইলা জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাইবি তুঞি যা যথি তথি।
তোরে দেখে মৈলে মোর হবে অসদ্গতি।
কৃষ্ণ না পাইনু মুঞি, মরোঁ আপন দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে।" চৈঃ চঃ

এই বলিয়া মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি তাঁহার শিষ্য রামচন্দ্রপুরীকে নিজ সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও সেখানে গুরুসেবায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি স্বহস্তে গুরুর মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম শুনাইতেন। মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী তাঁহার সমস্ত শক্তি এবং প্রেমধন তাঁহার প্রিয় শিষ্য ঈশ্বর পুরী গোসাঞিকে দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু গয়াক্ষেত্রে এই ঈশ্বরপুরীকে শ্রীগুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রপুরী গোসাঞি শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। গুরু কৃপায় বঞ্চিত হইয়া তাঁহার কৃষ্ণভক্তি লোপ হইয়াছিল সর্ব্ব লোকের দোষ দর্শন তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল (১)।

এই রামচন্দ্রপুরী গোসাঞিকে মহাপ্রভু গুরুবুদ্ধিতে সম্মান করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গ করিতেন। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর অশেষ গুণের কণামাত্র স্পর্শ করিতে না পারিয়া নিজ স্বভাবদোষে তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন (২)। কিন্তু ইহাতে তিনি সফল হইলেন না। তিনি মহাপ্রভুর সকল কার্য্যের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন—

> প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
> রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান।
> প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
> ছিদ্র চাহি বুলে কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের প্রসাদ মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করেন, অন্ন ব্যঞ্জন প্রসাদ পান, এই কথা রামচন্দ্রপুরী সকলকে বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন—

> "সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
> এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ॥" চৈঃ চঃ

(১) শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী নাহি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোক নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥ চৈঃ চঃ

(২) প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিঁহো ছিদ্র চাহি বুলে এই তার কাম॥ ঐ

তিনি নীলাচলে বসিয়া এইরূপে মহাপ্রভুর নিন্দাবাদ করিয়া বেড়ান, কিন্তু প্রতিদিন তাঁহাকে দর্শন করিতেও আসেন। এ সকল কথা মহাপ্রভুর কাণে যায়, তথাপি তিনি তাঁহাকে গুরুবুদ্ধিতে যথারীতি সম্মান ও আদর করেন। একদিন প্রাতঃকালে রামচন্দ্রপুরী গোসাঞি মহাপ্রভুর বাসায় আসিলেন। তিনি তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়া বসিতে আসন দিলেন। তিনি আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, গৃহমধ্যে কতকগুলি পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া ব্যঙ্গসূচক বাক্যে তিনি প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসীনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায়গতঃ॥

অর্থাৎ "গত রজনীতে এই গৃহে মিষ্টান্ন ছিল, সেই হেতু এত পিপীলিকা এই স্থানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এতাদৃশী জিহ্বার লালসা!" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সেস্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরী গোসাঞির কথা শুনিয়া অধোবদনে কীয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন। পূর্ব্বে তিনি লোকমুখে তাঁহার নিন্দা-স্বভাবের কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। মহাপ্রভুর ছিদ্রান্বেষণে বিফল মনোরথ হইয়া তিনি এক্ষণে তাঁহার গৃহে পিপীলিকাশ্রেণী দেখিয়া একটি কল্পিত দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে কটাক্ষ করিলেন। মহাপ্রভুর পরমোদার স্বভাব,—তিনি রামচন্দ্রপুরী গোসাঞির বাক্যদণ্ড সন্তুষ্টচিত্তে মাথায় করিয়া লইলেন। তিনি গোবিন্দকে নিকটে ডাকিলেন, এবং কহিলেন,—

> "আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এইত নিয়ম।
> পিণ্ডা ভোগের এক চৌঠি (১) পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥
> ইহা বহি অধিক আর কিছু না লইবা।
> অধিক আনিলে হেথা আমা না দেখিবা॥ চৈঃ চঃ

(১) জগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন মৃন্ময় হাড়িতে পাওয়া যায়। প্রমাণ হাড়ির চতুর্থ ভাগকে চৌঠি বলে।

পূর্ব্বে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণের নিয়ম ছিল চারি পণ কড়ির প্রসাদ। ইহা দ্বারা তিন জনের ভোজন হইত। মহাপ্রভু, কাশীশ্বর পণ্ডিত এবং গোবিন্দ (১)। এখন তিনি কিরূপ ভয়ানকরূপে ভিক্ষা সঙ্কোচ করিলেন, তাহা কৃপাময় পাঠকবৃন্দ। একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। জগন্নাথের পিষ্ঠা ভোগের এক চতুর্থাংশ আর পাচগণ্ডার ব্যঞ্জন মাত্র, এই নিয়ম রাখিলেন। গোবিন্দের মুখে ভক্তবৃন্দ তাঁহার এইরূপ ভিক্ষা-সঙ্কোচের কথা শুনিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের মাথায় যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত পড়িল। সকলে রামচন্দ্র পুরী গোসাঞির উপর মহাক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—

রামচন্দ্র পুরীকে সবাই দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবাকার॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুকে খাওয়ানই যাঁহাদিগের সুখ এবং আনন্দ,—তাঁহাকে পরম পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করানই যাঁহাদিগের ভজনাঙ্গ,—তাঁহাদিগের মনের দুঃখ এবং হৃদয়ের তাপ, রামচন্দ্রপুরীর এই দুষ্ট বুদ্ধি এবং পরনিন্দা কার্য্যে দিন দিন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। এদুঃখ ক্রমে তাঁহাদিগের অসহনীয় হইয়া উঠিল। সেই দিনই এক ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গোবিন্দ বিপ্রকে কাঁদিতে কাঁদিতে ভিক্ষা সঙ্কোচের আদেশ জানাইলেন। বিপ্র শিরে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি করিবেন ইহা মহাপ্রভুর আদেশ, লঙ্ঘন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তিনি বলিয়াছেন এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। এই ভয়ে কেহ কিছু বলিতে সাহসও করেন না। ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর আদেশ মত ভিক্ষার দ্রব্যাদি আনিয়া দিলেন। তিনি তাহার অর্দ্ধেক ভোজন করিলেন, আর অর্দ্ধেক গোবিন্দ ও কাশীশ্বর প্রসাদ পাইলেন। সকলেরই সেদিন প্রায় উপবাস হইল। একাহারে অর্দ্ধাশন আর উপবাস একই কথা। ইহা দেখিয়া অন্যান্য ভক্তগণ সে দিন আর কেহ প্রসাদই পাইলেন না।

অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন॥ চৈঃ চঃ

ভক্তবৎসল মহাপ্রভু দেখিলেন তাঁহার জন্য তাঁহার দুইটি ভৃত্য কেন কষ্ট পান? তিনি গোবিন্দ ও কাশীশ্বর পণ্ডিতকে নিকটে ডাকাইয়া আজ্ঞা করিলেন "তোমরা দুই জনে অন্যত্র ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করিবে (১)। দুই জনে কোন উত্তর না করিয়া অধোবদনে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। এইভাবে মহাদুঃখে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ভক্তবৃন্দের দুঃখের সীমা নাই, এখন তাঁহাদিগের দুঃখের দিন আসিতেছে। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ চলিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে নীলাচলের ভক্তবৃন্দের সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন নদীয়ার ভক্তবৃন্দ এখানে থাকিলে মহাপ্রভু এরূপ ভিক্ষা-সঙ্কোচ করিতে পারিতেন না। রামচন্দ্রপুরীর উপরে সমস্ত ভক্তবৃন্দের এরূপ রাগ হইয়াছে যে, তাঁহাকে প্রাণে বধ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রভূত সম্মান ও আদর করেন, নিত্য তিনি তাঁহার নিকট আসেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুবুদ্ধিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর ভয়ে কিছু করিতেও পারেন না,—কিছু বলিতেও পারেন না। নীলাচলের ভক্তবৃন্দের বড় বিপদের দিন,—বড় দুঃখের দিন যাইতেছে। সকলেই প্রায় অর্দ্ধাসনে থাকেন। কোন গতিকে প্রাণমাত্র রাখেন। তাঁহাদিগের মনে বিন্দুমাত্রও সুখ নাই। জগদানন্দ ত মৃতপ্রায় হইয়াছেন। সকলের অপেক্ষা তাঁহার দুঃখই অধিক। কারণ তিনি মহাপ্রভুকে পতিবুদ্ধি করেন,—তাঁহাকে ভালমন্দ খাওয়াইতে ভালবাসেন। এই বিষয়ে গোবিন্দ তাঁহার সহায়। এইকার্য্যে জগদানন্দ মনে যত সুখ পান, ভজনে তাহা পান না,—ইহাই তাঁহার ভজন। জগদানন্দ কেবল

(১) প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারি পণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খায় তিন জন॥ চৈঃ চঃ

(১) গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন।
দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর পূরণ। চৈঃ চঃ

কান্দেন এবং রামচন্দ্রপুরীকে উঠিতে বসিতে অকথ্য ভাষায় গালি দেন। ইহাও তাঁহার ভক্তনাঙ্গ।

এইভাবে কিছু দিন যায়। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর নিকট প্রত্যহ আসেন। তিনি তাঁহাকে সম্মান ও আদরের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন না। বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সম্মান করেন। মহাপ্রভুকে রামচন্দ্রপুরী হাসিয়া বলিলেন—

"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয় তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি কর অদ্ধাশন।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু যে তাঁহার পূর্ব্ব শ্লেষ-বাক্য শুনিয়া আহার সঙ্কোচ করিয়াছেন, তাহা রামচন্দ্রপুরী জানেন। একথা এখন আর গুপ্ত কথা নহে, নীলাচলের সর্ব্বত্র এই কথা রাষ্ট্র হইয়াছে, এবং সর্ব্বলোকে এই জন্য তাঁহাকে নিন্দা করিতেছে। মহাপ্রভু যে অদ্ধাশন করিয়া দেহ ক্ষীণ করিতেছেন, তাহাও সকল লোকে দেখিতে পাইতেছে,—রামচন্দ্রপুরীও দেখিতেছেন। এই সকল কারণে তাঁহার মনে একটু দুঃখ হইয়াছে, তাহা তাঁহার কথার ভাবেতেই বুঝা যাইতেছে। এইজন্য তিনি মহাপ্রভুকে উপরিউক্ত উপদেশ দিতে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু চতুর চূড়ামণি, তিনি অতিশয় বিনীতভাবে উত্তর করিলেন---

———"অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার॥" চৈঃ চঃ

রামচন্দ্রপুরী গোসাঞি আর কোন কথা কহিলেন না। তিনি মহাপ্রভুর কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, লোকশিক্ষার জন্য মহাপ্রভুর এই অবতার গ্রহণ। গুরু-ভক্তি যে কি বস্তু, এবং গুরুসম্পর্কীয় মাননীয় ব্যক্তিগণকে কিরূপ সম্মান করিতে হয়, তাহাদিগের সহস্র দোষ থাকিলেও তাহা কিরূপে, কিভাবে উপেক্ষা করিতে হয়, তাহা মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে এই রামচন্দ্রপুরী গোসাঞির সহিত ব্যবহার-প্রসঙ্গে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

ভক্তগণ যে প্রভুসঙ্গে অদ্ধাশন করিতেছেন, মহাপ্রভু তাহা শুনিলেন। কিন্তু ইহার ব্যবস্থা কিছু করিলেন না। তিনি মনে বড় দুঃখ পাইলেন। পরমানন্দপুরী গোস্বামীকেও প্রভু গুরুবুদ্ধিতে সম্মান করেন। তিনি প্রভুর সঙ্গে নীলাচলেই থাকেন। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভক্তবৃন্দ একদিন প্রভুর বাসায় গেলেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য পরমানন্দ পুরীগোসাঞিকে দিয়া এই বিষয়ে মহাপ্রভুকে অনুনয় বিনয় করিয়া কিছু কহিবেন। পরমানন্দপুরী গোসাঞি প্রমুখ ভক্তগণ মহাপ্রভুর বাসায় গিয়া সম্মুখে যোড়হস্তে দাঁড়াইলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বসিতে আজ্ঞা দিয়া পুরীগোসাঞিকে সম্মান করিয়া নিকটে বসাইলেন। পরমানন্দপুরী গোসাঞি তখন বলিতে লাগিলেন,—

"রামচন্দ্রপুরী মহা নিন্দুক স্বভাবের লোক। তাহার কথায় তুমি ভিক্ষা সঙ্কোচ করিয়া ভাল কাজ কর নাই। তুমি নিজে দুঃখ পাইতেছ এবং তোমার ভক্তবৃন্দকে দুঃখ দিতেছ। রামচন্দ্রপুরী জগদানন্দের বাসায় নিমন্ত্রিত হইয়া আকণ্ঠ ভোজন করিয়াছিলেন,—এবং স্বয়ং পরিবেশন করিয়া জগদানন্দকেও আকণ্ঠ ভোজন করাইয়াছিলেন। নিজে খাওয়াইয়া নিজেই আবার তাঁহাকে নিন্দাবাদও করিয়াছিলেন। কে কিরূপ ব্যবহার করে, কিরূপ ভোজন করে, তিনি সর্ব্বদা ইহাই অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান,—ইহাই তাঁহার কার্য্য। পরছিদ্রান্বেষণে তিনি পরম পটু,-দোষদর্শন তাঁহার স্বভাব। একপ ব্যক্তির কথায় আহার ত্যাগ করিয়াছ বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের অনুরোধ রাখ, পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ রক্ষা কর,---তোমার জীবন রক্ষা কর এবং তোমার ভক্তগণকে প্রাণে বাচাও।"

এই বলিয়া তিনি গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন,-

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ (১)

(১) অর্থ শ্রীকৃষ্ণভগবান অর্জ্জুনকে কহিতেছেন,---হে

মহাপ্রভু নীরব হইয়া পুরীগোস্বামীর সকল কথাগুলি একে একে শুনিলেন। তিনি অধোবদনে আছেন। চন্দ্রবদন তুলিয়া পুরীগোসাঞির প্রতি চাহিয়া করুণ বচনে দুইটী মাত্র কথা কহিলেন—

———"সবে কেন পুরীকে কর রোষ।

সহজ ধর্ম্ম কহেন তিঁহো, তাঁর কিবা দোষ।" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ "গোসাঞি! রামচন্দ্রপুরী গোসাঞির উপর তোমাদের এত রাগ কেন? তিনি ত আমাকে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন মাত্র, তাহার দোষ কি? সন্ন্যাসীর পক্ষে জিহ্বার লালসা বড় বিষম দোষ, প্রাণ রক্ষার জন্য সামান্যাহার সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,- সেই ধর্ম্ম তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছেন,—সেত অতি উত্তম কথা।" চতুরচূড়ামণি মহাপ্রভুর কথার উত্তর দিবার কাহারও শক্তি নাই। তিনি সরস ও স্নিগ্ধ বাক্‌পটুতায় সিদ্ধ, বিচার তর্কে, বা বাক্‌যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিবার লোক পৃথিবীতে কেহ জন্মায় নাই। পরমানন্দপুরী গোসাঞিপ্রমুখ ভক্তগণ আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহাকে বহু অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ভক্তের ভগবান ভক্তের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি তখন তাঁহার নিমন্ত্রণের পূর্ব্ব নিয়মের অৰ্দ্ধেক রাখিলেন অর্থাৎ চারিপণ কড়ির স্থলে দুইপণ নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ইহাতে ভক্তবৃন্দের মনে কিছু সুখ হইল বটে, কিন্তু তাঁহারা মনে পূর্ণানন্দ পাইলেন না। মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট কোন নিয়মই রাখিলেন না। ইঁহাদিগের মধ্যে গদাধর পণ্ডিত,ভগবান আচার্য্য,সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নাম গ্রন্থে দেখিতে পাই। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দেখাইলেন, ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞা রক্ষা সুকঠিন। তিনি ভক্তের মনোরঞ্জন করিতে বহু স্থলে নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। ভক্তের ভগবান ভক্তের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা। এই লীলা দ্বারা মহাপ্রভু ইহাই দেখাইলেন।

রামচন্দ্রপুরী গোস্বামী নীলাচলেই আছেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর নিকটে আসেন। ঈশ্বর-চরিত্র বুদ্ধির অগোচর, কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কভু রামচন্দ্রপুরীর হন ভৃত্যপ্রায়।

কভু তাঁরে নাহি মানে দেখে তৃণ প্রায়॥

প্রভু যখন রামচন্দ্রপুরীকে তৃণপ্রায় অবজ্ঞা করেন, তখন ভক্তবৃন্দের মনে বড় আনন্দ হয়। মহাপ্রভু কোন কাজ গোপনে করেন না। রামচন্দ্রপুরী এখন বুঝিলেন মহাপ্রভু তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি আর নীলাচলে থাকিলেন না। তীর্থযাত্রা ছল করিয়া নীলাচল ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,—তাঁহাদিগের মাথার বোঝা পাথর যেন ভূমিতলে পতিত হইল। তাঁহাদিগের আনন্দের সীমা রহিল না।

তিঁহো গেলে প্রভুগণ হৈল হরষিতে।

শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিতে॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু এক্ষণে স্বচ্ছন্দে ভোজন-বিলাস করেন, ভক্তবৃন্দের মনে আর কোন দুঃখ নাই। পরমানন্দে তাঁহারা মহাপ্রভুকে লইয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এই যে রামচন্দ্রপুরীর সহিত মহাপ্রভুর লীলারঙ্গ,—ইহাতে দুইটি বহুমূল্য উপদেশ-রত্ন গ্রথিত রহিয়াছে। গুরু-কোপানলে যখন শিষ্য পতিত হয়, তাহাতে কিরূপ কুফল ফলে, রামচন্দ্রপুরীকে দিয়া তাহা শিক্ষাগুরু মহাপ্রভু দেখাইলেন। গুরুর নিকট অপরাধ করিলে সে অপরাধ ঈশ্বর পর্য্যন্ত পৌঁছে, কারণ গুরু ও ঈশ্বর অভেদ। দোষদর্শন স্বভাব বড় ভয়ানক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ দেখিতে দেখিতে দোষদর্শন স্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ বস্তুতে লিপ্ত হয়, এবং অবশেষ বিশ্বনিন্দুক লোকে ঈশ্বরের দোষ পর্য্যন্ত দেখিতে থাকে। রামচন্দ্রপুরীর দোষদর্শন স্বভাবের শেষ ফল ইহাই হইল, তিনি স্বয়ং ভগবানের দোষ দেখিলেন,—এবং তাঁহাকেও উপদেশ দিতে শঙ্কা বোধ করিলেন না। অদোষদরশী মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীর কোন দোষই

অর্জ্জুন! অনেক ভোজনে যোগ হয় না,—এবং একান্ত ভোজনশূন্য হইলেও যোগ হয় না। অধিক নিদ্রা বা নিদ্রাত্যাগ দ্বারাও যোগ হয় না। আহার বিহার কর্ম্ম সকলে চেষ্টা, নিদ্রা জাগরণ উপযুক্ত রূপে নিয়মিত হইলে দুঃখনাশক যোগ হয়।

গ্রহণ করিলেন না, কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী দোষদর্শনের এবং পরনিন্দার ফল হাতে হাতে পাইলেন। তিনি নীলাচল হইতে বিতাড়িত হইলেন। মহাপ্রভুদর্শনে ও তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইলেন,—গুরুকোপানল হইতে উদ্ধার হইতে পারিলেন না। শিক্ষাগুরু মহাপ্রভুর সকল লীলারঙ্গই জীবের পরম মঙ্গলজনক উপদেশে পরিপূর্ণ। যিনি ভাগ্যবান তিনি এই সকল লীলারঙ্গ আস্বাদন করিয়া নিজ চরিত্র গঠন করিয়া ধন্য হইবেন। গৌরাঙ্গলীলাসমুদ্র অতিশয় গম্ভীর। গৌরভক্ত ভিন্ন অন্য কাহরাও ইহাতে প্রবেশাধিকার বড় কঠিন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে যার দৃঢ় ভক্তি॥

আর এই গৌরাঙ্গলীলা-সরোবরে ডুবিতে না পারিলে, কৃষ্ণলীলারসাস্বাদনের অন্য উপায় নাই। তাই পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাও তাহাতে॥

এইজন্যই তিনি আদেশ দিয়াছেন,—

চৈতন্য চরিত্র লিখি শুন এক মনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে॥ চৈঃ চঃ

এখন সবে মিলে উচ্চৈঃস্বরে বল—

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥ চৈঃ ভাঃ

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

—:০:—

প্রভু-ভৃত্য-সংবাদ।

গোবিন্দ কহয়ে মোর সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন॥ চৈঃ চঃ

নীলাচলে রথযাত্রার পর একটী উৎসব হয়। এই উৎসবে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নরেন্দ্রসরোবর-নীরে নৌকা চড়িয়া জলক্রীড়া করেন। এই আনন্দোৎসব উপলক্ষে নৃত্যকীর্ত্তনানন্দে নীলাচলবাসী বৈষ্ণবগণ বিভোর হন। নদীয়ার ভক্তগণ নীলাচলে থাকিতে থাকিতেই এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, মহাপ্রভু তাঁহার নিজগণসঙ্গে এই উৎসবে যোগদান করিয়া অদ্ভুত নৃত্যকীর্ত্তনানন্দে অগণিত দর্শকবৃন্দের মন হরণ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের সহিত অপূর্ব্ব জলক্রীড়া করিলেন। প্রতি বৎসরই তিনি ভক্তগণকে লইয়া এইরূপ আনন্দ করেন।

একদিন শ্রীজগন্নাথদেবের শয়োত্থান দেখিতে যাইয়া মহাপ্রভুর মনে মহা সংকীর্ত্তনযজ্ঞের ভাব উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীমন্দিরমধ্যেই ভক্তবৃন্দকে লইয়া সাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর বেড়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে নীলাচল-গগন পূর্ণ হইল।

"তা তা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই ঝনর ঝনর করতাল।"
জগজ্জন্নাথের সেবকগণও এই মহা সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। তাঁহাদের,—

"তন তন তম্বুর, বীণা সুমধুর বাজত যন্ত্র রসাল॥"

এই বাদ্যযন্ত্রের মধুময় ধ্বনিতে শ্রীমন্দির মুখরিত হইল সাত সম্প্রদায়ে সাত জন চিহ্নিত বিশিষ্ট ভক্ত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সাতজনের মধ্যে দুই প্রভু আছেন শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ। আর পাঁচ জন বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীবাসপণ্ডিত, সত্যরাজ খান্ আর ঠাকুর নরহরিদাস। শ্রীমন্দির কিছুক্ষণের মধ্যে লোকে লোকারণ্য হইল। সমগ্র নীলাচলবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া এই মহা

সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে যোগ দিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তখন নীলাচলে ছিলেন। তিনি অমাত্যগণ সঙ্গে দূর হইতে এই ভুবনমঙ্গল মহা সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ দেখিতেছেন। রাজমহিষীগণ অট্টালিকার উপরে উঠিয়া দেখিতেছেন। শ্রীমন্দির হইতে সদলবলে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞেশ্বর মহাপ্রভু এক্ষণে নৃত্যাবেশে রাজপথে বাহির হইয়াছেন। সকললোকের মুখে কেবলমাত্র ঘন ঘন উচ্চ হরিধ্বনি শ্রুত হইতেছে। প্রেমোন্মত্ত ভক্তবৃন্দের পদভরে পৃথিবী যেন টলমল করিতেছে। পথে লোকের ভিড় এত অধিক হইয়াছে, যে যাইবার পথ না পাইয়া তাঁহারা কীর্ত্তনে যোগ দিতেছে। এরূপ অদ্ভুত মনোরম দৃশ্য নীলাচলে কেহ পূর্ব্বে দেখেন নাই। প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া কটি দোলাইয়া মধুর মধুর নয়নরঞ্জন অপরূপ নৃত্য করিতেছেন। সেই অপরূপ নৃত্য-ভঙ্গী দেখিবার জন্য লোকে মহা কোলাহল করিতেছে। মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন, আর নিম্নলিখিত উড়িয়া পদের ধূয়া ধরিয়াছেন—

"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ"—

অর্থাৎ "হে জগমোহন! তোমার নির্ম্মঞ্ছন হউক" তিনি আজানুলম্বিত সুবলিত বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া ঘন ঘন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "বোল হরিবোল, বোল হরিবোল"। এইভাবে কখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইতেছেন,—তাঁহার দেহে যেন প্রাণ নাই, শ্বাসশূন্য। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় অকস্মাৎ হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে উঠিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ পুলককদম্বকেশরীতে পরিপূর্ণ, প্রতি রোমকূপে রক্তোদ্গম দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার বচন গদগদ; তিনি আর "জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ" পূর্ণ করিয়া গাইতে পারিতেছেন না। জ, জ, গ গ, "পরি" এইরূপ অসংলগ্ন শব্দমাত্র তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইতেছে। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ফেনপুঞ্জ বক্ষে পড়িতেছে,—নয়নকমল নিমেষশূন্য, প্রেমাবেশে ঢুলু ঢুলু। মধুর নৃত্যাবেশে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। এইভাবে বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল, তবুও মহাপ্রভুর নৃত্যকীর্ত্তন শেষ হইল না। তাঁহার ভক্তবৃন্দের দশাও তদ্রূপ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দেখিলেন কীর্ত্তন বন্ধ না করিলে, মহাপ্রভুর ও তাঁহার ভক্তগণের প্রাণরক্ষা হয় না। শচীমাতার আদেশ-বাক্য তাঁহার মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া কানে কানে কি বলিলেন, মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তনশ্রমক্লান্ত বদন দেখিয়া নিজ ভাব সম্বরণ করিলেন,—কীর্ত্তন বন্ধ করিলেন।

"ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাধান।" চৈঃ চঃ

কিছুক্ষণ সুস্থির হইয়া সকলে মিলিয়া তাহার পর সমুদ্র-স্নানে চলিলেন। সেখানে অপূর্ব্ব জলকেলিরঙ্গ প্রকট করিলেন। তাহার পর বাসায় আসিয়া ভক্তগণসঙ্গে প্রসাদ পাইলেন। তখন দুই দণ্ড মাত্র বেলা আছে। সেদিন এইভাবেই গেল।

ভোজনান্তে মহাপ্রভু একটু বিশ্রাম করেন। তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দের নিয়ম নিত্য তিনি তাঁহার পাদসম্বাহন করিয়া পরে প্রসাদ পান। মহাপ্রভু ভোজনান্তে তাঁহার গম্ভীরা মন্দিরদ্বারে একদিন শয়ন করিলেন। দ্বার জুড়িয়া তিনি শ্রীঅঙ্গ রক্ষা করিয়াছেন। গৃহ প্রবেশের অন্য দ্বার নাই। তিনি ভোজনান্তে নিদ্রাবিষ্ট আছেন। গোবিন্দ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, কি বিপদ! কি করিয়া গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া প্রভুর পদসেবা করি। প্রভু যে নিদ্রাগত নহেন, গোবিন্দ তাহা জানেন, তিনি করযোড়ে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন—

"এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতর যাইতে।"

মহাপ্রভু ভঙ্গী করিয়া কহিলেন—

———"শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥"

গোবিন্দ কহিলেন—

———"করিতে চাহি পাদ সম্বাহন।"

মহাপ্রভু উত্তর করিলেন—

"কর না কর যেই তোমার মন॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু গোবিন্দের মন পরীক্ষা করিতেছেন,—তাঁহার নিয়ম-সেবার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবেন, এই ভাবিতেছেন,—শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের পরীক্ষা বড়ই কঠিন। তিনি তাঁহার নিজজনকেই পরীক্ষা করেন।

ভক্তগণ শ্রীভগবানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভগবান তাহা দেখিয়া বড় আনন্দ পান এবং তাহার পরীক্ষোত্তীর্ণ ভক্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া কত সোহাগ আদর করেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত ভৃত্য। গোবিন্দের উপর তাহার বড় কৃপা। গোবিন্দ তাহার শ্রীগুরুদেব ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ও শিষ্য ছিলেন,—পুরীগোসাঞির অন্তর্দ্ধানের পর তাহারই আদেশে মহাপ্রভুর সেবা করিতে নীলাচলে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু প্রথমে গোবিন্দের সেবা গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই, কারণ তিনি তাহার গুরুভাই। কিন্তু তাহার ভক্তগণ তাহাকে বুঝাইয়াছেন, ইহা যখন গুরুর আদেশ, তখন অবশ্য পালনীয়। শাস্ত্রাজ্ঞা পরোক্ষ আদেশ, —গুরুর প্রত্যক্ষ আদেশ, সুতরাং ইহাই বলবান। মহাপ্রভু এইজন্য গোবিন্দের সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু শয়ান আছেন। প্রভুভৃত্যে আর কোন কথাই হইল না। গোবিন্দ দ্বারে দাঁড়াইয়া কীয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সেবানিষ্ঠ গোবিন্দ কি করিলেন শুনুন। মহাপ্রভুর বহির্বাস বাহিরে শুকাইতেছিল, তাহা তিনি প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আচ্ছাদন করিয়া দিয়া একটী লম্ফে তাহার শ্রীঅঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া গম্ভীরামন্দিরের ভিতরে গেলেন এবং তাহার চরণতলে বসিয়া তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু সকলি দেখিলেন ও বুঝিলেন, কিন্তু তখন আর কোন কথা কহিলেন না। গোবিন্দ তাহার কটিদেশ ও পৃষ্ঠদেশ উত্তম করিয়া মৃদু মৃদু মর্দ্দন করিয়া দিলেন, তিনি দুই দণ্ডকাল সুখে নিদ্রা গেলেন (১)। নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তিনি তাঁহার পার্শ্বে গোবিন্দকে দেখিয়া কপট ক্রোধাবিষ্ট ভাবে কহিলেন—

(১) তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর উপর দিয়া।
ভিতর ঘরেতে গেলা প্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥
পাদ সম্বাহন করিল কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল।
সুখে নিদ্রা হল প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড দুই বই প্রভুর হৈল নিদ্রাভঙ্গ॥ চৈঃ চঃ

"আদিবস্যা! কেন এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া?
নিদ্রা হৈলে কেন নাহি গেলা প্রসাদ পাইতে?"

অর্থাৎ "গোবিন্দ! তুই এতক্ষণ বসিয়া আছিস্ কেন? আমার নিদ্রা আসিলে কেন প্রসাদ পাইতে যাস নি"। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তাহার ভৃত্যের নিয়ম সেবার বিষয় সকলেই জানেন। তাহার নিত্যকর্ম্ম মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন না করিয়া গোবিন্দ প্রসাদ পাইবেন না, তাহা মহাপ্রভু উত্তমরূপে জানেন, তাই সস্নেহে ক্রোধভরে এই কথা বলিলেন। এখন গোবিন্দের উত্তর শুনুন—

গোবিন্দ কহে "দ্বারে শুইলা যাইতে নাহি পথে"। চৈঃ চঃ

অর্থাৎ দ্বার বন্ধ করিয়া তুমি শুইয়া আছ,—বাহিরে যাইবার পথ কোথায় পাইব। কেমন করিয়া আমি প্রসাদ পাইতে যাইব?" সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু ভঙ্গী করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন,—

——"ভিতরে তবে আইলা কেমনে।
তৈছে কেন প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে॥" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ "তুই ভিতরে যেমন করিয়া আসিয়াছিলি, তেমনি করিয়া কেন বাহিরে গেলি না?" গোবিন্দ মহাপ্রভুর এই কথার উত্তর মনে মনে দিলেন, প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। তিনি কি বলিলেন শুনুন,—

গোবিন্দ কহয়ে "মোর সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্ব অপরাধাভাসে ভয় মানি॥" চৈঃ চঃ

গোবিন্দের কথার মর্ম্ম পরম নিগূঢ় প্রেমভক্তিতত্ত্বপূর্ণ। তিনি বলিলেন "প্রভু হে! তোমার সেবা করাই আমার নিয়ম এবং তাহার জন্য আমার অপরাধই হউক, আর আমাকে যদি নরকে গমন করিতে হয়, তাহাও পরম মঙ্গল মনে করি। তোমার সেবার জন্য কোটি অপরাধ আমি তৃণতুল্য জ্ঞান করি। কিন্তু দয়াময়! আমার নিজের জন্য অপরাধের আভাসমাত্রকেও আমি বড় ভয় করি। তোমার সেবার জন্য তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া গৃহের ভিতরে আসিয়াছি বলিয়া কি আমি আমার এই

দগ্ধ উদরের জন্য পুনরায় তোমাকে লঙ্ঘন করিব? প্রভু হে! দয়াময় হে! এরূপ মতি যেন তোমার দাসানুদাসের না হয়,—ইহাই তোমার চরণে আমার একান্ত প্রার্থনা"। গোবিন্দ ভক্তি-তত্ত্বের উচ্চতম আদর্শ জগতকে দেখাইলেন। এরূপ নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্বপূর্ণ লীলা কথা ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে কোথায় পাইবে না। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রিত ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ মহাজনগণই এইরূপ নিগূঢ় ভক্তিরসের ভাণ্ডারী। প্রেমভক্তিতত্ত্ব যদি শিখিতে হয়, প্রেমভক্তি যে কি বস্তু যদি জানিতে হয়, তবে একমাত্র গৌরভক্তবৃন্দেরই নিকট তাহা শিক্ষণীয়। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! গৌরভক্তের মহিমা অবশ্যই আপনারা অবগত আছেন। তথাপি আত্মশোধনের জন্য শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীঠাকুর কৃত গৌরভক্তমহিমাসূচক দুই একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। সরস্বতীঠাকুর ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, দশ সহস্র মায়াবাদী সন্ন্যাসীর গুরু ছিলেন, কাশীতে তাঁহার সুবৃহৎ মঠ ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদি কোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যান কোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তি কোটিঃ।
কোট্যাংশোঽপ্যস্য নস্যাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃ সিদ্ধআস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয় চরণনখজ্যোতিরামোদ ভাজাং॥

ইহার ভাবার্থ শুনুন। সরস্বতী ঠাকুর দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন,—তোমার কোটি কোটি বৈরাগ্যতেই বা কি হইবে,—তোমার কোটি কোটি শম, দম, ক্ষান্তি মৈত্র অর্থাৎ শুচিত্বাদি গুণ থাকিলেই বা কি হইবে, নিরন্তর "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য বিষয়ক কোটি কোটি চিন্তাতেই বা তোমার কি হইবে এবং বিষ্ণু বিষয়ক কোটি কোটি ভক্তিসূত্রগ্রন্থনেই বা তোমার কি হইবে? শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত প্রিয় ভক্তবৃন্দের পদনখজ্যোতি দ্বারা উল্লসিত পরম সৌভাগ্যবান মানবদিগের হৃদয়ে যে সকল স্বভাবসিদ্ধ গুণগ্রাম বর্ত্তমান, তাহার কোট্যাংশের একাংশও তোমাতে নাই।

এত বড় প্রসংশাপত্র কোন পণ্ডিত কাহাকেও এপর্য্যন্ত দিতে সাহস করেন নাই। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভারত-বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীঠাকুর পরম সৌভাগ্যক্রমে গৌরভক্তদিগের সঙ্গলাভ করিয়া তাহাদিগের গুণ পরীক্ষা করিয়া,—তাহাদিগের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া,—তাহাদিগের মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা পাইয়াছেন,—যাহা দেখিয়াছেন,—যাহা বুঝিয়াছেন,—তাহা অকপটে তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে অতিস্তুতি বলে না,—তোষামোদ বলে না, গৌরভক্তবৃন্দের গুণে মুগ্ধ হইয়া সরস্বতী ঠাকুরের অন্তর হইতে প্রকৃত কথা বাহির হইয়াছে। তিনি বহু বিচার করিয়া তবে তাঁহার লেখনী দ্বারা এই সকল গৌরভক্ত-গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধন করিয়াছেন। সরস্বতী ঠাকুরের রচিত আর একটি শ্লোক শুনুন।

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থান বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদি দুষ্প্রাপ্য পদং বিদন্তি॥

ইহার অর্থ। তোমরা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের আচরণই কর, শ্রীবিষ্ণুসেবাই কর, সমস্ত তীর্থাদি পর্য্যটনই কর বা বেদার্থ বিচারই কর, শ্রীগৌরাঙ্গচরণাশ্রিত ভক্তরাজদিগের চরণসেবা ব্যতিরেকে বেদাদি বিচার দ্বারা দুষ্প্রাপ্য যে অতি মনোরম স্থান অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন, তাহা জানিতে পারিবে না। ব্রজরসতত্ত্ব যে কি বস্তু, ব্রজের গোপীভজন যে কি মধুময়, ব্রজের ভাব যে কিরূপ নিগূঢ়বস্তু, শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুদাসের কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন তাহা বুঝিবার, জানিবার বা আস্বাদন করিবার অধিকার লাভ সুদুর্ঘট। এই কথা যে অতি সার কথা, ইহা যে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত কথা নহে, তাহা বুদ্ধিমান ও ভক্তিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ব্রজের ভজনরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ গৌরভক্তসঙ্গ ভিন্ন অতি সুদুর্লভ। সরস্বতীঠাকুর ভজনরাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহার সীমা বিচার

করিয়া তবে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং একজন বহুশাস্ত্রদর্শী বিশিষ্ট সাধকপ্রবর। ধ্যান ধারণার অতীত বস্তু, সাধ্যসাধনের শেষ সীমারূপ যে অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন ধাম এবং ব্রজের গোপীভজন, তাহা একমাত্র গৌরাঙ্গকৃপা বলেই অনুভূত হয়,—ইহাই সরস্বতী ঠাকুরের কথার মর্ম্ম।

এখন আর অধিক কিছু বলিব না। গৌরভক্তবৃন্দের গুণবর্ণনা করা জীবাধম গ্রন্থকারের ক্ষুদ্রশক্তির বহির্ভূত। মহাজনগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করাই তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। গৌরভক্ত মহাজনগণের চরণে যেন কোন প্রকারে অপরাধী না হই, এই ভয়ে হৃদয় সতত কম্পিত হয়, এবং মহাজন কবির সাবধানবাক্য সতত মনে পড়ে। তাহা এই—

মহান্ত সম্মান কিবা, মহান্তের জন যে বা
হয় সবার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদাস কভু, ভয়ে প্রাণ কাঁপে প্রভু
এ সাধে না পড়ে যেন বাদ॥
পরমানন্দ।

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

নীলাচলে রঘুনাথ ভট্ট ও মহাপ্রভু।

রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশেষ পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥ চৈ: চঃ

লীলাময় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু নীলাচলে লীলারঙ্গে আছেন। তিনি প্রতিদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে যান। একদিনের একটি অতি অদ্ভুত লীলা-কথা বর্ণনা করিয়া তবে মহাপ্রভুর সহিত শ্রীপাদ রঘুনাথভট্ট গোস্বামীর মিলন-লীলা বর্ণনা করিব। মহাপ্রভু একদিন প্রেমাবেশে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া যমেশ্বর টোটার দিকে দৌড়িতেছেন। সঙ্গে তাঁহার চিরভৃত্য গোবিন্দ আছেন এই সময়ে দূর হইতে সুমধুর গীত-ধ্বনি শুনিয়া প্রেমময় মহাপ্রভু পথে দাঁড়াইয়া সেই দিকে উৎকর্ণ হইয়া চাহিলেন। একজন দেবদাসী গুর্জ্জরী রাগে অতি সুমধুর কণ্ঠে গীতগোবিন্দের এই পদটি গাইতেছিল।

শ্রিতকমলা কুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিত বনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥ ধ্রুবম্॥
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস।
কালীয় বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিন দিনেশ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান।
অমলকমলদল লোচনভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিত দশকণ্ঠ।
অভিনব জলধর সুন্দরধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর।
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরুকুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতং॥

প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু প্রেমাবেশে গান শুনিতে শুনিতে প্রেমাবেগে সেই দিকে ছুটিলেন। কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই,—কণ্ঠস্বর বড় মধুর লাগিয়াছে, ব্রজভাবাবেশে তিনি মগ্ন হইয়া ছুটিয়াছেন,—পথে সিজের কাঁটা শ্রীপদে ফুটিতেছে,—শ্রীঅঙ্গে লাগিতেছে,—তাহা তাঁহার অনুভব নাই। মহাপ্রভু প্রেমাবেশে ছুটিলে তাঁহার লাগ পাওয়া দুষ্কর। গোবিন্দ তাঁহার পিছু পিছু ছুটিলেন। তিনি জানেন ইহা স্ত্রীকণ্ঠ,—দেবদাসীর গান। কি সর্ব্বনাশ! মহাপ্রভু ইহাত জানেন না। তিনি যে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন না,—নাম পর্য্যন্ত কর্ণে শ্রবণ করেন না। দয়াময়! এ কি করিলেন! এই বলিতে বলিতে গোবিন্দ ঊর্দ্ধশ্বাসে পিছু পিছু ছুটিয়াছেন, গীতমুগ্ধা দেবদাসীর অতি সন্নিকটেই মহাপ্রভু তখন পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দ হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহাকে ধরিয়া সজোরে ক্রোড়ে বাহুবদ্ধ করিয়া কানে কানে কহিলেন "প্রভু এ যে স্ত্রীলোকের গান"। "স্ত্রী" এই কথাটি শুনিবামাত্র মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল, অমনি তিনি মুখ ফিরাইয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে পুনরায় ফিরিলেন (১)। তিনি গোবিন্দের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া প্রেমগদগদভাষে কহিলেন—

(১) স্ত্রীনাম শুনিতেই প্রভুর বাহ্য হৈলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা॥ চৈ° চঃ

———"গোবিন্দ! আজ রাখিলে জীবন।
স্ত্রীস্পর্শ হৈলে আমার হৈত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।" চৈঃ চঃ

গোবিন্দ এই কথা শুনিয়া বিশেষ লজ্জিত হইলেন। তিনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণের ধূলি লইয়া কহিলেন "প্রভু হে! তোমাকে জগন্নাথ রক্ষা করিয়াছেন, আমি কোন ছার, আমি কি করিতে পারি"। মহাপ্রভু তখন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সস্নেহে পদ্মহস্ত দিয়া কহিলেন—

———"তুমি মোর সঙ্গে রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা॥ চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া তিনি যমেশ্বর টোটায় চলিয়া গেলেন। গোবিন্দের মুখে স্বরূপগোসাঞি প্রভৃতি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এই কথা শুনিলেন,—শুনিয়া তাঁহারা বড় ভয় পাইলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গ যেন কেহ কখন কিছুতেই না ছাড়েন, তাহার বিধিমত ব্যবস্থা করিলেন।

মহাপ্রভুর এই যে লীলারঙ্গটী, ইহাও লোকশিক্ষার কারণ। ইহা দ্বারা তিনি ভক্তবৃন্দকে শিক্ষা দিলেন, কৃষ্ণপ্রেমসঙ্গীত মধু হইতে মধু হইলেও স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইলে উদাসীন বিরক্ত বৈষ্ণব সাধুর পক্ষে তাহা শ্রবণ নিষিদ্ধ। প্রেমিক বৈষ্ণবসাধু বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগকে তিনি সাবধান করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য কাশী হইতে গৌড়ের পথ দিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিলেন। ইনিই রঘুনাথভট্ট গোস্বামী নামে অভিহিত পূজ্যপাদ ষট্গোস্বামীর অন্যতম। ১৪২৬ শকে এই মহাপুরুষের জন্ম এবং ১৫০১ শকে ইনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে অপ্রকট হন। রঘুনাথভট্ট মহাপ্রভুর আদেশে বিবাহ করেন নাই, অষ্টবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া কাশীধামে তপনমিশ্রের গৃহে দুইমাস কাল থাকিয়া শ্রীরূপগোস্বামীকে শিক্ষাদান করেন, রঘুনাথ তখন বালক। তিনি মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতেন, নানাভাবে তাঁহার সেবা করিতেন (১)। মহাপ্রভু এই বালকের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই রঘুনাথ এক্ষণে যুবক, ভাগবতশাস্ত্রে তিনি পরম পণ্ডিত,—অতিশয় সুন্দর পুরুষ, এবং সুকণ্ঠ। তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিয়াছেন,—সঙ্গে একটী সেবক, তাঁহার ব্যবহারিক দ্রব্যাদি বহন করিয়া আসিয়াছে। পথে রামদাস বিশ্বাস নামক রাম-উপাসক একটি বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনিও নীলাচলে জগন্নাথদর্শনে যাইতেছিলেন। উভয়ে একত্রে নীলাচলে আসিয়াছেন। পথে রামদাস রঘুনাথভট্টের বহুবিধ সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতি ও প্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু নিজ মন্দিরে সপার্ষদে বসিয়া আছেন। রঘুনাথভট্ট আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণতলে ভূমিবলুণ্ঠিত শিরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে চিনিতে পারিয়া স্বয়ং উঠিয়া প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। কাশীতে তাঁহার পিতা তপনমিশ্র এবং চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত, তিনি মহা আগ্রহ সহকারে তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথকে দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল, তিনি সস্নেহে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে পদ্মহস্ত দিয়া কহিলেন "রঘুনাথ! তুমি আসিয়াছ, উত্তম করিয়াছ। জগন্নাথ দর্শন কর, আজ আমার এখানে প্রসাদ পাইবে।" রঘুনাথ মহাপ্রভুর শ্রীকরস্পর্শ লাভ এবং শ্রীবদনের অমৃতমাখা সস্নেহ বচন শুনিয়া প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া তাঁহার শ্রীচরণধূলি পুনঃ পুনঃ লইয়া শিরে ধারণ করিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিয়া রঘুনাথের বাসা স্থির করিয়া দিলেন। স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর এত কৃপা দেখিয়া সকল ভক্তবৃন্দও তাঁহাকে কৃপা করিলেন। অষ্টমাসকাল তিনি ভক্তসঙ্গে নীলাচলে বাস করিলেন। রঘুনাথ পাককার্য্যে অতিশয় সুনিপুণ। বিবিধ শাক ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করেন,—তাঁহার রন্ধন অমৃতসম,—মহাপ্রভু পরম সন্তোষের সহিত রঘুনাথের বাসায়

(১) রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন আর পাদসম্বাহন॥ চৈঃ চঃ

ভোজন করেন, আর তাঁহার অবশেষ পাত্র রঘুনাথ প্রসাদ পান। রঘুনাথের ভাগ্য বড়ই সুপ্রসন্ন। বাল্যকালে তিনি মহাপ্রভুর অধরামৃতের মধুরাস্বাদন পাইয়াছিলেন, তাহার মধুর স্বাদ জীবনে ভুলিতে পারেন নাই—সে অমৃতের আস্বাদ তাঁহার জিহ্বায় যেন লাগিয়াছিল। এক্ষণে পুনরায় সেই সৌভাগ্য পাইয়া তিনি পরানন্দে মগ্ন আছেন। প্রভুসঙ্গ, ভক্তসঙ্গ, জগন্নাথদর্শন, নৃত্যকীর্ত্তন প্রভৃতি ভজনানন্দে রঘুনাথভট্ট আট মাস কাল নীলাচলে কাটাইলেন।

রঘুনাথের সঙ্গে যে রামদাস বিশ্বাস আসিয়াছিলেন, তিনি একদিন মহাপ্রভুর সহিত মিলিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন না, কারণ—

"অন্তরে মুমুক্ষু তিঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্।"

অভিমানশূন্য না হইলে শ্রীভগবানের কৃপালাভ যে দুর্ঘট, ইহাই মহাপ্রভু এই উপেক্ষায় দেখাইলেন। রামদাসের সৎসঙ্গ হইয়াছিল, তাঁহার ইষ্টে ঐকান্তিক ভক্তি হইয়াছিল,—কিন্তু হৃদয় অভিমান শূন্য হয় নাই। এইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গের পরিপূর্ণ কৃপালাভে বঞ্চিত হইলেন। তিনি কাব্য-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নীলাচলে বাস করিয়া বাণীনাথ পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে কাব্য পড়াইতে লাগিলেন।

রঘুনাথভট্ট মহাপ্রভুর নিকট একদিন বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "রঘুনাথ। তুমি এক্ষণে কাশী ফিরিয়া যাও। তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা কর। বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন কর। বিবাহ করিও না; আর একবার নীলাচলে আসিও।" (১) এই সকল উপদেশ-কথা বলিয়া মহাপ্রভু নিজের গলার প্রসাদী মালা রঘুনাথের গলায় পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন-দানে বিদায় করিলেন। রঘুনাথ তাঁহার চরণতলে দীঘল হইয়া পড়িয়া প্রেমানন্দে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর চরণ ছাড়িয়া কাশী যাইতে তাঁহার মন একেবারেই চাহিতেছে না। কিন্তু কি করেন, মহাপ্রভুর আদেশ, তাহার উপর আর কোন কথাই নাই। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বরূপগোসাঞি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের আজ্ঞা লইয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় কাশীতে চারি বৎসর কাল তিনি পিতৃমাতৃসেবা করিলেন, বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন; প্রভুর উপদেশ পালন করিলেন। তাঁহার পিতামাতার কাশীপ্রাপ্তি হইলে তবে তিনি উদাসীনব্রত অবলম্বন করিয়া পুনরায় নীলাচলে আসিলেন মহাপ্রভু তখন তাঁহাকে দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলেন। পুনরায় আট মাস কাল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী নীলাচলে প্রভুর সেবা করিলেন, ভক্তগণের সঙ্গ করিলেন। এই লীলারঙ্গে শিক্ষাগুরু মহাপ্রভু তাঁহার অনুগত ভক্তগণকে শিক্ষা দিলেন যে বৃদ্ধ পিতামাতা বর্ত্তমানে উদাসীন-বৃত্তি অবলম্বন করা শাস্ত্র-যুক্তি মত নহে। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা ত্যাগ করিয়া উদাসীন-ধর্ম্ম সাধন হইতে পারে না। কারণবৈরাগ্যবান্ সাধু বৈষ্ণবগণের প্রতি মহাপ্রভুর এই উপদেশ প্রযুজ্য। নীলাচলে অবস্থিতি কালে একদিন মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে হঠাৎ আদেশ করিলেন—

"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবন।
তাঁহা যাই রহ যাহা রূপ সনাতন॥
ভাগবত পড় সদা লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবে কৃপা কৃষ্ণ ভগবান॥" চৈঃ চঃ

রঘুনাথ ভট্টের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বড় আশা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিবেন বলিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু যে এরূপ কঠোর আদেশ দিবেন, তাহা তিনি মনেও ভাবেন নাই। কিন্তু কি করিবেন, মহাপ্রভুর আদেশের উপর কোন কথা কহিবার কাহারও শক্তি নাই। তিনি নীরবে তাঁহার শ্রীচরণনখকমলচ্ছটার উপর নয়ন রাখিয়া অধোবদনে ঝুরিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বদিন মহোৎসব হইয়াছিল। মহাপ্রভুকে কোন

---

(১) অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল।
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল॥
বৃদ্ধ পিতামাতা যাই করহ সেবনে।
বৈষ্ণব স্থানে ভাগবত করহ অধ্যয়নে॥
পুনরপি একবার আসিও নীলাচলে॥ চৈঃ চঃ

ভক্ত চৌদ্দহস্ত পরিমিত জগন্নাথের প্রসাদী তুলসীর মালা এক গাছি ভক্তি-উপহার দিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে ছুটা পানও ছিল। মহাপ্রভু পরম প্রেমভরে সেই প্রসাদী মালা ও ছুটা পান রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ প্রভুদত্ত সেই প্রসাদী মালা ও পান নিজ ইষ্টদেবের মত সম্মান করিয়া বুকে ধরিয়া পরে শিরোধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন।

"ইষ্টদেব করি মালা হৃদয়ে ধরিলা"

মহাপ্রভুর আদেশে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর শরণাগত হইলেন। রঘুনাথ ভাগবতে পরম পণ্ডিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা-বলে তিনি ভাগবতার্থ এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করেন, যে তাহা শ্রবণ করিলে মহা অভক্তের হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোসাঞির মহা সভায় তিনি ভাগবত পাঠ করেন, তাহার বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শুনুন—

রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে তাঁর প্রেমে আউলায় মন॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য যবে পড়ে শুনে
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে॥ চৈ. চঃ

কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং রঘুনাথ ভট্টের এই ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। রঘুনাথভট্ট শ্রীবৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দের পূজনীয় ছিলেন।

জয়পুরের মহারাজ মানসিংহ রঘুনাথভট্ট গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের বর্ত্তমান শ্রীগোবিন্দদেবের পুরাতন শ্রীমন্দির রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ভট্ট গোস্বামী তাঁহার শিষ্যকে বলিয়া এই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীঅঙ্গের বহুমূল্য অলঙ্কারাদি গঠন করাইয়া দিয়াছিলেন (১)। শ্রীবৃন্দাবনে তিনি কিরূপ ভাবে ভজন করিতেন, কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহাও শুনুন—

গ্রাম্য বার্ত্তা নাহি শুনে নাহি কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ম্ম নাহি শুনে কানে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে এই মাত্র জানে॥ চৈঃ চঃ

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দত্ত মালা-প্রসাদ কড়ার সঙ্গে তিনি গলদেশে বাঁধিয়া নাম স্মরণ করিতেন। রঘুনাথভট্ট গোস্বামীর বৈরাগ্য দাসগোস্বামীর মত তীব্র না হইলেও উদাসীন বিরক্ত বৈষ্ণবোচিত ছিল। একটী প্রাচীন পদে ভট্ট গোস্বামীর গুণরাশির কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই পদটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে,
তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি। ধ্রু।
চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র,
বারণসী ছিল যার বাস।
নিজগৃহে গৌরচন্দ্রে পাইয়া পরমানন্দে,
চরণ সেবিল দুই মাস॥
শ্রীচৈতন্য নাম জপে কত দিন গৃহে থাকি,
করিলেন পিতার সেবনে।
তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণে॥
মহাপ্রভু কৃপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি,
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদে গুণি, আসি বৃন্দাবন ভূমি,
মিলিলেন রূপসনাতন॥
দুই গোসাঞি তারে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া,
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অঙ্গ,
সদা কৃষ্ণকথার উল্লাসে॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনা পুলিনে রঙ্গে,
একত্র হৈয়া প্রেম সুখে।

(১)। নিজ শিষ্য কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥ চৈঃ চঃ

শ্রীমদ্ভাগবত কথা, অমৃত সমান গাথা,
নিরবধি শুনে যার মুখে ॥
পরম বৈরাগ্য সীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা,
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশুপক্ষী পুলকিত, যার মুখে কথামৃত,
শুনিতে পাগল হয় প্রাণী ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুই জন,
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এরাধা বল্লভ বলে, পড়িনু বিষম ভোলে,
কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥

মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার মধ্যে বহু ভক্তসম্মিলন-লীলাকথা আছে। তাঁহাকে দর্শন করিতে নীলাচল যান নাই, এমন ভক্ত অতি বিরল। সকলের কথা গ্রন্থে বিস্তারিত লিখিত নাই। মহাজনগণ সূত্ররূপে কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া এই সকল লীলাকথা বিস্তার করিয়া লিখিতে মনে বড় বাসনা হয়, কিন্তু গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। আত্মশোধনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ ভক্তচরিতালোচনা করিয়া,—

"যৈছে তৈছে লিখি করি আপনা পাবন ॥" চৈঃ চঃ

এক্ষণে গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দের কৃপাই আমার সম্বল। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর সুরের সহিত সুর মিলাইয়া বলি—

"শ্রোতা পদরেণু করোঁ মস্তক ভূষণ।
তোমরা এঅমৃত পিলে সফল হয় শ্রম ॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥

অর্থাৎ, হে ভক্তগণ! তোমরা বারম্বার চৈতন্যচরিতামৃত পরমানন্দে শ্রবণ কর, কীর্ত্তন কর, এবং স্মরণ কর। ইহাতে তোমাদের পরম মঙ্গল হইবে।

এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, ইহা একটি মহাসমুদ্র,—বিশেষ,—এবং ইহা অত্যন্ত নিগূঢ়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

নিগূঢ় চৈতন্য-লীলা বুঝিতে কার শক্তি
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি ॥

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

—:০:—

রায় রামানন্দের গোষ্ঠী ও মহাপ্রভু।

—:০:—

বাজার কৌড়ি না দেয়, আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে?"

প্রভুবাক্য-চৈতন্যচরিতামৃত।

মহাপ্রভু নীলাচলে কৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিত হইয়া আছেন। তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-দুঃখসাগরের তরঙ্গাবলী লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার তনু ও মন তাঁহার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুলিত। প্রেমাবেশে তিনি দিনে নৃত্যকীর্ত্তন করেন, প্রেমানন্দে নিত্য জগন্নাথ দর্শন করেন, রাত্রিকালে স্বরূপ গোসাঞি ও রামানন্দ রায়ের সহিত কৃষ্ণকথা-রসাস্বাদনে মত্ত থাকেন। জগন্নাথ-দর্শনের ছল করিয়া নানা দেশের লোক নীলাচলের সচল জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসে। মহাপ্রভুর নাম, যশ, গুণ ও খ্যাতি এক্ষণে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বদেশের লোক তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে, তাঁহার শ্রীমুখের একটি কথা শুনিতে, সুদূর দেশ বিদেশ হইতে নীলাচলে আসে। দয়াময় মহাপ্রভুর অসীম দয়াতে কেহই বঞ্চিত হন না। যিনিই তাঁহাকে একবার দর্শন করেন, যিনিই তাঁহার শ্রীমুখের একটি মাত্র কথা শুনেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—মনুষ্যের বেশ ধারণ করিয়া দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ সকলে নীলাচলে আসিয়া সচল জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রেমে মত্ত হন (১) তিনি তাঁহার গম্ভীরা

(১) মনুষ্যের বেশে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সপ্ত পাতালের যত দৈত্য বিষধর ॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন।
প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস, শুকাদি মুনিগণ।
আসি প্রভু দেখে, প্রেমে হয় অচেতন ॥ চৈঃ চঃ

মন্দিরের মধ্যে ভজনে উন্মত্ত থাকেন, বাহিরে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন লালসায় একত্রিত হইয়া তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু হে। করুণৈক সিন্ধু হে! পতিতপাবন হে! একবার দেখা দাও" ভক্তবৎসল মহাপ্রভু অমনি শ্রীহস্তে জপমালা ধারণ করিয়া শ্রীমন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং গদগদ কণ্ঠে কহিলেন "কৃষ্ণ কহ"।

বাহিরে হুকারে লোক দর্শন না পাঞা,

"কৃষ্ণ কহ" বলে প্রভু বাহির হইয়া॥ চৈ: চ:

মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া সর্ব্বলোক প্রেমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল। তাহাদিগের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। এইরূপে স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু নীলাচলে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ করিতেছেন এবং সাক্ষাৎ দর্শন-দানে ত্রিজগতের লোকের ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয় জুড়াইতেছেন। এই সময়ে একটি বৈষয়িক সম্বন্ধ লইয়া একজন ভক্ত একদিন মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন "প্রভু হে! বড় রাজপুত্র পুরুষোত্তম তোমার রায় রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথকে চাঙ্গে (১) চড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ বিনাশ নিশ্চয়। ভবানন্দরায় সগোষ্ঠি তোমার সেবক। তাঁহার পুত্রকে তুমি রক্ষা না করিলে আর তাহার নিস্তার নাই"। মহাপ্রভু গম্ভীরভাবে কহিলেন,"রাজা কেন গোপীনাথকে এত তাড়না করিতেছেন? ইহার কারণ কি? আমাকে খুলিয়া বল"। তখন সেই ভক্তটি মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ নিবেদন করিলেন। "গোপী-নাথ রায় রামানন্দের সহোদর ভ্রাতা। তিনি রাজা প্রতাপ-রুদ্র সরকারে চাকরী করিতেন,—রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁহার উপর। তিনি দুই লক্ষ কাহন কড়ির জন্য রাজসরকারে দায়ী। রাজা যখন এই বাকি টাকা দিবার জন্য গোপীনাথকে আদেশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন "আমার হাতে ত কিছু নাই সকলি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি,—আমার সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি যাহা আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দিব"। এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিজের দশ বারটি উত্তম অশ্ব রাজদ্বারে আনিয়া দিলেন। রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য জানি-তেন, সেইজন্য রাজা তাঁহাকে ঘোড়ার দর করিতে পাঠাইয়া দিলেন। রাজপুত্র গোপীনাথের অশ্বের ন্যায্য মূল্য কিছু হ্রাস করিলেন। ইহাতে তাঁহার বড় রাগ হইল। রাজ-পুত্রের একটি মুদ্রাদোষ ছিল তিনি ঘাড় ফিরাইয়া মধ্যে মধ্যে উর্দ্ধদেশে চাহিতেন। গোপীনাথ রাজপুত্রকে সগর্ব্বে উপহাসসূচক বাক্যে কহিলেন—

আমার ঘোড়ার গ্রীবা উচ্চ, উর্দ্ধে নাহি চায়;

তাতে ঘোড়ার মূল্যমূল্য করিতে না যুয়ায়॥ চৈঃ চঃ

রাজভৃত্যের মুখে এই উপহাসবাক্য শুনিয়া রাজপুত্রের মনে দারুণ ক্রোধ হইল তিনি রাজার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন এবং অতিরঞ্জিত করিয়া গোপীনাথের অপরাধ তাঁহার কাণে উঠাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গে চড়াইবার আজ্ঞা লইলেন। রাজা বলিলেন, যে উপায়ে পার রাজকর আদায় কর।" মহাপ্রভু এক্ষণে গোপীনাথের অপরাধ বুঝিলেন এবং রোষভরে কহিলেন "রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া খাইয়াছে, রাজা সাজা দিয়াছেন, ইহাতে রাজার দোষ কি? বেশ্যা ও নর্ত্তকীকে দিয়া রাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইতেছে (১)। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে।"

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময় আর একজন লোক দৌড়িতে দৌড়িতে মহাপ্রভুর বাসায় আসিয়া তাঁহাকে কহিল "বাণীনাথ প্রভৃতি সকলকে রাজাজ্ঞায় বান্ধিয়া লইয়া গেল"। বাণীনাথ মহাপ্রভুর একজন একান্ত ভক্ত, তিনিও রামানন্দরায়ের ভ্রাতা। মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া কহিলেন "আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী এবং ভিখারী, আমি

(১) "চাঙ্গে চড়ান" কথাটি প্রাচীন কথা। গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলে তাৎকালিক প্রথা অনুসারে রাজাজ্ঞায় একটি উচ্চমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া অপরাধীকে তাহার উপর চড়ান হইত। মঞ্চের নিম্নদেশে শাণিত খড়্গাদি রক্ষিত হইত। উপর হইতে অপরাধীকে নিম্নে সজোরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার প্রাণবধ করা হইত। ইহার নাম চাঙ্গে চড়ান।

(১) রাজ বিলাতসাধি খায় নাহি রাজভয়।
দারী, নাট্য়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়॥ চৈ: চ:

তাহার কি করিব ?"। তখন স্বরূপগোসাঞি প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ সকলে মিলিয়া মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

' রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস ॥" চৈঃ চঃ

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে বড় রাগ হইল। তিনি সক্রোধ-বচনে উত্তর করিলেন—

মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাই রাজ স্থানে
তোমা সবার এই মত রাজ ঠাই যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই আমি আঁচল পাতিয়া ॥
পাচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ॥
মাগিলে বা কেন দিবে দুই লক্ষ কাহন ?" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর এই শেষ ও রোষপূর্ণ বাক্যদণ্ড পাইয়া স্বরূপ গোসাঞি প্রভৃতি ভক্তগণ অধোবদনে রহিলেন। এমন সময় আর একজন লোক ছুটিতে ছুটিতে সেখানে আসিয়া কহিল "শাণিত খড়্গের উপর গোপীনাথকে ফেলিয়া দিতেছে,— সর্ব্বনাশ হইল।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ভক্তগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাহারা পুনরায় তাহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া চরণে ধরিয়া কহিলেন "প্রভু হে! এ বিপদে তুমি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে ?" মহাপ্রভু তখনও স্থিরভাবে ক্রোধান্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি উত্তর করিলেন "আমি ভিক্ষুক। আমা দ্বারা কিছুই হইতে পারে না, তবে যদি তোমাদের মন হইয়া থাকে তাহাকে রক্ষা করিবে, তবে সকলে মিলিয়া জগন্নাথদেবের চরণে ধর, তিনি সকলি করিতে সমর্থ" (১)। এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে আর কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ রাজমন্ত্রী হরিচন্দনের নিকট গিয়া এই সকল কথা কহিলেন। হরিচন্দন রাজাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে মহাপ্রভুর প্রের-ণায় তিনি আদেশ করিলেন "গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত হউক, তাহার নিকট বাকী টাকা ক্রমশঃ আদায় করা হউক"। রাজাজ্ঞায় গোপীনাথের প্রাণ বাচিল, তাঁহার ঘোড়ার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। তাঁহার ভ্রাতা বাণী নাথ বন্ধনমুক্ত হইলেন।

যে লোক বাণীনাথের বন্ধনের সমাচার লইয়া আসিয়া-ছিল, তাহাকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—

' বাণীনাথ কি করে যবে বান্ধিয়া আনিল ?"
সে লোকটি উত্তর করিল—

———' নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম ॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতের অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈল অঙ্গে কাটে রেখা ॥" চৈঃ চ.

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল।

মহাপ্রভু এই যে লীলারঙ্গ করিলেন,—ইহা নিগূঢ় রহস্য পূর্ণ। তিনি গোপীনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া গৃহী ভক্তদিগকে শিক্ষা দিলেন অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন, বা রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া আত্মসাৎ করা, মহাপাপ। আর সেই পাপ করিয়া যখন লোক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহা সন্তুষ্টচিত্তে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহা না করিয়া শ্রীভগ-বানের নিকট "আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিলে কোন ফলোদয় হয় না। আর এক কথা অসৎব্যক্তি ভক্তই হউন, আর অভক্তই হউন, পাপের শাস্তি তাহাকে লইতেই হইবে। গোপীনাথ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা, ভবানন্দের পুত্র, মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়-সম্পর্কে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। সেইজন্য রামানন্দের দোহাই দিয়া ভক্তগণ গোপীনাথকে বাঁচাইবার জন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরক্ষক মহাপ্রভু ধর্ম্মের মর্য্যাদা, রাজনীতির মর্য্যাদা, রাজার গৌরব এক্ষেত্রে সকলি রক্ষা করিলেন। গোপীনাথ দোষী, তাঁহার উপযুক্ত শাস্তির প্রয়োজন, এবং সেই শাস্তি রাজা তাঁহাকে দিয়াছেন বা দিতেছেন, তাহাতে বাধা দেওয়া অন্যায়, এই বিবেচনায় মহাপ্রভু নিরপেক্ষভাবে ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া রাজাজ্ঞার

(১) প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু নহে।
তবে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি যাহ জগন্নাথের চরণে ॥
ঈশ্বর জগন্নাথ যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তু মকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ ॥ চৈঃ চঃ

সম্মান রক্ষা করিলেন। ভক্তের ভ্রাতা বলিয়া গোপীনাথের প্রতি সকল ভক্তগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধসত্ত্বেও তিনি প্রত্যক্ষে কোনরূপ কৃপা প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু তিনি ভক্ত-বৎসল, ভক্তের সম্বন্ধ মানেন, পরোক্ষে প্রেরণা দ্বারায় হরিচন্দনকে দিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের মন শান্ত করিলেন এবং কৌশলে রাজার দ্বারাই রাজাজ্ঞা খণ্ডন করাইলেন। পরম কৌশলী মহাপ্রভু কৌশল করিয়া চারিদিক বজায় রাখিলেন, চতুরচূড়ামণির চতুরতা বুঝিবার শক্তি কাহার আছে? এবং কৃপাময় মহাপ্রভুর কৃপার মর্ম্মই বা কে বুঝিতে পারে? পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

"কে বুঝিতে পারে গোরের কৃপার ছন্দবন্ধ?"

সকলি তাঁহার কৃপা,—তাঁহার অনুগ্রহ ও নিগ্রহ উভয়ই কৃপা। ভ্রমবশতঃ জীবে তাহা বুঝিতে পারে না। এই জন্যই জীবের এত দুঃখ এবং হাহাকার। মঙ্গলময় ভগবানের সকল কার্য্যই মঙ্গলময়, করুণাময় মহাপ্রভুর সকল লীলারঙ্গই জীবের কল্যাণশিক্ষার জন্য,—এই কথা বুঝিতে পারিলেই জীবের দুঃখের মূল উৎপাটিত হয়,—হাহাকারের চির অবসান হয়।

মহাপ্রভুর নিকট সংবাদ আসিল রাজ-আজ্ঞায় গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে,—বাণীনাথের বন্ধন মুক্ত হইয়াছে, ভক্তবৃন্দ আনন্দে তাঁহার জয়জয়কার দিতেছেন, রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই সময়ে কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর নিকটে আসিলেন। তিনি রাজগুরু, তাঁহারই বাটীতে মহাপ্রভুর বাসা। মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করেন এবং সম্মানও করেন। মহাপ্রভু মহা উদ্বেগপূর্ণ বচনে সেদিন তাঁহাকে কহিলেন "মিশ্র' আর আমি এখানে থাকিতে পারি না, আমি আলালনাথে যাইব মনে করিতেছি। এখানে নানা উপদ্রব, কোন প্রকার শান্তি নাই। ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সকলেই রাজ সরকারে কর্ম্ম করেন, রাজার টাকাকড়ি নষ্ট করেন, রাজার কি দোষ? তিনি দণ্ড দেন,—আজ গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়াছিলেন। বাণীনাথকে বন্ধন করিয়াছিলেন। জগন্নাথ তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন! কিন্তু আমার নিকট চারিবার লোক আসিয়াছিল,—আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, নির্জ্জন কুটীরে বাস করি। আমি কি করিতে পারি? বিষয়ীর বিষয়-কথা শুনিয়া আমার মন ক্ষুব্ধ হয়, ভজনে বিঘ্ন হয়, এই জন্য এখানে থাকা আমি আর যুক্তিসিদ্ধ মনে করি না"। কাশীমিশ্র পরম পণ্ডিত এবং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ। তিনি মহাপ্রভুর হৃদয়ের বেদনা বুঝিলেন, মনের ভাব বুঝিলেন। তাঁহার চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন "প্রভু হে! ইহাতে তুমি মনে ক্ষোভ কর কেন? তুমি বিরক্ত সন্ন্যাসী। তোমার সঙ্গে কাহার সম্বন্ধ? বিষয় ব্যবহারের জন্য তোমাকে যে ভজনা করে, সে অজ্ঞান,—সে মোহান্ধ।

তোমার ভজনফল তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি যে তোমারে ভজে সেই মূঢ় জন॥

* * * * * *

সেই শুদ্ধ ভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগ ভাগী॥ চৈঃ চঃ

রামানন্দ তোমার জন্য দাক্ষিণাত্যের রাজ্য ছাড়িলেন,—সনাতন বাদসাহের মন্ত্রীত্বপদ তুচ্ছ করিলেন,—রঘুনাথ দাস, বার লক্ষ টাকা আয়ের বিষয় মলমূত্রবৎ ত্যাগ করিলেন। রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথও তোমার ভক্ত, তোমার নিকট বিষয় লাভের আশায় তিনি আসেন নাই। তাহার দুঃখ দেখিয়া তাঁহার লোক জন তোমার চরণে তাহার দুঃখ নিবেদন করিতে আসিয়াছিল মাত্র। তোমার কৃপাকটাক্ষ পাইলেই তাহারা চরিতার্থ হয়। প্রভু হে! তুমি এখানেই থাক, আলালনাথে যাইও না,—কেহ আর তোমার কর্ণে বিষয়ের কথা তুলিবে না। তোমার যদি কাহারও মন রাখিবার ইচ্ছা হয়, আজ যিনি গোপীনাথকে রক্ষা করিলেন, তাঁহার দ্বারাই সে কার্য্য সিদ্ধি হইবে"। মহাপ্রভু অধোবদনে কাশীমিশ্রের কথা গুলি মন দিয়া শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কাশীমিশ্র মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন।

কাশীমিশ্রের কথাগুলি অতি সারবান। মহাপ্রভু তাহা বুঝিলেন, এবং ইহা দ্বারা তাঁহার মনের উদ্বেগ কথঞ্চিত

জ্যেষ্ঠপুত্র পুরুষোত্তমকে অপমানসূচক কথা বলিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় এই জন্যই কুমার তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আপনি যেমন করিয়া হউক মহাপ্রভুকে এখানে রাখিবার বন্দোবস্ত করুন, আমি গোপীনাথের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলাম'। কাশীমিশ্র পুনরায় কহিলেন "প্রাপ্য টাকা ছাড়িলে মহাপ্রভুর মন তুষ্ট হইবে না"। রাজা উত্তর করিলেন "টাকা ছাড়িয়া দিব, একথা তাঁহাকে বলিবেন না, বলিবেন রাজা তাঁহার দোষ মার্জ্জনা করিয়াছেন। ভবানন্দ রায় আমার পূজনীয়, তাঁহার পুত্রগণ আমার প্রিয় বান্ধব"। এই কথা বলিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র গুরুদেবের চরণধূলি লইয়া সে দিনের মত বিদায় হইলেন।

গৃহে গিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র গোপীনাথকে রাজদরবারে ডাকাইয়া আনিলেন এবং কহিলেন "গোপীনাথ! তোমাকে বাকি টাকার দায় হইতে আমি অব্যাহতি দিলাম। তোমাকে পুনঃ চাকুরীতে বাহাল করিলাম, এবং তোমার বেতন দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিলাম। এমন কাজ আর করিও না।" এই বলিয়া রাজা তাঁহাকে বিশিষ্ট রাজপরিচ্ছদে ভূষিত করিলেন। গোপীনাথ পরমানন্দে রাজাকে বন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহাপ্রভুর কৃপার মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আমাদের কিছু নাই, তবুও আমরা তাহা বুঝিতে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিব। রামানন্দ রায়ের সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা গোপীনাথের উপর মহাপ্রভুর কৃপার সীমা নাই,—কৃপাবিন্দু হইতে ক্রমে ক্রমে কৃপাবৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। পরমার্থভাবে মহাপ্রভু বহু ভক্তকে কৃপা করিয়াছেন, তাহার কথা কি, সে কথা এস্থলে বলিতেছি না। বিষয়ভোগ দিয়াও মহাপ্রভু তাঁহার বিষয়ী গৃহী ভক্তগোষ্ঠীকে কৃপা করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি প্রাণে মরিবেন,—ইহা তিনি নিশ্চিত করিয়াছিলেন,—সেই স্থলে তিনি জীবন দান পাইলেন,—পুনরায় সেই উচ্চ পদ পাইলেন,—তাঁহার বেতন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি রাজসম্মানে সম্মানিত হইলেন। মহাপ্রভুর এই অসীম কৃপার অনুভূতি তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন, আর বিপদবারণ মহাপ্রভুর সুশীতল চরণকমল স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাব একেবারে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইল,—অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইল,—তাঁহার নয়নজলে সর্ব্ব পাপ বিধৌত হইল। তিনি মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত হইলেন এবং অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিয়া ভজনে মন দিলেন। তিনি আর বিষয়বিষে মগ্ন হইলেন না। মহাপ্রভুর এই কৃপাদৃষ্টিপ্রভাবে রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীর গৌরাঙ্গভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল।

মহাপ্রভুর এই লীলারঙ্গটির মধ্যে আর একটি নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। গোপীনাথকে বিষয়সুখ দিতে তাঁহার আদৌ মন ছিল না, কিন্তু কাশীমিশ্রের ইচ্ছায় ও নিবেদনপ্রভাবে মহাপ্রভুর মন টলিল। তিনি গোপীনাথকে বিষয়সুখ দান দিলেন ভক্তের নিবেদন ভক্তের ভগবান রক্ষা করেন, ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে শ্রীভগবানের নিজ সংকল্প পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হয়। ইহার প্রমাণ ভক্তিগ্রন্থে শত শত পাওয়া যায়। ভক্তের নিবেদনের প্রভাব-বলে যে ফল ফলে, তাহা দ্বারাও হৃদয় শোধিত হয়। গোপীনাথের বিষয়প্রাপ্তি তাঁহার ভজনের সহায় হইল, তিনি এই ভগবদ্দত্ত বিষয় ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া যুক্তবৈরাগ্যবান হইয়া অনাসক্ত ভাবে ভগবদ্ভজন করিতে লাগিলেন শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের নিবেদন-প্রভাবের যে অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য মহাপ্রভু এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গটি প্রকট করিলেন। এই জন্যই পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা শিব আদি যার না পায় অন্তর্ভাব॥

কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গভক্ত। তিনি তাঁহার নিকট কিছুই গোপন করেন না। রাজা প্রতাপ-রুদ্র গোপীনাথ সম্বন্ধে যাহা যাহা করিলেন, সে সকল কথা আনুপূর্ব্বিক কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট অকপটে বলিলেন

দয়াময় মহাপ্রভু শুনিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে কহিলেন 'কাশীমিশ্র! তুমি এ কি করিলে? তুমি আমাকে রাজ প্রতিগ্রহ করাইলে?' অর্থাৎ আমার খাতিরে রাজা গোপীনাথকে যেরূপভাবে দয়া করিয়াছেন,—তাহাতে তাঁহার আমাকেই দয়া করা হইয়াছে,—বিষয়সুখ যাহা তিনি গোপীনাথকে দিয়াছেন,—তাহা আমাকেই দেওয়া হইয়াছে, অতএব আমারই রাজপ্রতিগ্রহ স্বীকার করা হইল, আমি সন্ন্যাসী,—আমার ধর্ম্মনষ্ট হইল।" মহাপ্রভুর শ্রীমুখের কথার এই ভাবার্থ।

কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর চরণে করযোড়ে নিবেদন করিলেন "প্রভু হে! রাজা অকপটে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন,—তাঁহাকে সম্মান করিয়াছেন,—তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন,—রাজকর দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন। ভবানন্দরায় রাজার প্রিয়বন্ধু, তাঁহার গোষ্ঠীর উপর রাজার চিরদিনের প্রীতিসম্বন্ধ। সেই প্রীতিসম্বন্ধে তিনি এরূপ করিয়াছেন। তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। তোমার জন্য তিনি এ কার্য্য করেন নাই"। কাশীমিশ্রের বচন-কৌশলজালে মহাপ্রভুর মন শান্ত হইল। ভক্তের ভগবান ভক্তের নিকট চিরদিন পরাজিত। ইহাই দেখাইবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ প্রভু কাশীমিশ্রের কথায় ভুলিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের সদাশয়তার পরিচয় পাইয়া মহাপ্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল।

এই সকল কথা যখন মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের সহিত কহিতেছিলেন,সেই সময় ভবানন্দ রায় তাঁহার পঞ্চপুত্রের সহিত মহাপ্রভুর বাসায় আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলতলে সকলে মিলিয়া দীঘল হইয়া পড়িলেন। দয়াময় মহাপ্রভু ভবানন্দকে শ্রীহস্তে ধরিয়া উঠাইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। ভবানন্দ রায় তখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন।

"তোমার কিঙ্কর এই মোর সব কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল॥
ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে।
পূর্ব্বে যৈছে পঞ্চ পাণ্ডব বিপদে তারিলে'॥ চৈঃ চঃ

রামানন্দ রায়, বাণীনাথ, গোপীনাথ প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতায় মহাপ্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া ব্যাকুলভাবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু সকলকে একে একে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। সকলকেই বসিতে আদেশ করিলেন।

ভবানন্দ রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গচরণে তাঁহার অচলা ভক্তি। রামানন্দ এবং বাণীনাথ বিষয়সংস্রব ত্যাগ করিয়া যে মহাপ্রভুর সেবা করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার মনে বড় আনন্দ। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার পাচটি পুত্রকেই মহাপ্রভু আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদিগের বিষয় সম্বন্ধ ঘুঁচাইয়া দেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও তিনি বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করেন,—তিনি মনের কথা মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন,—"প্রভু হে! তোমার শ্রীচরণ স্মরণের ফলে গোপীনাথের জীবনরক্ষা হইয়াছে, সে বিষয়-ভোগ পাইয়াছে, কিন্তু দয়াময় হে! তোমার চরণকমল স্মরণের ইহাই ফল নহে,—ইহা ফলাভাস মাত্র। তুমি কৃপা করিয়া রামানন্দ ও বাণীনাথকে নির্বিষয় করিয়াছ, আমার এবং আমার অন্য তিনটিপুত্রের প্রতি কৃপা করিয়া আমাদিগকেও এই বিষময় বিষয়কূপ হইতে কেশে ধরিয়া উদ্ধার কর,—তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা (১)। বিষয়সম্বন্ধ দূর না হইলে তোমার চরণে শুদ্ধা মতি হইতে পারে না"। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া মধুময় ভাষে উত্তর করিলেন--

——"সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ব বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ॥
মহা বিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি মোর সব নিজ দাস॥"

গোপীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া মহাপ্রভু কহিলেন—
কিন্তু এক করিহ মোর আজ্ঞার পালন।
ব্যয় না করিহ কভু রাজার মূলধন॥

(১) রাম রায় বাণীনাথে কৈলে নির্বিষয়।
সেই কৃপা মোরে নাহি যাতে ঐছে হয়॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হৈলে মোতে বিষয় না রয়॥ চৈঃ চঃ

সে মন করিহ নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়।

অপব্যয় না করিহ,যাতে দুঃখ লোক পায়॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর এই উপদেশগুলি গৃহী বৈষ্ণবের প্রতি প্রযুজ্য। তিনি ভবানন্দ রায়কে বলিলেন গৃহস্থের পাঁচটি পুত্রই যদি সন্ন্যাসী হইবে, তাহা হইলে সংসার প্রতিপালন করিবে কে? আত্মীয় স্বজন ভরণপোষণ করিবে কে? তুই পুত্র বিষয়-মুক্ত হইয়াছে,—ইহাই যথেষ্ট। মহাপ্রভু আর একটি কথা বলিলেন, তাহা নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যপূর্ণ। তিনি ভবানন্দ রায়কে বলিলেন, "তোমরা আমার জন্মে জন্মান্তরের দাস, তোমরা মহা বিষয়ীই হও,আর বিরক্ত উদাসীনই হও, আমার কৃপা তোমাদের উপর সর্ব্বকাল সমভাবে থাকিবে"।

এখন একটু তত্ত্বকথা বলি শুনুন। লীলাকথা লিখিতে বলিতে তত্ত্ববিচার এবং সিদ্ধান্তকথা তুলিলে রসভঙ্গ হয় কিন্তু তত্ত্বকথাও প্রয়োজনীয়,—এ সকল কথা শুনিতে আলস্য করিলে চলিবে না। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।

ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।

চৈতন্যমহিমা জানি এসব সিদ্ধান্তে।

চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে॥

গোস্বামীপাদে লিখিত আছে ভবানন্দ রায়ের পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডব। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যদাস। "ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই" শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এক বস্তু, সুতরাং ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী রামানন্দাদি পঞ্চ ভ্রাতা মহাপ্রভুর নিত্য দাস। নিত্য-দাসবৃন্দ শ্রীভগবানের পার্ষদ। সর্ব্বোত্তম নরলীলার সহায়তার জন্য তাঁহারা শ্রীভগবানের অবতারকালে তাঁহার সঙ্গে ভূতলে অবতীর্ণ হন এবং লীলাবসানে তাঁহার সঙ্গে নিত্যধামে চলিয়া যান। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কথা। নিত্য দাসগণকে শ্রীভগবান যে ভাবে ভূতলে আনয়ন করেন, যে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, তাহাই তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বোত্তম এবং তাহাই শ্রীভগবানের পরম প্রেষ্ঠ। তিনি কাহাকেও বিষয়ী করিয়াছেন,—কাহাকেও পরম উদাসীন বৃত্তি দিয়াছেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহারা শ্রীভগবানের দাস,—কেহ মহা বিষয়ী হইয়াও সম্পূর্ণ অনাসক্ত-ভাবে ভগবানের সংসার পুষ্ট করিতেছেন, আবার কেহ বা মহা বিরক্ত সন্ন্যাসীভাবে উদাসীন থাকিয়া জগতের উপকার এবং ভগবদ্ভজন করিতেছেন। সদ্ধর্ম্মরক্ষক মহাপ্রভু ইহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন—

মহা বিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস।

জন্মে জন্মে তুমি মোর সব নিজ দাস॥

তাহার পর তিনি গোপীনাথকে বিষয়ব্যবহারের কথা তুলিয়া উপদেশ দিলেন, তাহা শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তম নর লীলার সম্পূর্ণ পরিচায়ক।

মহাপ্রভুর উপদেশামৃত পানে ভবানন্দ রায় ও তাঁহার পঞ্চ-পুত্রের মনপ্রাণ তৃপ্ত হইল,—ভবকূপের নিবৃত্তি হইল। মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে নিপতিত হইয়া তাঁহার চরণমধু পান করিতে লাগিলেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। দয়ার সাগর ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে শ্রীহস্তে উঠাইয়া একে একে সকলকে প্রেমা-লিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া বিদায় দিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ভবানন্দের গোষ্ঠীর প্রতি মহাপ্রভুর এই কৃপা দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন—

সবা আলিঙ্গিয়ে প্রভু বিদায় যবে দিলা।

হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা॥ চৈঃ চঃ

শ্রীভগবান ভক্তের বংশ মানেন,—ইহা বড় আশার কথা। যে কোন পরিবারের মধ্যে যদি একটি ভগবানের দাস জন্ম গ্রহণ করেন তিনি শুধু আত্মগোষ্ঠী উদ্ধার করেন তাহা নহে, ঊর্দ্ধ এবং অধস্তন সাতপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করেন,—ইহা শাস্ত্র বাক্য (১)। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহার সম্বন্ধে তিনি তাঁহার গোষ্ঠীর প্রতি যে কৃপা দেখাইলেন, তাহা ভক্তবাৎসল্যের সীমা। গৃহী বৈষ্ণবের প্রতি মহাপ্রভুর অপার কৃপা,—সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই

(১) কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ং॥
পদ্মপুরাণ।

লীলারঙ্গটীতে তিনি গৃহী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বুঝাইলেন,—এবং তাঁহাদিগের উপর তাঁহার কৃপার অবধি দেখাইলেন। গৃহী বৈষ্ণব অনাসক্তভাবে সংসার করিয়া শ্রীভগবানের চরণ-কমলে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ। তিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়শূন্য, ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়াও ভোগস্পৃহাশূন্য, প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও নির্লোভী, পদ্মপত্রে জল যেমন লাগে না,—সেইরূপ সাংসারিক কোন আসক্তি-বন্ধনেই তিনি বদ্ধ নহেন। তিনি সর্ব্ববৈরাগ্যবান মহাযোগী এবং সংসারনির্লিপ্ত মহাপুরুষ। শ্রীবাসপণ্ডিত, শিবানন্দসেন, মুরারিগুপ্ত, পণ্ডিত বিদ্যানিধি প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ ভক্তগণ এই শ্রেণীর মহাজন। শ্রীগৌর ভগবানের কৃপা এই শ্রেণীর গৃহীভক্তগণ প্রাপ্ত অধিক। ঠাকুর নরোত্তম দাস লিখিয়াছেন—

গৃহস্থ বৈষ্ণবের দেহ শুদ্ধ যে প্রকার।
পদ্মপত্রে নীরে যেন না লাগে উপর।

মহাপ্রভুর অপার্থিব লীলারঙ্গ বর্ণনার শক্তি কাহারও নাই। তাঁহার চরিত্র যেমন গম্ভীর, তাঁহার লীলারঙ্গও তদ্রূপ গম্ভীর। তাঁহার চরিত্র যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই মহাপ্রভুর লীলারঙ্গের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। এক একটি লীলারঙ্গে তিনি প্রায় সমস্তটি কার্য্যোদ্ধার করেন, তাঁহার সকল লীলারঙ্গই লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাকথা মধু হইতেও মধু এবং পরম গুহ্য,—বেদাতীত। শ্রীভগবানের লীলারহস্যও বেদগুহ্য। একথা আমার নহে, মহাজনগণ ইহা বিচার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"চারি বেদ গুপ্তধন চৈতন্যের কথা।"

অতএব কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! গৌরাঙ্গলীলা অনুশীলন ও অনুধ্যান করুন। শ্রীভগবানের নিজস্ব সম্পত্তি চির-গুপ্ত-বিত্ত যে অমূল্য প্রেমধন ইহা পাইবার একমাত্র উপায়, তাঁহার লীলামধুপান এবং তাঁহার লীলামধুপ-ভক্তগণের সঙ্গ। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

চৈতন্য চরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান॥

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

নদীয়ার ভক্তগণ পুনরায় নীলাচলে,—শিবানন্দ সেনের প্রতি কৃপা,—বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের মহিমা,—গৌরাঙ্গ ও বিভীষণ সংবাদ।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে হয় মহামহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ চৈঃ চঃ

আর একবৎসর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে নদীয়ার ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পুনরায় নীলাচলে আসিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার দিব্যোন্মাদাবস্থা, কৃষ্ণবিরহদশাগ্রস্ত হইয়া তিনি রাত্রিদিনে ব্যাকুলভাবে কেবল বলিতেছেন—

"হাহা কৃষ্ণ! প্রাণনাথ! ব্রজেন্দ্রনন্দন!
কাঁহা যাঙ? কাঁহা পাঙ? মুরলী বদন॥"

ইহা ভিন্ন মহাপ্রভুর শ্রীমুখে আর অন্য কথা নাই,—তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া সর্ব্বদা প্রেমনদী বহিতেছে। রাত্রিতে গম্ভীরা মন্দিরে বসিয়া স্বরূপ গোসাঞি এবং রামানন্দ রায় তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণকথা কহেন—তাহাতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহব্যথার কিঞ্চিৎ উপশম হয়। দিবাভাগে তিনি যথারীতি ভক্তসঙ্গ করেন—জগন্নাথ দর্শন করেন। তাঁহার মন অত্যন্ত উদাস,—শরীর ক্ষীণ,—প্রাণে স্বস্তি নাই। এই অবস্থায় নদীয়ার ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দেখিতে নীলাচলে আসিলেন।

পথে আসিতে পরমদয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ এবার

শিবানন্দ সেনের সহিত একটি অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ করিয়াছিলেন, সেটি এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বর্ণনা করিবার বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীচৈতন্যভাগবতে গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীনিতাই-লীলাপ্রেমজলধিতে একপ্রভাবে দেহ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি আর মহাপ্রভুর নীলাচললীলা সম্পূর্ণভাবে লিখিতে পারেন নাই। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আদেশে পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর নীলাচল লীলা কিছু বিস্তার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত শ্রীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেই এই সকল লীলাকথা সংগৃহীত হইল। লীলাকথায় চর্ব্বিতচর্ব্বণদোষ স্পর্শে না। বিশেষতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাকথা ইক্ষুদণ্ডসম, ইহা যত চর্ব্বণ করিবেন, ততই মিষ্ট লাগিবে। চর্ব্বণ না করিলে রসাস্বাদন করা যায় না, আর চর্ব্বিতচর্ব্বণই পরম উপাদেয় রসসম্ভোগ।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে পথে শিবানন্দসেন সর্ব্ববিষয়ে সমাধান করিয়া নীলাচলে লইয়া আসেন। মহাপ্রভুর আদেশে তিনি প্রসাদ এবং [illegible] ভক্তসেবাকার্য্যটি করেন। তিনি ধনী গৃহস্থ, এই কার্য্যে প্রতিবর্ষে প্রভূত ধনব্যয় করেন। গৌড়দেশের ভক্তগণ সকলে একত্রিত হইয়া প্রতিবৎসর শিবানন্দসেনের সঙ্গে নীলাচলে আসেন,—এ বৎসরও পূর্ব্বমত সকল ভক্তগণই আসিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দুই জনেই আসিয়াছেন। শ্রীনিতাইচাঁদের নীলাচলে আসিতে মহাপ্রভুর আদেশ নাই,—তবুও তিনি আসেন। মহাপ্রভুকে না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। বৈষ্ণব-গৃহিণীগণও অনেকে পুত্রকন্যা সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন। শিবানন্দের গৃহিণী তিনপুত্র লইয়া মহাপ্রভু দর্শনে আসিয়াছেন। শ্রীবাসপণ্ডিত চারিভ্রাতা সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন; সঙ্গে মালিনী দেবী আছেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য সস্ত্রীক আসিয়াছেন। শিবানন্দসেন উড়িষ্যাদেশের পথের সকল অনুসন্ধানই রাখেন। পথিমধ্যে যে সকল ঘাটি আছে, তাহা তিনি সকলি জানেন। পথে আসিতে এক ঘাটিতে ঘাটুয়াল নদীয়ার সর্ব্ব ভক্তগণকে আবদ্ধ রাখিল। শিবানন্দসেন স্বয়ং জামিন হইয়া সকলকে ছাড়াইয়া দিয়া স্বয়ং সেই ঘাটিতে একলা আবদ্ধ রহিলেন। ঘাটোয়ালের সহিত টাকা কড়ি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইল। ভক্তগণ এবং বৈষ্ণবগৃহিণীগণ নিকটে গ্রামের মধ্যে বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। শিবানন্দসেন উপস্থিত নাই, বাসা কে ঠিক করিয়া দিবে? শিবানন্দ ভিন্ন এই কার্য্য অন্যের দ্বারা হয় না। অবধূত নিতাইচাঁদও ইহার মধ্যে আছেন বেলাও অধিক হইয়াছে। তিনি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও ব্যাকুল হইয়াছেন। পরম দয়াল নিতাইচাঁদের মনে বড় রাগ হইল। এরাগ অন্য কাহারও প্রতি নহে, তাঁহার প্রিয় ভক্ত শিবানন্দ-সেনের প্রতি। কারণ তিনি অনুপস্থিত, ঘাটি হইতে এখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই। সেখানে তাঁহার স্ত্রী তিনটি পুত্র লইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে শুনাইয়া অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিতাইচাঁদ আজি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহার প্রিয়তম ভক্ত শিবানন্দকে কি বলিয়া গালি পাড়িতে লাগিলেন, তাহা শুনুন,—

> তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল।
>
> ভোখে মরি গেল মোরে বাসা না দেওয়াইল ॥ ৩।১২

পতিস্নেহপরায়ণা শিবানন্দের গৃহিণী স্বয়ং শ্রীনিতাই-চাঁদের শ্রীমুখে এরূপ ভীষণ অভিশাপ বাক্য শুনিয়া অধোবদনে কাঁদিতে লাগিলেন। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই বিষম মনস্তাপ পাইলেন শিবানন্দ গৃহিণীর প্রাণে বিষম আঘাত লাগিয়াছে,—জননীর সম্মুখে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রের প্রতি এরূপ অমঙ্গলসূচক অভিশাপ বাক্য প্রয়োগ বজ্রাপেক্ষাও অধিকতর কঠিন এবং বজ্রাঘাতাপেক্ষাও অধিকতর কষ্টদায়ক। বিশেষতঃ পরম দয়াল নিতাইচাঁদের শ্রীমুখের এই হৃদিবিদারক বিষম বাক্য শ্রবণে শিবানন্দগৃহিণীর কোমল হৃদয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তিনি পুত্র তিনটি ক্রোড়ে করিয়া আকুলপ্রাণে কাঁদিতেছেন, এমন সময়ে শিবানন্দসেন ঘাটি হইতে ফিরিয়া সেখানে আসিলেন। তাঁহার দুঃখিনী গৃহিণী স্বামীর নিকট তখন আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন। নিতাই-চাঁদের চরণাশ্রিত দাস শিবানন্দ এইকথা শুনিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার গৃহিণীকে কহিলেন—

——————"বাউলি ! কেন মরিস্ কান্দিয়া (১)।
মরুক তিন পুত্র মোর তাঁর বালাই লৈয়া ॥" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ "পাগলি ! তুই কেঁদে মরছিস কেন ? আমার তিন পুত্র মরিয়া যাউক তাহাতে কোন দুঃখ নাই, আমার পরম দয়াল সোনার নিতাইচাঁদ সুখে থাকুন"। এই কথা বলিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ নিতাইচাঁদের নিকটে গেলেন। ক্ষুৎপিপাসাকাতর শ্রীনিতাইচাঁদ কিছু দূরে একাকী এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন এখন পর্য্যন্ত তাঁহার ক্রোধের উপশম হয় নাই। শিবানন্দকে দেখিয়াই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সক্রোধে তাঁহাকে এক বিষম পদাঘাত করিলেন (২) শ্রীনিতাইচাঁদের কোটিচন্দ্র সুশীতল পাদ প্রহার কৃপাপ্রাপ্ত শিবানন্দসেন পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাসার সুবন্দোবস্ত করিয়া শ্রীনিতাইচাঁদের চরণে ধরিয়া সেখানে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন

"আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যৈছে অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা ॥
শাস্তি ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ রেণু
হেন চরণস্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥
আজি সফল হৈল মোর জন্ম কুল ধর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি অর্থ কাম ধর্ম্ম ॥ চৈঃ চঃ

অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শিবানন্দ সেন যাহা বলিলেন, ইহা অপেক্ষা সর্ব্বোত্তম স্তব,—সর্ব্বোত্তম আত্মনিবেদন,—বৈষ্ণবোচিত সহিষ্ণুতা ও দৈন্যের সর্ব্বোত্তম আদর্শ ধর্ম্মজগতে অতি বিরল। শিবানন্দসেন গৌরাঙ্গগতপ্রাণ, তাঁহার অর্থ, পরমার্থ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও সংসার সুখসম্পদ সব একদিকে, আর শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতি একদিকে। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতা,—তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গচরণে ঐকান্তিকভক্তি, ইহা কেবলমাত্র পরমদয়াল নিতাইচাঁদের কৃপাবলে শিবানন্দসেন তাহা উত্তমরূপ জানেন। শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয় ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ পদছায়া লাভ সুদুর্ঘট, তাহা তিনি উত্তম জানেন। এইজন্যই শ্রীনিতাইচাঁদের নিকট তাঁহার কোমল চরণাঘাত-শাস্তিরূপ করুণা-কণা পাইয়া তিনি প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া মনের সাধে তাঁহার গুণ গাইলেন।

পরমদয়াল নিতাইচাঁদ শিবানন্দের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন, এবং গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন (১)। শিবানন্দ প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণরেণু লইয়া অঙ্গের ভূষণ করিলেন। তাহার পর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবগণের বাসা ঠিক করিয়া দিলেন, এবং আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে স্ত্রীপুত্রের নিকটে যাইয়া নিজের বাসা ঠিক করিলেন।

শিবানন্দের প্রতি অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিতাইচাঁদের এই যে সুকোমল চরণাঘাত,—ইহা কেবল তাঁহার পরীক্ষা মাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গঅবতারে শ্রীনিত্যানন্দ যে কি নিগূঢ় পরম বস্তু, তাহা শিবানন্দ সেন উত্তম জানেন।

"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে" চৈঃ ভাঃ

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর প্রধান পার্ষদ শিবানন্দ তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানিবেন না ত কে জানিবে ? মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তাঁহার ইচ্ছাশক্তি শ্রীনিতাইচাঁদ শিবানন্দকে এই বিষম পরীক্ষা করিলেন। শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের পরীক্ষা সর্ব্বকাল কঠিন শিবানন্দসেন ও তাঁহার পরমা ভক্তিমতী গৃহিণীর নিকট শ্রীনিতাইচাঁদের মহিমা কিছুই অবিদিত নাই ! তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত এই ভীষণ হৃদিবিদারক অভিশাপ বাণী শুনিয়া পুত্রস্নেহবতী শিবানন্দ-গৃহিণীর প্রাণ

(১) পাঠান্তর, "বাউনি ! কেন মরিস্ কান্দিয়া।"
"বাউনি" শব্দ "ব্রাহ্মণী" শব্দের অপভ্রংশ।

(২) উঠি তাঁরে লাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ। চৈঃ চঃ

(১) শুনি নিত্যানন্দপ্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম আলিঙ্গন ॥ চৈঃ চঃ

কাঁপিয়া উঠিবারই কথা —কারণ তিনি স্ত্রীলোক। প্রবাসী স্বামী পুত্রের অমঙ্গলবার্ত্তা শুনিয়া কখন স্থির থাকিতে পারেন না। তাঁহার আত্যন্তিক দুঃখ ও রোদন অত্যন্ত স্বাভাবিক। শিবানন্দসেনের কথা স্বতন্ত্র,—তিনি পরম ভক্ত এবং মহাপুরুষ,—শ্রীনিত্যানন্দচরণে তাঁহার অচলা ও দৃঢ়ভক্তি,—তিনি জানেন ইহা পরমদয়াল নিতাইচাঁদের লীলা,—ইহার মধ্যে গূঢ় রহস্য আছে। আর এক কথা, তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা শ্রীনিতাইচাঁদ অনেক বড়—পুত্র মরিয়া যাউক তাহাতে দুঃখ কি? আমার পরম দয়াল নিতাইচাঁদের চরণে যেন কুশাঙ্কুর না ফুটে,—স্ত্রী মনে ব্যথা পাউক, রোদন করুক না কেন, তাহাতে কি আসিয়া যায়? আমার জীবন সর্ব্বস্ব ধন নিতাইচাঁদ যে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা দুঃখ জগতে আর কি আছে? শিবানন্দের মনের ভাব এইরূপ। এই [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই তিনি স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিলেন,—শ্রীনিতাইচাঁদের চরণে ধরিলেন,—তাঁহার শ্রীচরণাঘাতজনিত [illegible] সহিত মাথায় ধরিয়া লইলেন,—পরে তাঁহার স্তব করিলেন। গৌরাঙ্গ পার্ষদশ্রেষ্ঠ শিবানন্দসেন শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয়। শ্রীনিতাইচাঁদ অগ্রে তাঁহার প্রাণের সহিত গৌরভক্তগণের প্রাণ মিশাইয়া তাহার পর তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে দুই জনে একীভূত হইয়া প্রেমাবেশে ডগমগ হইলেন। শিবানন্দের প্রতি কৃপাবৃষ্টির জন্যই তাঁহার এই পরীক্ষা। গৌরভক্তগণ যে ভগবানের সর্ব্ববিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম, শিবানন্দকে দিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ তাহা দেখাইলেন। শিবানন্দসেনের ভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীচরণাঘাত কৃপা তাঁহার একান্ত নিজজন ভিন্ন কেহ কখন লাভ করিবার সৌভাগ্য পান নাই। শিবানন্দের প্রতি পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার কৃপার অবধি দেখাইলেন। শিবানন্দসেনও তাঁহার এই অযাচিত অপূর্ব্ব কৃপানুভূতি পাইয়া অতি সুস্পষ্ট ভাষায় অকপটে বলিলেন—

"ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥"

কবিরাজগোস্বামী তাই লিখিলেন,—

নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত।

এই অদ্ভুত লীলারঙ্গের একটি পরিশিষ্ট আছে। শ্রীকান্তসেন শিবানন্দসেনের ভাগিনেয়। তিনিও পরম গৌরভক্ত। শিবানন্দ মাতুলের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে নীলাচলে যাইতেছেন। তাঁহার মাতুলের উপর নিতাইচাঁদের এই অদ্ভুত শ্রীচরণাঘাত কৃপাটি দেখিয়া তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার মাতুল শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর প্রধান পার্ষদ বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিনা অপরাধে সর্ব্বসমক্ষে এইরূপভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিলেন ইহাতে শ্রীকান্তের মনে দারুণ ব্যথা লাগিল। তিনি দুঃখে ও অভিমানভরে শিবানন্দসেনের অসাক্ষাতে কোন কোন ভক্তের নিকট বলিলেন—

"চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালী করেন গোসাঞি তাঁরে মারে লাথি॥"

এই বলিয়া তিনি [illegible] এবং অভিমানভরে মাতুলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বরাবর নীলাচলে মহাপ্রভুর সন্নিধানে একাকী গমন করিলেন। যেস্থানে শ্রীনিতাইচাঁদের এই অপূর্ব্ব লীলাভিনয় প্রকটিত হইল, সেখান হইতে শ্রীক্ষেত্র অনেক দূর। শ্রীকান্ত একাকী চলিয়া আসিলেন। তাঁহার গায়ে একটি পেটাঙ্গি (১)। এই বেশে—গায়ে দিয়া শ্রীকান্ত একাকী শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গিয়া মহাপ্রভুর চরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। গোবিন্দ শ্রীকান্তকে বিধিশিক্ষা দিয়া কহিলেন "শ্রীকান্ত! আগে পিরাণ খুলিয়া তবে শ্রীবিগ্রহ বা সাধুবৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিতে হয়"। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু গোবিন্দের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সঙ্কেতে কহিলেন "আহা! শ্রীকান্ত মনঃদুঃখ পাইয়া আমার নিকটে আসিয়াছে, উহাকে কিছু বলিও না উহার যাহাতে সুখ হয়, তাহাই করুক।" (২) ভক্তবৎসল

---

(১) পিরাণ, [illegible] দ্বারা উদর বাঁধিতে হয়।

(২) প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক যাতে উঁহার সুখ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীগৌরভক্তের মনঃদুঃখ বুঝিয়া এইরূপ সস্নেহ বচনে যাহা কহিলেন, তাহাতে শ্রীকান্তের হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল,—সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু যে তাঁহার মনের ভাব সকলি জানিয়াছেন,—তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিয়াছেন,—তাঁহার মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়াছেন,—শ্রীকান্তের আর ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি করযোড়ে নিকটে দাঁড়াইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীকান্তকে ডাকিয়া পরম স্নেহভরে নদীয়ার ভক্তবৃন্দের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকান্ত একে একে সকলের কুশল সংবাদ বলিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতুলের প্রতি শ্রীনিতাইচাঁদের অদ্ভুত কৃপার কথা কিছুই বলিলেন না। কারণ তিনি অনুমানে বুঝিয়াছেন সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু সকলি জানেন। তাঁহার কথার ভাবে তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

ইহার পর যথাকালে নদীয়ার ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভুর সহিত সকলের পূর্ব্ববৎ মিলন হইল। স্ত্রীলোকবৃন্দ দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে পূর্ব্ববৎ গোবিন্দ সকলের বাসা স্থির করিয়া দিলেন; মহাপ্রভুর বাসায় সে দিন সকলের মহাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ হইল।

শিবানন্দসেনের তিন পুত্র এবারে সঙ্গে আসিয়াছেন। দুই পুত্রকে প্রভু পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবানন্দ উত্তর করিলেন "এটি আপনার ভৃত্যানুভৃত্য, ইহার নাম পরমেশ্বরদাস"। পূর্ব্বে যখন শিবানন্দসেন নীলাচলে প্রভুদর্শনে আসিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন এইবার তোমার যে পুত্র সন্তান হইবে, তাহার নাম পুরীদাস রাখিও (১)। প্রভুর শ্রীমুখের আশীর্ব্বাদে গৃহে যাইয়া শিবানন্দসেনের গৃহিণী একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে বালকের নাম রাখিলেন "পরমানন্দ দাস"। এই পুত্রটি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। শিবানন্দসেন এই পুত্রটীকে মহাপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে "পুরীদাস" বলিয়া পরিহাস করিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ কমলের অঙ্গুষ্ঠ তাহার মুখে সমর্পণ করিলেন।

> শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
> মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা॥ চৈঃ চঃ

এরূপ অযাচিত ও অপূর্ব্ব কৃপা মহাপ্রভু এই সর্ব্বপ্রথম শিবানন্দসেনের গোষ্ঠীকে করিলেন। এই বালক তাঁহার শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত শ্রীচরণরজ প্রসাদ পাইয়া অদ্ভুত শক্তিশালী হইয়াছিলেন। ইনিই কবিকর্ণপুর গোস্বামী নামে বৈষ্ণবজগতে বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকার গ্রন্থকার এই মহাপ্রভুর কৃপাসিদ্ধ অপূর্ব্ব বালক। ইনি মহাপ্রভুর কৃপাবলে অসাধারণ কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ কবি তখন আর কেহ ছিলেন না। এই মহাপুরুষের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

শিবানন্দসেন তাঁহার বালকপুত্রের প্রতি মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব কৃপাবৃষ্টি দেখিয়া প্রেমানন্দে গদগদ হইলেন। পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া সস্নেহে পুনঃপুনঃ মুখচুম্বন করিয়া পুনরায় মহাপ্রভুর চরণকমলে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সেন শিবানন্দের প্রতি কৃপানিধি মহাপ্রভুর কৃপাবৃষ্টির এখনও হয় নাই। তিনি গোবিন্দকে নিকটে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন,—

> শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ হেথায়।
> আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। তিনি সর্ব্বদা আত্ম গোপন করিতেন। তিনি যেখানে শ্রীচরণ ধৌত করিতেন, গোবিন্দের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল,—তাঁহার পাদোদক যেন কেহ গ্রহণ করিতে না পারেন। তাঁহার ভোজনাবশেষ গোবিন্দের নিজস্ববস্তু। মহাপ্রভুর এই আদেশবাক্য শিবানন্দসেনের প্রতি তাঁহার পরমা প্রীতির পরিচায়ক।

নদীয়ার ভক্তগণের সঙ্গে পরমানন্দ মোদক বলিয়া নবদ্বীপবাসী মহাপ্রভুর প্রতিবেশী একজন লোক প্রভু-দর্শনে

(১) এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিবে তাহার॥ চৈঃ চঃ প্রভুবাক্য।

আসিয়াছেন। বাল্যকালে মহাপ্রভু এই মোদকের দোকান হইতে অনেক মিষ্টান্ন খাইয়াছেন, তাহার গৃহে বার বার যাইয়া ভক্ষের সর পুরিয়া চাহিয়া খাইতেন (১)। মহাপ্রভুকে এই ভাগ্যবান মোদক বাল্যকাল হইতেই বিশেষ স্নেহ করিত। তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য সে মহা ব্যগ্র হইয়া নীলাচলে সস্ত্রীক আসিয়াছে। পরমানন্দ মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া সভয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভক্তির যোড় করিয়া কহিল "আমি সেই পরমেশ্বরা"। মহাপ্রভু তাহাকে চিনিয়া পরম সমাদরে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরমেশ্বর! তোমাদের কুশল ত? তুমি এসেছ, বড় ভাল হইয়াছে। তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সুখী হইলাম"। পরমেশ্বর উত্তর দিল "মুকুন্দের মাতাও সঙ্গে আসিয়াছে"। মুকুন্দ তাহার পুত্র,—একথা বলিবার উদ্দেশ্য সে সস্ত্রীক নীলাচলে আসিয়াছে। মহাপ্রভু বাল্যকালে পরমেশ্বরের স্ত্রীর বিশেষ পরিচিত ও অনুগত ছিলেন, সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই পরমেশ্বর মোদক এই সংবাদটি তাঁহাকে দিলেন। সে জানে না, মহাপ্রভু এখন স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন ত দূরের কথা, নাম পর্য্যন্ত শ্রীমুখে আনেন না এবং কর্ণে শুনেন না।

মহাপ্রভু একথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সে ভাব কেহ বুঝিল না,—বা তিনি কাহাকেও বুঝিতে দিলেন না। পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতিবশতঃ তিনি এইরূপ করিলেন। পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া মহাপ্রভু তাহাকে সে দিন বিদায় দিলেন। তিনি অন্তরে অন্তরে এই সরল স্বভাব, নদীয়ার ভক্তটির প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। মহাপ্রভুর শুদ্ধ বৈদগ্ধীভাবের মর্ম্ম সে কি বুঝিবে? তাহার এই বাক্য প্রশ্রপ্রশ্রয় প্রাগলভ্য মাত্র। সে মূর্খ, এবং অজ্ঞ লোক। মহাপ্রভুর ভাবের মর্ম্ম সে কি জানে? এই গুণে মহাপ্রভু তাহার সরল ব্যবহারে তাহার প্রতি বড়ই প্রীত হইলেন (২)। পরমানন্দ মোদক সেদিন প্রভুর বাসায় প্রসাদ পাইল। অধরামৃত প্রসাদ লাভে তাহারও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইল। এই মোদক ষড়ঙ্গবেদনিষ্ঠ বিপ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভে তাহার সর্ব্ব পাপ খণ্ডন হইল,—সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইল,—সৌভাগ্যের সীমা রহিল না। পরমেশ্বর একে নবদ্বীপবাসী, তাহাতে মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, তাহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন—

> যে দেখিল চৈতন্যচন্দ্রের অবতার।
> হউক মনুষ্য তবু তারে নমস্কার॥

পরমেশ্বর মোদকের ভাগ্য শিরবিরিঞ্চি বাঞ্ছিত। তাঁহার চরণরেণু জীবাধম গ্রন্থকারের মস্তকের ভূষণ হউক।

নীলাচলে নদীয়ার ভক্তগণসঙ্গে মহাপ্রভু প্রেমানন্দে মগ্ন আছেন। শিবানন্দসেন মধ্যে মধ্যে সপুত্র প্রভু-দর্শনে আসেন। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরীদাস নিতান্ত বালক হইলেও পিতার সহিত প্রভু দর্শনে আসিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র। তাহাকে সঙ্গে লইয়া না আসিলে সে কাঁদিয়া অস্থির হয়। কাজেই নানা অসুবিধা সত্ত্বেও শিবানন্দসেন পুরীদাসকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভুর বাসায় আসেন। মহাপ্রভুও পুরীদাসকে লইয়া নানাবিধ হাস্যকৌতুক লীলারঙ্গ করেন। একদিন তিনি এই বালককে আদর করিয়া নিকটে বসাইয়া পুনঃপুনঃ কহিলেন "কৃষ্ণ কহ"। (১) পুরীদাস নীরব,—কোন কথা কহিল না, মহাপ্রভুর কথার কোন উত্তরই দিল না,—স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। শিবানন্দসেন এবং উপস্থিত ভক্তগণ বালকের এইরূপ জড়বুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। শিবানন্দসেন স্বয়ং বহু যত্ন করিয়াও তাহার বালক পুত্রের মুখ দিয়া কৃষ্ণনাম বাহির করাইতে পারিলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ এবং বিশেষ লজ্জিত হইয়া মহাপ্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি আর চাহিতে পারিতেছেন না। মহাপ্রভু তখন হাসিয়া কহিলেন,—

> —————"আমি নাম জগতে লওয়াইল
> স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল॥
> ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।" চৈঃ চঃ

(১) বালক কালে প্রভু তার ঘর বারে বারে যান।
দুগ্ধখণ্ড মোদক দেন প্রভু তাহা খান॥ চৈঃ চঃ

(২) প্রশ্রয় পাগলভ্য শুদ্ধ বৈদগ্ধ্য না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে॥ চৈঃ চঃ

(১) কৃষ্ণ কহ কবি প্রভু বোলে বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার। চৈঃ চঃ

সেখানে সুচতুর স্বরূপ দামোদর গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই বালকের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন। স্বরূপ গোসাঞি ভজনবিজ্ঞ সিদ্ধ মহাপুরুষ। তিনি মহাপ্রভুকে হাসিয়া কহিলেন,—"প্রভু, তুমি এই বালককে কৃষ্ণ মন্ত্র উপদেশ করিলে, তোমার নিকট মন্ত্রোপদেশ পাইয়া সে কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিতে চাহে না, কারণ মন্ত্র কাহাকেও বলিতে নাই। পুরীদাস মন্ত্র মনে মনে জপ করিতেছে, মুখে প্রকাশ করিতেছে না; আমি অনুমান করি, ইহাই তাহার মনোগত ভাব" (১)। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু স্বরূপ গোস্বামীর এই কথা শুনিয়া মৃদুমন্দ হাসিলেন। শিবানন্দসেনের মনে ইহাতে বড় সন্তোষ হইল, ভক্তগণ ইহা শুনিয়া প্রেমানন্দে উচ্চ হরিধ্বনি করিলেন। শিবানন্দপুত্র মহাপ্রভুর চরণকমল বন্দনা করিয়া পিতার সহিত গৃহে গেল।

শিবানন্দপুত্র পুরীদাসের সহিত প্রভুর এই দ্বিতীয় লীলারঙ্গ। ইহাতে বুঝা গেল শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য কবিকর্ণপুর গোস্বামী। এরূপ মন্ত্রশিষ্য তাঁহার অনেকেই ছিলেন।

এই ভাগ্যবান্ বালকের সহিত মহাপ্রভু আর একটি অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে বর্ণিত হইল। অন্য একদিন পুরীদাস পিতার সহিত প্রভুদর্শনে তাঁহার বাসায় আসিয়াছেন। মহাপ্রভু পূর্ব্ববৎ সস্নেহে বালকের পৃষ্ঠদেশে পদ্মহস্ত দিয়া কহিলেন "পুরীদাস, পড় ত"? সপ্তম বর্ষীয় বালক পুরীদাস তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইল—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম
বৃন্দাবনরমণীণাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

অর্থ। যিনি ব্রজবণিতাবৃন্দের শ্রবণযুগলের কুবলয়, নয়নের অঞ্জন, এবং বক্ষস্থলের ইন্দ্র নীলমণি হার প্রভৃতি নিখিল ভূষণ, সেই বৃন্দাবনবিহারী শ্রীহরি জয়যুক্ত হউক।

মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ সপ্তমবর্ষীয় অশিক্ষিত বালকের মুখে এইরূপ রসের মধুর ভাবপূর্ণ এবং অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ উত্তম শ্লোক শুনিয়া পরমাশ্চর্য্য হইলেন। সর্ব্ব ভক্তগণ শিবানন্দসেনকে ও তাঁহার এই অপূর্ব্ব বালক পুত্রটিকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাবলে এই অপূর্ব্ব বালক প্রসিদ্ধ স্বভাব-কবি হইলেন, এবং এই ভগবদ্দত্ত কবিত্বশক্তিবলে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিবার শক্তি পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কৃপার অপূর্ব্ব মহিমাই এইরূপ। কবিকর্ণপুর গোস্বামীর অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি এবং একনিষ্ঠা গৌরভক্তি তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গলীলা গ্রন্থাবলীর পদে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

নদীয়ার ভক্তগণের সঙ্গে কালীদাস নামক একটি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব প্রভুদর্শনে নীলাচলে আসিয়াছেন। তিনি পরম উদার প্রকৃতির লোক, এবং অতিশয় সরল। কৃষ্ণনাম ভিন্ন তাঁহার মুখে অন্য কথা নাই। সকল কার্য্যেই তিনি সঙ্কেতে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কৌতুকেতে তিঁহ যদি পাশক খেলায়।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহি পাশক চালায়॥

রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতিসম্বন্ধে ইনি খুল্লতাত হন। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ এই মহাপুরুষের জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদযাপন করিতে করিতে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। গৌড়দেশে যত বৈষ্ণব আছেন, সকলের উচ্ছিষ্ট তিনি ভোজন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিয়াছেন (১)। যদি কোন নীচ জাতীয় বৈষ্ণব তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ দানে কুণ্ঠিত হন, তিনি গোপনে এবং কৌশলে তাহা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করেন। ঝড়ুঠাকুর নামে গৌড়ে এক বৈষ্ণব ছিলেন। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি ভুইমালি জাতি ছিলেন। কালীদাসের নিয়ম ছিল, তিনি

(১) তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাইয়া কার আগে না করে প্রকাশে।
মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃ কথা করি অনুমান॥ চৈঃ চঃ

(১) গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তিঁহ করিয়াছে ভক্ষণ॥ চৈঃ চঃ

কোন উত্তম বস্তু ভেট লইয়া বৈষ্ণবদর্শনে যাইতেন। ঝড়ুঠাকুর গৃহী বৈষ্ণব,—তাঁহার গৃহিণী আছেন। কালীদাস কয়েকটি উত্তম আমফল লইয়া ঝড়ুঠাকুরের আশ্রমে গেলেন। পতিপত্নীতে যে স্থানে বসিয়া ছিলেন, উভয়কেই সেই স্থানে নমস্কার করিয়া সেই আম্র কয়টি তিনি বৈষ্ণবসেবার জন্য দিলেন। ঝড়ুঠাকুর কালীদাসকে বহু সম্মান করিয়া আসন দিলেন। তিনি জানেন কালীদাস উচ্চ বংশসম্ভূত এবং পরম ভক্তিমান পুরুষ এবং তিনি ধনী গৃহস্থ। ঝড়ুঠাকুর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বৈষ্ণবোচিত দৈন্যসহকারে নিবেদন করিলেন "আমি হীন জাতি, আপনি সম্ভ্রান্ত বংশজাত, কিন্তু আজ আমার সৌভাগ্যবলে আপনি আমার অতিথি, কি প্রকারে আমি অতিথি সেবা করিব? আপনি যদি আজ্ঞা দেন, আমার প্রতিবেশী কোন ব্রাহ্মণ-গৃহে আপনার প্রসাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া কৃতার্থ হই"। কালীদাস বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, তিনি দৈন্যের অবতার; তিনি করযোড়ে যে উত্তর করিলেন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করুন,—

"———ঠাকুর। কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু পতিত পামরে॥
পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন।
কৃতার্থ হইনু মোর সফল জীবন॥
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পদরজ দেহ, পাদ মোর মাথে ধর॥" চৈঃ

শেষ কথাটি বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের অবধি। ভক্তশ্রেষ্ঠ কালীদাসের শেষ কথাটি শুনিয়া ঝড়ুঠাকুর "বিষ্ণু! বিষ্ণু" বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন এবং মহা সশঙ্কিতভাবে নীরব রহিলেন। কালীদাস বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া বুঝাইলেন বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি মহাপাপ,—চণ্ডাল যদি হরিভক্ত হন, তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,— আপনি কৃষ্ণভক্ত, সুতরাং পূজ্যপাদ এবং আপনার চরণরেণু ও প্রসাদ সর্ব্বথা গ্রহনীয়। ঝড়ুঠাকুর লজ্জিত হইয়া করযোড়ে কহিলেন "আমি নীচ জাতি, আমি কৃষ্ণভক্তিশূন্য, আমার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না, আপনি মহৎ এবং ধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষক,—তাই এই কথা বলিতেছেন।" কালীদাস আর কিছু বলিলেন না, তিনি ঝড়ুঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঝড়ুঠাকুর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কীয়দ্দূর চলিলেন। তিনি গৃহে ফিরিলে, বৈষ্ণবরাজ কালীদাস কি করিলেন শুনুন—

তাঁহার চরণ চিহ্ন যে ঠাঞি পড়িলা।
সেই ধূলি লঞা কালীদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা॥ চৈঃ চ

তিনি সেখানে কি কার্য্য করিলেন। ইহাতেও তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ হইল না। তিনি বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজী। বৈষ্ণবের অধরামৃতলোভে তিনি ব্যাকুল হইয়া ঝড়ুঠাকুরের বাড়ীর নিকটে একটি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ঝড়ুঠাকুর গৃহে যাইয়া কালীদাসদত্ত সেই পক্কাম্রফলগুলি মানসে শ্রীকৃষ্ণভগবানকে নিবেদন করিলেন এবং প্রেমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সুস্বাদু রসাল আমফলের আঁঠিগুলি চুষিয়া চুষিয়া খাইলেন এবং তাঁহার গৃহিণীও সেইরূপে পতিদেবতার মহাপ্রসাদ পাইলেন। পরে আমের খোলা এবং আঁঠি প্রাচীরের উপর দিয়া উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। কালীদাস ধৈর্য্যধারণ করিয়া এই সুযোগটি অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া সেই অপবিত্র গর্ত্ত হইতে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট আম্রের খোলা ও আঁঠি উঠাইয়া লইয়া পরমানন্দে চুষিতে লাগিলেন,—আর প্রেমানন্দে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল, তিনি সর্ব্বাঙ্গে সেই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট মাখিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীরে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদ্গম হইল। ঝড়ুঠাকুর কিম্বা তাঁহার ভক্তিমতী গৃহিণী ইহার বিন্দুবিসর্গ কেহ জানিতে পারিলেন না।

এই বৈষ্ণবদাসানুদাস এবং বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজী মহাপুরুষ কালীদাস প্রভুদর্শনে নীলাচলে আসিয়াছেন। তাঁহার প্রতি মহাপ্রভু কিরূপ কৃপা করিলেন, এক্ষণে তাহাই বর্ণিত হইবে। কালীদাস নিত্য প্রভুদর্শনে যান,—তাঁহার চরণ বন্দনা করেন,—মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি শুভদৃষ্টি-পাত করেন মাত্র, কিন্তু কোন কথা বলেন না। মহাপ্রভু

প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শনে যান,—গোবিন্দ জলপূর্ণ করঙ্গ লইয়া তাঁহার সঙ্গে যান। সিংহদ্বারের উত্তর দিকের কপাটের পশ্চাতে বাইশ পহাচ (১) তলে একটি গর্ত্তের মত নিম্ন স্থান আছে। সেই স্থানে শ্রীচরণ ধৌত করিয়া তবে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে যান। গোবিন্দকে তিনি বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন,—

"মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন"। চৈঃ চঃ

গোবিন্দ এই আদেশ দৃঢ়ভাবে পালন করেন, কেহ সেখান হইতে মহাপ্রভুর পাদোদক গ্রহণ করিতে পারে না। কোন কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছল করিয়া অতি কষ্টে এই সুদুর্লভ বস্তু লাভ করেন। একদিন মহাপ্রভু সেই স্থানে শ্রীচরণ প্রক্ষালন করিতেছেন,—এমন সময় এই কালীদাস সুযোগ বুঝিয়া সেখানে আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণতলে দুই হস্তে অঞ্জলি পাতিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীপাদোদক, এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পান করিলেন, পুনরায় অঞ্জলি পাতিলেন, এমন সময় মহাপ্রভু নিষেধ করিলেন এবং মৃদু মধুর বচনে কহিলেন।

"ইতঃপর আর না করিহ বার বার।

এতাবতা বাঞ্ছা পূর্ণ করিল তোমার॥ চৈঃ চঃ

কালীদাসের জন্য ভক্তের ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু নিজ সংকল্প ত্যাগ এবং নিয়মভঙ্গ করিলেন, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগৌরভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন,— উদর পূর্ণ করিয়া তাঁহার শিববিরিঞ্চি বাঞ্ছিত, শ্রীচরণামৃত ভক্তরাজ কালীদাসকে পান করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য দান করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি মহাপ্রভুর নিকট কালীদাসের গুণাবলী অবিদিত নাই। গুণগ্রাহী এবং ভাবগ্রাহী শ্রীগৌরভগবান তাঁহার পরম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের গুণের আদর করিলেন, কালীদাসের প্রেমভক্তি-পিপাসা মিটাইলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, কালীদাসের প্রধান গুণ বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস এবং বৈষ্ণবচরণে তাঁহার অচলা ভক্তি।

"এই গুণ লঞা প্রভু তারে তুষ্ট হৈলা।

অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥" চৈঃ চৈঃ

কালীদাস মহাপ্রভুর শ্রীপাদোদকপানে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া বাইশ পহাচের দক্ষিণদিকে একটি নরসিংহমূর্ত্তি আছেন,—তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। কালীদাস তাঁহার সঙ্গ ছাড়েন নাই। তিনি তাঁহার পাদোদক প্রসাদ পাইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার অধরামৃত প্রসাদ লালসায় তাঁহার ও তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দের সঙ্গ ছাড়েন নাই। তিনি মহাপ্রভুর আশ্রমের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। মহাপ্রভু তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে সাধু বৈষ্ণবপ্রীতিবৎসল মহাপ্রভু গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন,—কালীদাস যেন অদ্য তাঁহার অবশেষপাত্র পায় (১)। গোবিন্দ পরমানন্দে প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। কালীদাসের আজ সৌভাগ্যের সীমা নাই। তিনি বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট প্রসাদ-ভোজন ফলে, আজ সেই সর্ব্ববৈষ্ণবের অভীষ্টদেব,—সেই সর্ব্বজগতের গুরু,—সেই সর্ব্ব ভক্তের ভগবান, সেই সর্ব্বদেবদেবীর আরাধ্যধন শ্রীগৌরভগবানের অধরামৃতলাভে তিনি পরানন্দে মগ্ন হইলেন। সর্ব্বাঙ্গে মহাপ্রসাদ মাখিয়া মহাপ্রভুর দ্বারদেশে তিনি অপূর্ব্ব প্রেমনৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া প্রেমনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। অশ্রু কম্প স্বেদ স্তম্ভ প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের বিকার লক্ষণ সকল তাঁহার দেহে লক্ষিত হইল। তিনি প্রেমাবেশে আনন্দ স্বরূপ হইলেন।

কৃপানিধি মহাপ্রভু কালীদাসকে তখন নিকটে ডাকাইয়া সস্নেহে কহিলেন "কালীদাস। তুমি ঘৃণা ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ভক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছ। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে"।

শ্রীকৃষ্ণভগবানের অধরামৃতের নাম মহাপ্রসাদ, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট প্রসাদের নাম মহা

(১) পাঠান্তর পাহাচ উড়িয়াগণ সিঁড়ির এক এক ধাপকে পাহাচ বলে। জগন্নাথের সিংহদ্বার দিয়া উঠিতে হইলে বাইশ পাহাচ দিয়া উঠিতে হয়।

(১) মহাপ্রভু ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালীদাসে দিলা প্রভুর শেষপাত্র দানে॥ চৈঃ চঃ

প্রসাদ। ভক্তগণের পদরেণু, এবং পাদোদক ও তাঁহাদিগের পাত্রাবশেষ,—এই তিন বস্তু দ্বারা জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের অঙ্কুর হয়। এইকথা সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষভাবে লিখিত আছে।

"ভক্ত পদধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্তশেষ এই তিন সাধকের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সব্ব শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥" চৈঃ চ

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তারস্বরে কহিয়াছেন,

——"বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এতেক সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালীদাস।"

কালীদাস প্রেমানন্দে গদ গদ হইয়া মহাপ্রভুর চরণতলে দীঘল হইয়া পড়িয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এই যে কালীদাসের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা, ইহা তাঁহার বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভক্ষণের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহাপ্রভুর লীলাসমুদ্রের এক একটী লীলাতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও মর্ম্ম বহু দূরব্যাপী। তিনি বৈষ্ণবচূড়ামণি কালীদাসের গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন এবং সেই সঙ্গে নিজ ভক্তগণকে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনের মহিমা বুঝাইলেন, এবং তাহার ফল হাতে হাতে দেখাইলেন। ঠাকুর নরোত্তমদাস লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাতে মোর স্নান কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাতে মোর মননিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস॥"

শ্রীবৈষ্ণবতিথি ও পর্ব্বোপলক্ষে মহোৎসব হইলে মোহান্ত সাধুবৈষ্ণবগণ এবং পূজ্যপাদ গোস্বামী ভক্তগণ বৈষ্ণব-ভোজনান্তে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের কণিকা তুলিয়া ভক্ষণ করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করেন। জাত্যাভিমান, জ্ঞানগর্ব্ব ও পাণ্ডিত্যাভিমান হৃদয় হইতে দূর না করিতে পারিলে, এরূপ সুমতি হয় না। লজ্জা, মান, ঘৃণা, ভয় মনের মধ্যে থাকিলে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে বিশ্বাস হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মহা মহাপ্রসাদের মর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন, সেইরূপই বুঝিয়াছেন, ফলও তদ্রূপ পাইতেছেন। ভক্তের ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহার ভক্তবৃন্দের মহিমা,—তাঁহাদিগের পাদোদকের মহিমা তাঁহাদিগের পরিধান কৌপীনখণ্ডের মহিমা,—তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্টের মহিমা,—তাঁহাদিগের সঙ্গের মহিমা,—সকলি শাস্ত্রযুক্তিমতে এবং লীলাভিনয়ে নিজগণকে বুঝাইয়া দিয়া স্বয়ং আচরিয়া তিনি বৈষ্ণবসেবা ভক্তবৃন্দকে দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৌপিনখণ্ড বিতরণ-লীলা, তাঁহার পাদোদকসেবন-লীলা, ঠাকুর হরিদাসের মৃতদেহের চরণোদকসেবন-লীলা, শ্রীধরের লৌহপাত্রস্থ অশুদ্ধ জলপান লীলা,—মন্দার পর্ব্বতে শ্রীমধুসূদন সেবকের পাদোদকপান প্রভৃতি লীলারঙ্গ সমস্ত ইহার প্রত্যক্ষ ঠাকুর নরোত্তমদাস তাই দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন

বৈষ্ণব চরণরেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাই ভূষণের অন্ত।
বৈষ্ণব চরণজল, কৃষ্ণভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত॥

মহাপ্রভু লীলারঙ্গে নীলাচলে কৃষ্ণবিরহসাগরে মগ্ন আছেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে তাঁহার এই সময়ের একটী অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ বর্ণিত আছে। তাহাই এস্থলে বিবৃত হইবে। দ্রাবিড় দেশীয় একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই সময়ে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। তিনি দারিদ্র্য-দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া ধনাশায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে ধন্না দিয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সাত দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া কেবল প্রার্থনা করিতেছেন—

ধন বর মাগো প্রভু না হও বিমুখ।
নহিলে জীবন দিব তোমার সম্মুখ॥ চৈঃ মঃ

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কাশীমিশ্রের বাটীতে নিজ বাসায়

ভক্তবৃন্দসঙ্গে কৃষ্ণকথারসে মগ্ন আছেন। হঠাৎ তিনি অন্যমনস্ক হইলেন। তাঁহার শ্রীবদনমণ্ডল অপ্রসন্ন বোধ হইল। তাঁহার ভাব দেখিয়া ভক্তগণের মনে বিস্ময় উপস্থিত হইল। তিনি কিছু খুলিয়া বলিলেন না, ভক্তবৃন্দও সাহস করিয়া তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

এদিকে সাত দিবস উপবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট কোনরূপ আশ্বাস বাণী না পাইয়া সমুদ্রে ঝাঁপদিয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলেন।

দুর্ব্বল হইল বিপ্র ক্ষীণ উপবাসে।
সমুদ্রে মরিব বলি দৃঢ় হৈল শেষে॥ চৈঃ মঃ

তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বিষণ্ণমনে কাঁদিতে কাঁদিতে সমুদ্রতীরে গেলেন; গিয়া দেখিলেন—

——————"এক পুরুষ বিশাল।
সমুদ্রের মধ্যে আইসে পর্ব্বত আকার॥" চৈঃ মঃ

সমুদ্রের জল তাঁহার এক হাঁটু জল বলিয়া বোধ হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে সেই বিশালাকৃতি মহাপুরুষ যখন তীরে উঠিলেন, তখন তাঁহাকে সামান্যাকার মনুষ্য বলিয়া বোধ হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন ইনিই জগন্নাথ,—এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার পশ্চাৎপশ্চাৎ চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে দুই জনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ নিজ দুঃখ সকলি নিবেদন করিলেন তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট সাত দিবস উপবাস করিয়া ধন্না দিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন, তিনি ধন-বর চাহিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন, ধন না পাইলে সমুদ্র ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন এই সংকল্প করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সেই বিশালাকৃতি মহাপুরুষ তখন নিজ পরিচয় দিয়া কহিলেন—

"বিভীষণ নাম মোর শুনহ ব্রাহ্মণ।
দেখিবারে যাই জগন্নাথের চরণ॥
কর্ম্মদোষে দুঃখ পাও শুনহ ব্রাহ্মণ।" চৈঃ চঃ

জগন্নাথদেবের শ্রীমুখ দেখিয়া দুঃখ দূর কর "এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন,—তথাপিও ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। তিনি বিষণ্ণমনে সেই মহাপুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রাজা বিভীষণ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শ্রীমন্দিরদ্বারে আসিয়া পৌছিলেন। মহাপ্রভু তখন ভক্তবৃন্দসহ কৃষ্ণকথারসে মগ্ন আছেন। তিনি গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন "দুয়ারে যিনি দাড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া এস"। গোবিন্দ গিয়া দেখিলেন দুইজন ব্রাহ্মণ দাড়াইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে প্রভু-সন্নিধানে লইয়া আসিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার মধ্যে একজনকে অতি আদরের সহিত ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন,—অপর ব্রাহ্মণটি কিছু দূরে দাড়াইয়া রহিলেন। সর্ব্বভক্তগণ দেখিতেছেন মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণটিকে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন,—সকল কথা ছাড়িয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন, এবং কথা কহিতে কহিতে উভয়ের নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীহস্ত দিয়া ব্রাহ্মণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আদর করিতেছেন, উভয়ের মধ্যে প্রেমকথা যাহা হইতেছে, তাহার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না।

"সে দোঁহার কথা আর না বুঝয়ে কেহো"।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু পরিশেষে অপর ব্রাহ্মণটিকে লক্ষ্য করিয়া ছদ্মবেশী রাজা বিভীষণকে কহিলেন,—

দারিদ্র জ্বালায় দুঃখ হরিল ইহার।
জগন্নাথ উপরে এ করয়ে প্রহার॥
আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কিছু।
আপনি করিয়া দোষ প্রভুরে দোষে পাছু॥
আপনি করয়ে নিজ ভাল মন্দ বলি।
ভুঞ্জিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি॥
সুখী সে ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার।
প্রভুরে দোষয়ে দোষ দুঃখ ভুঞ্জিবার॥
সাত উপবাসে বিপ্র মৃত্যু কৈল সার।
বিপ্রপ্রিয় জগন্নাথ কি করিব আর॥
তোমার দর্শনে ইহার ঘুচিল দারিদ।
ধন দেহ যেন হয় ধনের সমুদ্র॥" চৈঃ চঃ

রাজা বিভীষণ হাসিয়া মহাপ্রভুর আদেশ অঙ্গীকার

করিলেন। দুইজনে তখন মহাপ্রভুর চরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ রাজা বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি বলিলেন আমি রাজা বিভীষণ, জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছেন, কিন্তু কই জগন্নাথ ত দেখিলেন না? ইহার অর্থ কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। সন্ন্যাসী দেখিয়াই আপনি কি ফিরিতেছেন, এবং তাঁহার বাক্যই শিরোধার্য্য করিলেন? এই সন্ন্যাসীই বা কে? আমাকে কৃপা করিয়া বলুন"। রাজা বিভীষণ হাসিয়া উত্তর করিলেন "রে অবোধ ব্রাহ্মণ! ঐ সন্ন্যাসীই সাক্ষাৎ জগন্নাথ। তুমি তোমার অভীষ্ট ধন পাইলে, এখন গৃহে যাও, আমি তোমার দ্রাবিড় দেশে গিয়া তোমার ধন তোমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব"। ব্রাহ্মণের তখন দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। তিনি এই কথা শুনিয়া দুঃখে শিরে করাঘাত করিয়া কহিলেন "হা অদৃষ্ট! আমি ধনলোভে শ্রীভগবানের চরণ লাভে বঞ্চিত হইলাম" এই বলিয়া তিনি রাজা বিভীষণের পদতলে পড়িয়া পুনরায় প্রভু-সন্নিধানে লইয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা বিভীষণ এই ব্রাহ্মণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পুনরায় তাঁহার সঙ্গে প্রভু সান্নিধানে আসিলেন। মহাপ্রভু তখনও ভক্তগণ সঙ্গে বসিয়াছিলেন। তিনি রাজা বিভীষণকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "পুনরায় আগমন কেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন "প্রভু, এই বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকলি জ্ঞাত হইবেন"। ব্রাহ্মণ করযোড়ে একপার্শ্বে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ভয়ে ভয়ে কহিলেন

-"গোসাঞি! আমিত অবধ।
কত শত জীব আছে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ॥
সভাকার প্রাণ তুমি সভাকার নাথ।
তো বহি নাহিক কেহ তুমি জগন্নাথ॥
আমি মহাধম ছার মহা অপরাধী।
নিজ কর্ম্ম দোষে মো দারিদ্র রোগ ব্যাধি।
ব্যাধির পীড়ায়ে মো কুপথ্য করেঁা আশা।
ঔষধ না রুচে মুখে কুপথ্যে প্রত্যাশা॥
বুঝিয়া ঔষধ দেহ তুমি ধন্বন্তরি।
কর্ম্মদোষে ভবব্যাধে আমি ছার মরি॥" চৈঃ মঃ

মহাপ্রভু অনুতপ্ত ভক্তের কথা শুনিয়া রাজা বিভীষণের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিপ্রকে বলিলেন "বিপ্র! জগন্নাথদেব তোমার সকলি ভাল করিলেন, তুমি যাহা চাহিয়াছিলে তাহা পাইলে, এখন বিষয় ভোগ কর। শেষকালে তুমি জগন্নাথ দেবের চরণ পাইবে"। বিপ্র এই আশ্বাসবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর চরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজা বিভীষণও মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন। সর্ব্ব ভক্তগণ এই আগন্তুক বিপ্রের প্রতি, মহাপ্রভুর কৃপার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার শ্রীচরণের প্রতি বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে চাহিয়া রহিলেন। পরমানন্দপুরী গোস্বামী তখন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু হে! ইহার মর্ম্ম কি? কৃপা করিয়া বল, আমাদের বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে"। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তখন সকল কথা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এই লীলারঙ্গটিতে মহাপ্রভু দেখাইলেন তিনি সর্ব্ব অবতারের অবতারী। রাজা বিভিষণ তাহা জানিতে পারিয়াই তাঁহাকে নিত্য দর্শন করিতে আসিতেন। শ্রীরামাবতারে রাজা বিভীষণ শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে তিনি সে কৃপায় বঞ্চিত হইবেন কেন? শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অচলব্রহ্ম,—শ্রীগৌরাঙ্গদেব সচলব্রহ্ম। রাজা বিভীষণ নিত্যসিদ্ধ ভগবত পার্ষদ ভক্ত, তিনি তাহা জানিতে পারিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে নীলাচলে আসিতেন। দরিদ্র বিপ্র ধনাশায় শ্রীজগন্নাথদর্শনে আসিয়াছিলেন, জগন্নাথদেব তাঁহার সকাম প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না,—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু করিলেন এবং ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ব্রাহ্মণ নিজ ভ্রম বুঝিয়া যখন শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন, কৃপানিধি মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া

আশ্বাসবাণী দিলেন অগিমে তাঁহার চরণতলে স্থান দিবেন। দয়ার অবতারই অবতারশিরোমণি,—করুণার অবতারই সর্ব্বাবতারসার। বিপ্রপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বিপ্রের সকল অভিলাষই পূর্ণ করিলেন। এই জন্যই মহাজন কবি গাইয়াছেন,—

"কি কহব শত শত তুয়া অবতার।
একেলা গৌরাঙ্গচাঁদ জীবন আমার॥"

গোবিন্দদাস।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ

মহাপ্রভুর বিরহ-দশা।

এই মত মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদার্ণবে ভাসে॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-কথা পরম অদ্ভুত কাহিনী,—তাঁহার কৃষ্ণবিরহদশাও অদ্ভুত বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিলে বিরহাবিদগ্ধা ব্রজগোপীবৃন্দের যেরূপ কৃষ্ণোন্মাদ দশা হইয়াছিল, মহাপ্রভুর এক্ষণে ঠিক সেইরূপ দশা উপস্থিত। উদ্ধবকে দেখিয়া কৃষ্ণবিরহিনী শ্রীরাধিকার মনে যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল,—তিনি যেরূপ প্রেমোন্মাদিনীর ন্যায় প্রলাপবাক্য বলিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর এক্ষণে ঠিক সেই ভাব,—তাঁহার প্রলাপবাক্যও তদ্রূপ। এক্ষণে তিনি কৃষ্ণবিরহে নানাভাবে সর্ব্বক্ষণ বিভাবিত,—কৃষ্ণবিরহ-সাগরে নিজদেহ একেবারে ঢালিয়া দিয়াছেন। দিবারাত্রি কৃষ্ণকথারসে তিনি মগ্ন থাকেন,—অন্যকথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে না। রাত্রিতে রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর এই কৃষ্ণবিরহজ্বালা নিবারণের জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর তাঁহারা তাঁহাকে কোন মতে শয়ন করাইয়া নিজ গৃহে চলিয়া আসেন। গোবিন্দ একাকী তাঁহার নিকটে থাকেন।

একদিন মহাপ্রভু রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন,—নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে মাত্র, এমন সময়ে তিনি একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাসহ ব্রজগোপীমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলা করিতেছেন। সে কিরূপ শুনুন,—

ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলী বদন।
পীতাম্বর বনমালী মদনমোহন॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ চৈঃ চঃ

এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু ব্রজ-রসাবিষ্ট হইয়া মনে করিলেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তিনি প্রেমাবিষ্টভাবে পরমানন্দে শয়ান আছেন। প্রাতঃকালের সময় উত্তীর্ণ হইতেছে দেখিয়া গোবিন্দ তাঁহাকে জাগাইলেন। তখন মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল এবং তিনি মহা দুঃখিত হইলেন। তিনি কিছু বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার শ্রীবদনের ভাব দেখিয়া গোবিন্দ বুঝিলেন মহাপ্রভু নিদ্রিতাবস্থায় ভাবরাজ্যের কোন অত্যুত্তম উচ্চস্থানে বিলাস করিতেছিলেন। নরদেহধারী শ্রীগৌরভগবান দেহাভ্যাস বশতঃ ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালীয় নিত্যকৃত্যাদি সমাধান পূর্ব্বক জগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন। গরুড়স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া তিনি অপূর্ব্ব প্রেমাবেশে নয়নে নয়ন লিপ্ত করিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্র সন্দর্শন করিতেছেন,—তাঁহার অগ্রে লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেছে,—গোবিন্দ সঙ্গে আছেন। এমন সময়ে একটী বিষদৃশ দৃশ্য গোবিন্দের নয়নগোচর হইল। একটী ভক্তিমতী উড়িয়া স্ত্রীলোক লোকের ভিড়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে না পাইয়া গরুড়স্তম্ভে উঠিয়া মহাপ্রভুর স্কন্ধদেশে একটী পদ দিয়া গভীর প্রেমাবেগে শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের শ্রীবদনচন্দ্র দর্শন করিতেছে।

উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিঞা॥ চৈঃ চঃ

এই দৃশ্য গোবিন্দের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইল। মহা-

প্রভু স্ত্রীলোকের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। স্পর্শের ত বহু দূরের কথা,—তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ হইল, কি সর্ব্বনাশ! এই ভাবিয়া গোবিন্দ অতিশয় ব্যস্ত সমস্তভাবে সেই স্ত্রীলোকটিকে হাতে ধরিয়া নামাইয়া দিতে গেলেন। মহাপ্রভু ইঙ্গিতে গোবিন্দকে নিষেধ করিলেন (১) এবং মৃদুমধুর বচনে কহিলেন,—

"আদিবস্যা! এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন" ॥ চৈঃ চঃ

সেই স্ত্রীলোকটির এই সময় বাহ্যজ্ঞান হইল,—সে পরপুরুষের স্কন্ধে পদ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—তখন সে নিজেই সবিশেষ লজ্জিত হইয়া সসংকোচে নামিয়া পড়িল, এবং দেখিল যাঁহার স্কন্ধে পা দিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল,—তিনি আর কেহ নহেন,—সচল জগন্নাথ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু! তখনি কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীলোকটি মহাপ্রভুর চরণতলে পড়িল এবং করযোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। মহাপ্রভু সেই ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটির জগন্নাথদর্শনে মনের অদ্ভুত একাগ্রতা ও আর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন—

"এত আর্ত্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা।
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে।
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে ইহা নাহি জানে॥
অহো! ভাগ্যবতী এই বন্দ ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়॥" চৈঃ চঃ

এই বলিয়া তিনি এই স্ত্রীলোকটীকে শ্রীমস্তক অবনত করিয়া করযোড়ে প্রণাম করিলেন। শিক্ষাগুরু শ্রীগৌরভগবান লোকশিক্ষার জন্য এই লীলারঙ্গটি প্রকট করিলেন। তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া তাঁহার ভক্তগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন,—"আপনি আচরি ধর্ম্ম লোকেরে শিখায়"।

গোবিন্দের সঙ্গে আরও কয়েকজন মহাপ্রভুর ভক্তও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু এই উপদেশবাক্য কহিলেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সকল লীলাই ভক্তবৃন্দের শিক্ষার জন্য,—তাঁহার লীলা-কথাই শাস্ত্রকথা।

এই যে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গটি মহাপ্রভু প্রকট করিলেন, ইহাতে বহু নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কৃপানিধি গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দের অনুমতি লইয়া জীবাধম গ্রন্থকার এই লীলারঙ্গের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গচরণ স্মরণ করিয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্যে গ্রন্থকার হস্তক্ষেপ করিতেছেন। জয় গৌর!

সর্ব্ব প্রথম তত্ত্ব এই লীলারঙ্গটির স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দ আছেন। তিনি পূর্ব্বে একবার প্রভুকে স্ত্রীস্পর্শ-বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন দেবদাসীর গান শুনিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেগে দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার নিকট ছুটিয়াছিলেন। দেবদাসীটি মন্দিরে নির্জ্জনে বসিয়া কৃষ্ণবিষয়কসঙ্গীত গাইতেছিল। গোবিন্দ ছুটিয়া গিয়া দুই বাহু প্রসারিয়া মহাপ্রভুকে ক্রোড়ে ধরিয়া সেদিন সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। গোবিন্দের প্রতি তাঁহার এসকল কার্য্যের বিশেষ ভার ছিল। গোবিন্দও এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধানে সতর্ক এবং যত্নবান থাকিতেন। এবার তিনি মহাপ্রভুকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না, ইহা ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার মর্ম্ম কে বুঝিবে? তবে তাঁহার কৃপায় ও প্রেরণায় ভক্তহৃদয়ে যে ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহা প্রকাশযোগ্য কি না, তাহার বিচার ভক্তগণ করিবেন। জীবাধম গ্রন্থকারের মনের মধ্যে গুপ্তভাবে একরূপ একটী ভাবতরঙ্গ খেলা করিতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ইচ্ছাময় মহাপ্রভু ইচ্ছা করিয়া এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গটি প্রকট করিলেন, তিনি ইচ্ছা করিয়া এক্ষেত্রে স্ত্রীস্পর্শ করিলেন। কেন তিনি ইহা করিলেন, তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটনের ক্ষীণ চেষ্টা করিব মাত্র।

আমাদের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণকুমারটি ভাবের ভগবান। তিনি যে কপট সন্ন্যাসী, তাহা মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন, এবং তিনিও স্বমুখে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এইসে

---

(১) দেখি গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥ চৈঃ চঃ

ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটির জগন্নাথ দর্শনানন্দে তনু মন প্রাণ প্রেমাবিষ্ট হইয়াছে,—তাঁহার তখনকার মনের ভাবটি অতি মধুর, অতি উত্তম, অতি বিশুদ্ধ। তাঁহার কি মনে ছিল তিনি স্ত্রীলোক,—তিনি কি বুঝিয়াছিলেন কোন পুরুষের স্কন্ধে তিনি পদ দিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—তাঁহার মনে কি তখন জগন্নাথদর্শনানন্দভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদয় হইয়াছিল? তাঁহার তখন স্ত্রীত্ব লুপ্ত হইয়াছিল, স্ত্রীপুরুষ ভেদাভেদজ্ঞান বুদ্ধি তখন সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়াছিল। তাঁহার দেহজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, এমন কি প্রাণের অভিজ্ঞান পর্য্যন্ত সকলি বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক এই শরীর তৎকালের জন্য জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানশক্তি, বিবেকশক্তি সকলেই নিজ নিজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীভগবানের শ্রীমুখ দর্শনানন্দে মগ্ন হইয়া তৎকালের জন্য সেই ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটি পরানন্দ স্বরূপ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সকল লীলারঙ্গই জগতের শিক্ষার জন্য। তিনি এই লীলারঙ্গটি প্রকট করিয়া জগতকে দেখাইলেন, শ্রীভগবানের শ্রীমুখদর্শনানন্দ কি অপূর্ব্ব বস্তু, এবং এই পরানন্দ যিনি উপভোগ করেন, তাঁহার ভাবশক্তি জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। স্ত্রীপুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে কখন ও কি অবস্থায়,—এ কথার বিচার করিবার এই শুভ সুযোগ। এই ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই এই প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা হইবে।

মহাপ্রভুও প্রেমাবেশে দর্শনানন্দে মগ্ন ছিলেন। তিনি যে গোবিন্দকে আদেশ দিলেন এই ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটির দর্শনানন্দে বাধা দিও না, ইহা কিরূপে সম্ভব? এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে? ইহার একমাত্র উত্তর,—আনন্দলীলা-রসময়বিগ্রহ শ্রীগৌরভগবান লীলারঙ্গ করিতে নরবপু ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই একটি তাঁহার লীলারঙ্গ। এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গটি প্রকট করিবার দৃঢ় উদ্দেশ্য আছে। তিনি তাঁহার ভক্তবৃন্দকে ইহা দ্বারা দেখাইলেন, এরূপ স্থলে, যে কোন লোক, স্ত্রী হউন, আর পুরুষ হউন, ভগবতমুখারবিন্দদর্শনানন্দে বিভোর হইয়া যদি কোন অপরাধ অজানিতভাবে সঞ্চয় করেন, তাহা গ্রহণীয় নহে, এবং তাঁহার এই অপূর্ব্ব দর্শনানন্দসুখে কাহারও বাধা দেওয়া কোন ক্রমে বিধেয় নহে। মহাপ্রভুর যে এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ,—ইহা তাঁহার স্বীয় দর্শনানন্দের বাধক হইলেও লোকশিক্ষার পরিচায়ক। তিনি ইচ্ছাময়, লীলাময়, এবং রঙ্গপ্রিয়। তাঁহার অনন্ত লীলার এই একটি লীলারঙ্গ মাত্র। ভগবদ্ভাব অতি পরিশুদ্ধ, অতীব পবিত্র,—বিশুদ্ধ ভক্তভাবের সহিত যখন ইহার সংমিশ্রণ হয়, তখন ইহা হইতে অমৃত স্রাব হয়। ভাবগ্রাহী শ্রীগৌরভগবানের লীলারঙ্গ সকল অতি ভাবময় নিগূঢ় রহস্য পরিপূর্ণ। ভাবুক ও রসিক ভক্তগণের পরমাস্বাদনের বস্তু,—এই সকল লীলামধু। যিনি যে ভাবে এই সকল লীলামধু আস্বাদন করিবেন, সেই ভাবই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম।

মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন,—এই স্ত্রীলোক-ঘটিত-ব্যাপারে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি গত রাত্রে যে সুন্দর স্বপ্নটি দেখিয়াছিলেন, তাহার আবেশে তিনি জগন্নাথকে সাক্ষাৎ রাসরসিক গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন করিতেছিলেন,—মন্দির এবং সকল বস্তুতেই তাঁহার শ্রীরাসলীলা স্ফূর্ত্তি হইতেছিল,—এক্ষণে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইবামাত্র তিনি দেখিলেন তিনি গরুড়স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান এবং শ্রীমন্দিরে জগন্নাথদেব সুভদ্রা ও বলরামের সহিত বিরাজ করিতেছেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন, এখন যেন কুরুক্ষেত্র আসিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ভাবের রাজ্যে ব্রজরসজ্ঞ সাধকের চক্ষে দুইটি বিভিন্ন বস্তু। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ রাসরসিক প্রেমসুন্দর গোপবেশ ব্রজেন্দ্রনন্দন,—আর কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের রথের সারথী বেশ, তিনি ঐশ্বর্য্যময়, রাজপুরুষোচিত গুণশালী রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত এবং পঞ্চপাণ্ডবদিগের পরম বন্ধু ও বিশ্বাসী মন্ত্রী। মহাপ্রভুর অকস্মাৎ ভাব পরিবর্ত্তন

হইল। তিনি বিষণ্ণ ভাবে ভাবিতে লাগিলেন----

"কাঁহা কুরুক্ষেত্র আইলাম, কাঁহা বৃন্দাবন ?" চৈঃ চঃ

তিনি গত রাত্রে রাসলীলার স্বপ্ন দেখিয়া প্রেমাবেশে ছিলেন,--যেন তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই আছেন, আর যেন তাঁহার সর্ব্বস্বধন ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তিনি মনে বড় দুঃখ পাইয়া বিষণ্ণমনে নিজ বাসায় প্রেমাবেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার এই গভীর দুঃখের মর্ম্ম কে বুঝিবে ? তিনি বাসায় আসিয়া হতাশভাবে ভূমিতলে বসিলেন এবং অধোবদনে হস্তের নখদ্বারা ভূমিতে কি লিখিতে লাগিলেন,—তাঁহার কমল নেত্রদ্বয় দিয়া প্রেমাশ্রু-মন্দাকিনীর ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে,---নয়নে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না,--তবুও নখ দ্বারা ভূমিতলে কি লিখিতেছেন। তাঁহার প্রাণবল্লভকে যেন পরম প্রেমভরে প্রেমাশ্রুজলে প্রেম পত্রী লিখিতেছেন আর প্রেমগদগদভাষে করুণ স্বরে মনে মনে বিলাপ করিতেছেন,--

"পাইয়া বৃন্দাবন-নাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুঞি আইনু ॥" চৈঃ চঃ

বহুক্ষণ তিনি এইরূপ অপূর্ব্ব প্রেমবিহ্বলভাবে নীরবে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তখন সেখানে গোবিন্দ ভিন্ন অন্য কেহ ছিলেন না। পরে ভক্তগণ একে একে আসিলেন,—আসিয়া প্রভুকে আজ বড় বিমর্ষ দেখিলেন,--তিনি যেন বড়ই কাতর এবং অন্যমনস্ক। রায়রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রেমবিহ্বল মহাপ্রভু একবার করুণ নয়নে তাঁহাদিগের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র, তাঁহার নয়নকমলের অবিরল প্রেমাশ্রু-ধারায় বিশাল বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে,---- নয়ন দুইটি প্রেমাবেগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছেন - তিনি কথা কহিতে অশক্ত। তাঁহারা মনে মনে মহাপ্রভুর তাৎকালিক মনের অবস্থা বুঝিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বুঝাইবার কিছুই নাই, এই ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এইভাবে সেদিন বহুক্ষণ গেল। দেহের স্বভাবে মহাপ্রভু স্নানাহার করিলেন। রাত্রিকালে যথাসময়ে রামানন্দ এবং স্বরূপ গোসাঞি পুনরায় তাঁহার নিকটে আসিলেন, তখন কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভুর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল,—তাঁহার মনের কথায় তাঁহাদিগকে আভাস দিলেন। তখন তিনি প্রেমাবেগে দুই হস্তে দুই জনের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া প্রেম গদগদ ভাষে মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন (১) --

শুন বান্ধব ! কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম
যোগী হইয়া হইল ভিখারী ॥
কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি
আশা ঝুলি কান্ধের উপর ॥
চিন্তা কাঁথা উড়ি গায়, ধূলা বিভূতি মলিন কায়,
হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলি নিল মাথে
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর।
ব্যাস শুকাদি যোগী জন, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে---
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহা বাউল নাম ধরি
শিষ্য লৈঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন—
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষ লতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফলমূল পত্রাসন
এই বৃত্তি করি শিষ্যগণে ॥
কৃষ্ণগুণ রূপরস, গন্ধ শব্দ পরশ
যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।

(১) প্রাপ্ত রত্ন হারাইঞা, তার গুণ সোঙরিঞা,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি
ধৈর্য্য গেল হৈল চাপল ॥ চৈঃ চঃ

তা সবার গ্রাস শেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন ॥
শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন
ধ্যানে রাত্রে করি জাগরণ ॥
মনঃ কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মনঃ গেল পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥

মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহকাতর হইয়া নিজ মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে মন আমার কৃষ্ণরূপ প্রাণধন হারাইয়া বিষাদে দেহরূপ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাপালিক যোগী ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছে। মন যে কাপালিক যোগী হইয়াছে, ইহাই এই রূপক দিয়া দেখাইতেছেন। কাপালিক যোগীগণের নৃকপালাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডল কর্ণে, হস্তে অলাবু মাত্র, কন্থা ধারণ—ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত এবং গুরুদত্ত দ্বাদশ গুণসূত্রে হস্তে বাঁধা, এবং মস্তকে নরশৃঙ্গের ঝুলনা থাকে। তাহারা একান্তে নিরঞ্জন আত্মার চিন্তা করিয়া থাকেন ও তাঁহাদিগের শিষ্যগণ গৃহস্থাশ্রম হইতে যাহা ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করে, তাহা দ্বারা নির্ব্বাহ করেন।

উপরি উক্ত বর্ণনায় মহাপ্রভুর মনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। কৃষ্ণবিরহানলে তাঁহার মন জর্জ্জরিত হইয়াছে। মন দুঃখে দেহ-গৃহ ত্যাগ করিয়া যোগীধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যেমন তেমন যোগী নহে, কাপালিক যোগীধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। কৃষ্ণবিয়োগ-দুঃখে দুঃখী হইয়া মহাপ্রভুর মন তাঁহার দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। তাঁহার শরীর এখন মনশূন্য। এই মন শূন্য দেহে দশদশা হয়। ব্রজগোপীবৃন্দের কৃষ্ণবিরহে এইরূপ দশদশা হইয়াছিল। সেই দশদশা কি শুনুন। (১) চিন্তা (২) জাগরণ (৩) উদ্বেগ (৪) উত্থাপতন (৫) মলিনাঙ্গ (৬) প্রলাপ (৭) ব্যাধি (৮) উন্মাদ (৯) মোহ (১০) মৃত্যু। মহাপ্রভুকে এক্ষণে এই কৃষ্ণবিরহ-দশদশায় গ্রাস করিতে বসিয়াছে। রাত্রে দিনে কখন কোন দশাগ্রস্ত তিনি হন, তাহার নিশ্চিৎ নাই। কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু এইরূপ দশ-দশাগ্রস্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্যে নিজগণকে নিজমনের অবস্থা বলিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় আছেন। রামানন্দরায় মহাপ্রভুর তাৎকালিক ভাবোচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক শ্লোকাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং স্বরূপ দামোদর শ্রীরাধিকার উক্তি কৃষ্ণবিরহের গান ধরিলেন। কিছু ক্ষণ পরে ইহাতে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি তখন দুই বাহু দ্বারা দুইজনের গলদেশ ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে করুণ ক্রন্দনের রোলে নিশীথ গগণ ভেদ হইতে লাগিল। এইভাবে অর্দ্ধেক রাত্রি শেষ হইলে তাঁহাকে বহু প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া রায়রামানন্দ এবং স্বরূপ গোসাঞি ভিতর প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইলেন। রামানন্দ নিজগৃহে গমন করিলেন, স্বরূপ গোসাঞি এবং গোবিন্দ দুইজনে দ্বারে শয়ন করিলেন। প্রকোষ্ঠের তিনটি দ্বারই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভুর রাত্রিতে নিদ্রা নাই। তিনি এক্ষণে জাগরণ-দশাপন্ন, সমস্ত রাত্রি উচ্চ করিয়া নাম সংকীর্ত্তন করেন। সেদিন কিছুক্ষণ এইরূপ নামসংকীর্ত্তন করিয়া নীরব হইলেন। স্বরূপ গোসাঞির চক্ষে নিদ্রা নাই। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। তিনি মহাপ্রভুর সাড়াশব্দ না পাইয়া দ্বার খুলিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন তিনি গৃহে নাই,—তিনটি দ্বারই বন্ধ। গোবিন্দকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিলেন। প্রদীপ লইয়া পুনরায় গৃহ দেখিলেন, বাহির দেখিলেন। তখন দুইজনে মহা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর অন্বেষণে পথে বাহির হইলেন। হাতে প্রদীপ আছে,—পথের এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে তাঁহারা সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিংহদ্বারের উত্তর দিকে একটি উন্মুক্তস্থানে দেখিলেন মহাপ্রভু দীর্ঘাকৃতি দেহ ধারণ করিয়া ভূমিতলে শয়ান আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের দেহে প্রাণ আসিল,—মনে আনন্দ হইল,—কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। সে অবস্থা কিরূপ শুনুন,—

পড়িয়াছে প্রভু দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।

অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম মাত্র আছে তাত।
হস্ত পাদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্ম মাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখি সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ॥ চৈঃ চঃ

এই তাহার অবস্থা। ইহা দেখিয়া কি স্বরূপ গোসাঞি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি গোবিন্দকে দিয়া তৎক্ষণাৎ সকল ভক্তগণকে ডাকাইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে রঘুনাথ দাস গোস্বামীও ছিলেন। স্বরূপ গোসাঞি তখন ভক্তগণ সহ উচ্চ কীর্ত্তন করিয়া সংজ্ঞাহীন মহাপ্রভুর কর্ণের নিকট কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রবেশ করিল, অমনি তিনি হরিবোল বলিয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্তমাত্রেই তাঁহার অসংলগ্ন অস্থিসন্ধি গুলি যথাস্থানে পূর্ব্ববৎ সংলগ্ন হইল এবং যেমন শরীর তেমনি হইল (১)। ভক্তগণের তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা তখন প্রেমানন্দে অধীর হইয়া ঘনঘন হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। স্বরূপদামোদর গোস্বামী মহাপ্রভুকে বক্ষে ধরিয়া ধীরে ধীরে বাসায় লইয়া আসিলেন। স্বরূপদামোদররূপী ললিতাসখির অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া রাধাভাববিভাবিত মহাপ্রভু ধীরে ধীরে নিজ বাসায় আসিলেন, ভক্তগণ দেখিতেছেন যে কৃষ্ণবিরহিনী শ্রীরাধিকা যেন তাঁহার মর্ম্মী সখি ললিতার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া অভিসার হইতে গৃহে আসিতেছেন।

মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গটী রঘুনাথদাস গোস্বামী স্বচক্ষে দেখিয়া নিজকৃত চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন। সেই শ্লোকটি এই,

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকল বিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

অর্থ। কোন দিন কাশীমিশ্রগৃহে ব্রজপতিনন্দনের উৎকট বিরহে যাঁহার শরীরের সন্ধি শ্লথ হওয়ায় হস্ত ও পদ অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল, এবং তদবস্থায় ভূমি লুণ্ঠিত হইতে হইতে গদগদ কাকুবাক্যে যিনি রোদন করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গসুন্দর আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

মহাপ্রভুর এক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে। তিনি এদিক ওদিকে এক একবার শুভ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সম্মুখে সিংহদ্বার দেখিয়া বিস্মিতভাবে স্বরূপ গোসাঞিকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি এ সময়ে এখানে কেন?" স্বরূপগোসাঞি উত্তর করিলেন "প্রভু ওঠ। এখন বাসায় চল,—সেখানে গিয়া তোমাকে এ কথার উত্তর দিব" এই বলিয়া মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত ধারণপূর্ব্বক তিনি তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইলেন এবং তাঁহাকে ধরিয়া বাসায় লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া মহাপ্রভু সুস্থির হইলে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত স্বরূপগোসাঞি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। শুনিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি স্বরূপের হাতে ধরিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন "স্বরূপ! আমার ত কিছুই স্মরণ নাই। আমি ত দেখি আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যুতের ন্যায় আমাকে দেখা দিয়া অন্তর্দ্ধান হন,—সেই দুঃখেই আমি মরমে মরিয়া আছি" (১)।

ঠিক এই সময়ে জগন্নাথদেবের পানিশঙ্খধ্বনি শ্রুত

(১) বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা॥
চেতন হইলে অস্থি সন্ধি সকল লাগিল।
পূর্ব্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল॥ চৈঃ চঃ

(১) প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার।
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
বিদ্যুৎ প্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান॥ চৈঃ চঃ

হইল। মহাপ্রভু স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন।

এক্ষণে মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত লীলারঙ্গটি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এই লীলাকথা বুঝাইবার শক্তি জীবাধম গ্রন্থকারের নাই। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসী চূড়ামণি॥

ইহার উপর আর কিছু না বলাই ভাল, তবুও উচ্চ-শিক্ষাভিমানী অবিশ্বাসী পাঠকবৃন্দের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য দুই একটি কথা বলিব। এই যে ভাবটি যাহা মহাপ্রভু তাঁহার বাহ্যদেহে প্রকাশ করিলেন, ইহা বাস্তবিক শাস্ত্রযুক্তি ও বিচারতর্কের অতীত। কিন্তু তথাপি ইহা ধ্রুব সত্য, কারণ মহাজনগণ এই লীলারঙ্গ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ইহার প্রমাণ পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর কথা। তিনি লিখিয়াছেন—

রঘুনাথদাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তার মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥

ভাবভক্তির প্রচারক কৃষ্ণ-বিরহকাতর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহার ভাবের পরিচয় স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতকে দেখাইয়াছেন, যে ভক্তের প্রাণ যখন ভাবের স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, তখন তাঁহার দেহজ্ঞান থাকে না,—আর এই যে পঞ্চভূতাত্মক দেহটা, ইহাতেই মানসিকভাবের স্ফূর্তি প্রকাশ পায়। তাহা সকলেই দেখিয়াছেন,—অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, স্তম্ভ, বিবর্ণ প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিকার এই দেহতেই লক্ষিত হয়,—তবে মানসিকভাব ও দৈহিকভাব দুইটি বিভিন্ন বস্তু। মানসিকভাবের স্ফূর্তি ও স্পন্দন দেহেই হয়—দৈহিকভাবের লক্ষণগুলি মানসিক ভাবলক্ষণের পরিচায়ক। মানসিকভাবলক্ষণ গুলি অদৃশ্য,—দৈহিক ভাবলক্ষণ গুলি প্রত্যক্ষ। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নরদেহ সামান্য মানবদেহ নহে,—সামান্য নরদেহে যে সকল সাত্ত্বিক ভাববিকার সকল লক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক, এবং অলৌকিক প্রেমবিকার ভাবলক্ষণ সকল যে ভগবদ্দেহে লক্ষিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই যে মহাপ্রভুর শ্রীঅস্থিসকল শিথিল হইয়া এক এক বিতস্তি প্রমাণ লম্বা হইয়াছিল, কেবলমাত্র চর্ম্ম সংলগ্ন ছিল,—ইহা সামান্য নরদেহে সম্ভব নহে। এইজন্য সাধারণ লোকের মনে ইহা বিশ্বাস হয় না। ইহা একমাত্র ভগবদ্দেহেতেই সম্ভব। কবিরাজ গোস্বামী একথা বলিয়াছেন,—

শাস্ত্র লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥

এই ত কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভুর দৈহিক ভাববিকার যুক্ত অত্যদ্ভুত প্রেম-লক্ষণলীলাভিনয়ের প্রথম অঙ্ক। ইহা অপেক্ষা অত্যদ্ভুত লীলারঙ্গকাহিনী পরে শুনিবেন। ইহা আপনাদের পাশ্চাত্য শারীরবিজ্ঞানশাস্ত্রের অতীত,—মনুষ্যবুদ্ধির অতীত এবং বিচারতর্ক গবেষণারও অতীত। সুদৃঢ় বিশ্বাস-তরুমূলে উপবেশন করিয়া নির্জনে শ্রীগৌর ভগবানের এই লীলারঙ্গ অনুধ্যান করিলে তাঁহার মহামহিমাময় ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভের সৌভাগ্য ও সুযোগ পাইবেন,—তাঁহার অলৌকিক লীলানুভূতির শক্তি সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা অর্জনীয়—সাধনসাপেক্ষ। শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলারঙ্গে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে ভাবভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করা অতিশয় সুকঠিন। ইহাতে ইহকাল পরকাল নাশের আশঙ্কা আছে। ইহা পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর কথা,—

অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহকাল পরকাল তার হয় নাশ॥ চৈঃ চঃ

এখন মহাপ্রভুর আর একটী লীলারঙ্গ কথা বর্ণিত হইবে। লীলাময় প্রভু হে! দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ হে! তোমার অপূর্ব্ব লীলা বর্ণনা করিবার শক্তি দান কর। গৌরভক্তগণ কৃপা করিয়া জীবাধম গ্রন্থকারের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করুন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিব ইহা দুঃসাহস; এই দুঃসাহস কেন করিয়াছি, তাহা বলি শুনুন,—কেবল আত্মশোধনের জন্য।

আত্ম শোধিবার তরে দুঃসাহস কৈনু।
লীলাসিন্ধুর একবিন্দু ছুঁইতে নারিনু॥ অঃ প্রঃ

ইহার কিছুদিন পরে একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রস্নানে যাইতে যাইতে নীলাচলের চটক পর্ব্বত দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনের গোবর্দ্ধনগিরিজ্ঞানে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পর্ব্বতের দিকে উদ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছেন,—আর নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেছেন,—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দর-কন্দ মূলৈঃ॥ (১)

গোবিন্দও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন, কিন্তু হইল, "মহাপ্রভু ছুটিতে ছুটিতে কোথায় গেলেন?,"—ভক্তগণ যিনি যেখানে ছিলেন, মহাপ্রভু যে দিকে গিয়াছেন, সেই দিকে উদ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আছেন স্বরূপগোসাঞি, জগদানন্দ পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই ও শঙ্করপণ্ডিত। পরমানন্দপুরী ও ভারতী-গোসাঞিও সমুদ্রতীরাভিমুখে ছুটিলেন। ভগবান আচার্য্য খঞ্জ,—তিনিও ধীরে ধীরে চলিলেন। প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু বায়ুগতিতে প্রথমে যাইতেছিলেন,—কতদূর গিয়া পথে তাঁহার স্তম্ভভাব হইল,—তিনি আর চলিতে পারিতেছেন না। মহাপ্রভুর স্তম্ভভাব কিরূপ পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহা শুনুন,—

প্রতি রোম কূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনার ধার॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খের প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রে তরঙ্গ॥

এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যদ্ভুত স্তম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহবাণবিদ্ধ মহাপ্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে পথিমধ্যে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন, তাঁহার সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসর হইল। এমন সময়ে সর্ব্বাগ্রে গোবিন্দ বহির্ব্বাস ও জলপূর্ণ করঙ্গ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মহা সশঙ্কিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গে জলের ছিটা দিতে লাগিলেন, এবং বহির্ব্বাস দ্বারা শ্রীঅঙ্গে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাহার পর স্বরূপদামোদর গোসাঞি প্রভৃতি ভক্তগণ সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে স্তম্ভভাবের আশ্চর্য্য পূর্ণবিকাশ হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। সকলে মিলিয়া তখন উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ঘনঘন শীতল জলের ছিটা মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গে দিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি "হরি হরি" ধ্বনি করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। ভক্তগণ তখন প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইলেন। মহাপ্রভুর অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা,—তিনি এদিক ওদিক চাহিতেছেন এবং নীরবে ঘনঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া তিনি স্বরূপগোসাঞিকে ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিয়া প্রেমাবেশে অশ্রুপূর্ণলোচনে গদগদভাবে কহিতে লাগিলেন—

গোবর্দ্ধন হৈতে ইহা মোরে আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥
ইহাঁ হৈতে আজ মুঞি গেনু গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণ॥
গোবর্দ্ধন চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে বেড়ি চরে সব ধেনু॥
বেণুধ্বনি শুনি আইলা রাধা ঠাকুরাণী।

(১) অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "হে অবলাগণ! এই অদ্রি অর্থাৎ গোবর্দ্ধন হরিদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু রামকৃষ্ণচরণস্পর্শে হৃষ্ট হইয়া উত্তম জল, কোমল তৃণ, উপবেশনাদির নিমিত্ত গুহা, কন্দ ও মূল দ্বারা গোগণ এবং বৎসগণের সহিত রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন।

তার রূপ ভাব সখি ! বর্ণিতে না জানি ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখিগণ চাহে কেহ ফল উঠাইতে ॥
হেন কালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহা হৈতে ধরি মোরে ইহা লঞা আইলা ॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে ॥

এই কথা বলিয়া প্রভু অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীবদনের কাতর ভাব দেখিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয় দ্রবিত হইল। তাঁহারাও প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীগোসাঞি সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইঁহারা মহাপ্রভুর সম্ভ্রমের পাত্র। এই দুইজনকে দেখিয়াই তিনি নিজভাব সম্বরণ করিলেন। মহাপ্রভুর তাৎকালিক ভাবটি কি, তাহা কৃপাময় পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণবিরহিণী, শ্রীরাধাভাবে প্রাণ বল্লভের অদর্শনে মনোদুঃখে ঝুরিতেছিলেন,—ভক্তবৃন্দ তাঁহার মর্ম্মী সখিগণ। সখিগণের সম্মুখে আর লজ্জা সম্ভ্রম কি ? পুরী ও ভারতী গোসাঞিকে তিনি গুরুজ্ঞানে সম্ভ্রম করেন। তাই তাঁহাদিগকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভাব সম্বরণ করিয়া আপনাকে লজ্জিত বোধ করিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দুইজনকে বন্দনা করিলেন, তাঁহারা দুই জনেই তাঁহাকে গাঢ়প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

মহাপ্রভু এক্ষণে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি পুরী ও ভারতী গোসাঞিকে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা এতদূরে কেন আসিয়াছেন ?" পুরীগোসাঞি হাসিয়া উত্তর করিলেন "তোমার অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিবার জন্য আমরা আসিয়াছি"। মহাপ্রভু একেই ত লজ্জিতভাবে কথা কহিতেছিলেন, পুরীগোসাঞির কথা শুনিয়া লজ্জায় আরও অধোবদন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সকলে মিলিয়া সমুদ্রস্নান করিয়া বাসায় আসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন।

মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদভাবপূর্ণ লীলারঙ্গটিও রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষের একটী শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। সে শ্লোকটী এই—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে ! গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন গিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো-
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

অর্থ। নীলাচলের নিকটে চটক পর্ব্বত দেখিয়া যিনি গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিকে দেখিতে যাইতেছি বলিয়া প্রমত্তের ন্যায় ধাবমান অবস্থায় নিজগণকর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে প্রমত্ত করিতেছেন।

এই দিব্যোন্মাদ দশা ভাবুক মানবের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচারতর্কের অতীত। মহাপ্রভুর মন গোবর্দ্ধনগিরি প্রদেশে চলিয়া গিয়াছিল, সিদ্ধদেহখানি মাত্র নীলাচলে পড়িয়াছিল। মানসিক ক্রিয়া সকল সিদ্ধদেহে যে উপলব্ধি হয়, তাহা দেখাইবার জন্য মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত লীলারঙ্গ। অষ্টসাত্ত্বিকভাবের বিকার লক্ষণ সকল কিরূপভাবে সিদ্ধদেহে লক্ষিত হয়, তাহা দেখাইবার জন্যও মহাপ্রভু এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন। এসকল ভাবলক্ষণ এতদিন পর্যন্ত গ্রন্থে লিখিত ছিল, কেহ কখন কোন মহাপুরুষের অঙ্গে দেখিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আচরিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইলেন সাধকের সিদ্ধদেহে অলৌকিক, অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব সাত্ত্বিকভাব লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ সাধনাই প্রকৃত সাধনা। সাধনবলে সকলই সম্ভব, ভক্তির সাধনা যে যোগসাধনা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বরং শ্রেষ্ঠ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এই লীলারঙ্গ দ্বারা স্বয়ং তাহাও দেখাইলেন। যোগবলে অলৌকিক কার্য্য সকল সাধিত হয়,—ভক্তির সাধনবলেও ততোধিক অলৌকিক কার্য্য সকল সাধিত হইতে পারে, এবং সিদ্ধদেহের শক্তি কিরূপ প্রবল প্রতাপসম্পন্ন এবং ঐশ্বর্য্যবলপূর্ণ, তাহাও এই লীলারঙ্গ দ্বারা লীলাময় মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তবৃন্দকে দেখাইলেন। ইহাই শ্রীগৌরভগবানের অলৌকিক লীলা।

মহাপ্রভু এক্ষণে কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইতেছেন। তাঁহার ভক্তগণ কাঙ্গাল কন্থাধারী হইলেও প্রভূত সাধন-শক্তিসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী। বৈষ্ণবগণ ঐশ্বর্য্য দেখাইতে চাহেন না, কিন্তু যখন দেখান, তখন তাহা দেখিয়া সকল লোক বিস্মিত হয়। কারণ সেরূপ ঐশ্বর্য্য অন্য কেহ দেখাইতে পারেন না। শ্রীরূপগোস্বামী আকবর বাদ-সাহকে যে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে মসলমান সম্রাটকে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার পদানত হইতে হইয়াছিল সে কথা বিস্তারিত বলিবার স্থান এ গ্রন্থ নহে।

ষষ্টিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদাবস্থার প্রলাপ-বর্ণন।

(প্রথম চিত্র)

প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ, যদ্যপি হয় ধীর॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥ চৈঃ চঃ

উপরিউক্ত কথাটি পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এখন শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদা বস্থা এবং তজ্জনিত তাঁহার পলাপপ্রসঙ্গ মনুষ্যের দুর্ব্বোধ্য,—শুধু মনুষ্যের কেন নয়, দেবতারও দুর্ব্বোধ্য। তবে তাঁহার অসীম কৃপাবলে শক্তিশালী মহাজন ভক্তগণ এই অতিশয় গম্ভীর লীলারহস্যের মর্ম্ম যাহা কিছু উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সে অপূর্ব্ব লীলারহস্য বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই,—তথাপি তাহা পাঠ করিলে মন বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়,—প্রাণে যেন একটা 'কি জানি কি' ভাবের উদয় হয়। এই "কি জানি কি" ভাবাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর বিবাদ করিতে আরম্ভ করে,—কেহ কাহারও কথা শুনে না,—কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না,—সকলেই বিস্ময়া-বিষ্টভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভেকের মত কোলাহল করে। এই কোলাহলধ্বনি বাহ্যদেহ হইতে অন্তরে প্রবেশ করে, এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। তাহাদিগকে স্থিরভাবে চিন্তা করিতে দেয় না,—স্বাধীনভাবে বিচার করিতে দেয় না। তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া প্রাণের মধ্যে ছুটাছুটি করে। মানুষের প্রাণ অতি চঞ্চল,—সহজেই বিশ্রাম চায়। এই সকল ক্ষিপ্তপ্রায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির অত্যাচারে মানুষের চঞ্চল প্রাণ একেবারে অস্থির হইয়া যায়। তখন প্রাণে আর প্রাণ থাকে না। প্রাণের ভিতর আবার অন্তঃকরণ আছেন, সেইখানে জীবাত্মার স্থিতি। প্রাণ যখন বহিরেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রপীড়িত হয়,—তখন অন্তঃকরণও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলিত হয়, এবং তন্মধ্যস্থ আত্মাও বিচলিত হন। সকলই তখন উলোটপালোট হইয়া যায়। মানুষের আত্মা বিচলিত হইলে পরমাত্মাও বিচলিত হন। তখন আর মানুষের বিচারবুদ্ধি জ্ঞান থাকে না। মানুষ বিচার বুদ্ধিবিহীন হইলে তাহার দ্বারা কোন কর্ম্মই সাধিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদদশা এবং তাহার তজ্জনিত আবেগময় প্রলাপবাক্যের মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি অর্জ্জন বহুযুগের সাধন সাপেক্ষ। মানব যখন প্রাণে যখন এই সকল অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক লীলানুভূতির অনুসন্ধানের ইচ্ছা সঞ্জাত হয়,—তখন তাহাদের মনে লীলাস্ফূর্ত্তির সূচনা হয়। এই লীলাস্ফূর্ত্তির সূচনাই ভগবৎকৃপা; এবং এই ভগবৎ-কৃপাই ভগবল্লীলারহস্য বুঝিবার একমাত্র মূলমন্ত্র।

এই সকল অত্যদ্ভুত লীলারঙ্গকাহিনী যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া সূত্ররূপে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম স্বরূপদামোদর ও রঘুনাথদাসগোস্বামী। এই দুই মহাপুরুষ এই সময়ে মহাপ্রভুর নিকটে ছিলেন (১)। স্বরূপ-

(১) স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুইর করচাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেই কালে এই দুই রহে প্রভু পাশ।
আর সব কড়চা কর্ত্তা রহে দূরদেশ॥ চৈঃ চঃ

গোসাঞি করচাকর্তা আর রঘুনাথদাস বৃত্তিকার। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই দুই মহাপুরুষের করচা ও বৃত্তি অবলম্বনে মহাপ্রভুর এই অত্যদ্ভুত লীলাকাহিনী কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়াছেন। এই কথঞ্চিৎ বিস্তৃত লীলারহস্যও মনুষ্যের বুঝিবার শক্তি নাই। তাহা বর্ণনা করিব কি? তবে যাহা সিদ্ধমহাজনগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহারই অবিকল প্রতিলিপি কৃপাময় গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দের চক্ষের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিব। তাঁহারা গৌরাঙ্গ কৃপাবলে এই সকল নিগূঢ় গৌরাঙ্গলীলারহস্যকাহিনী বুঝিতে অবশ্য পারিবেন। জীবাধম গ্রন্থকার স্বয়ং বুঝিতে যাহা অক্ষম, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভের জন্য যে করুণ প্রেমক্রন্দন এবং আর্ত্তি, তাহার নামই তাহার প্রলাপ। নবদ্বীপে যখন তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রেম প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণভাবে "রাধা রাধা" বলিয়া প্রায়ই রোদন করিতেন, এক্ষণে নীলাচলে রাধাভাবে "হা কৃষ্ণ" "হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছেন। রাধাকৃষ্ণমিলিতবপু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং" বলিয়া সিদ্ধমহাজনগণ নতিস্তুতি করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বপ্রকাশক স্তোত্র। নবদ্বীপলীলায় তিনি প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণভাবে "রাধা রাধা" বলিয়া রোদন করিতেন,—কখন কখন "গোপী গোপী" বলিয়া জপও করিতেন। নদীয়ায় তিনি ভক্তভাবে শ্রীরাধার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি ভক্তভাব ধারণপূর্ব্বক নবদ্বীপে যে সকল লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যলীলা। তিনি আনন্দলীলারসময়বিগ্রহ, রাধাশক্তি গদাধরকে পাইয়া তিনি প্রেমোন্মত্তভাবে রাধারসসুধাতরঙ্গে নিজ অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সেখানে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারেন নাই,—নীলাচলে তিনি পূর্ব্ব স্বরূপতত্ত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন,—তিনি আত্মতত্ত্ব রাধাতত্ত্বে পরিপূর্ণভাবে মিশাইয়া আপনাকে কৃষ্ণবিরহিনী রাধাজ্ঞানে কৃষ্ণবিরহসাগরে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন। নীলাচল লীলায় তাঁহার ভাব রাধাকৃষ্ণমিলিতবপুর মিশ্রিত ভাব নহে,—শ্রীকৃষ্ণভাবের সত্ত্বা লোপ করিয়া শ্রীরাধাভাবের পূর্ণবিকাশ তিনি নীলাচললীলায় দেখাইয়াছেন। তাই তাঁহার শ্রীমুখে কেবল,—

কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥ চৈঃ চঃ

ইহা রাধাকৃষ্ণমিলিত তত্ত্বের সংমিশ্রণ ভাব নহে,—বিশুদ্ধ রাধাভাব। এখানে তিনি "রাধা রাধা" বলিয়া আর রোদন করেন না, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, মহিমাবর্ণনে তিনি শতমুখ,—শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত শ্রীকৃষ্ণদর্শনে—উদ্বেগে দিবস তাঁর হৈল কোটিযুগ"। নীলাচলে মহাপ্রভুর এখন এইরূপ অবস্থা। তাঁহার সুন্দর বদনচন্দ্রখানি মলিন,—তথাচ তাঁহার সৌন্দর্য্যের অবধি নাই—তাহাতে ভাবমাধুর্য্যের সীমা নাই। তাঁহার সেই মলিন বদনচন্দ্রে ঝলকে ঝলকে নানাভাবের অপরূপ তরঙ্গ উঠিতেছে এবং তিনি বসিয়া ধীরে ধীরে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন, নয়নকমলে অতিবেগে প্রেমাশ্রুধারা পড়িতেছে। মহাজন কবি প্রভুর এই অপরূপ রূপ দেখিয়া লিখিয়াছেন—

কই কই জপে গোরা কৃষ্ণনাম মধু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন বিমল বিধু॥
* * *
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘনে ঘনে।
কত সুরধনী বহে অরুণ নয়নে॥

মহাপ্রভু নিজ বাসায় এইভাবে ভূমিতলে বসিয়া আছেন,—তাঁহার নিকট রামানন্দ রায় ও স্বরূপগোসাঞি বসিয়া আছেন। তাঁহারা দুইজনে কৃষ্ণবিরহকাতর প্রভুকে কত বুঝাইতেছেন। তখন প্রাতঃকাল—একে একে ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইতেছেন। স্বরূপগোসাঞি ও

রামানন্দ মহাপ্রভুকে নানা উপায়ে ভুলাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। স্বরূপ বলিতেছেন "প্রভু! জগদানন্দ পণ্ডিত আসিয়াছেন, আপনাকে প্রণাম করিতেছেন, কৃপা করুন"। রামানন্দ কহিতেছেন "প্রভু, তোমার রঘুনাথ-দাস চরণতলে পতিত, একবার কৃপাদৃষ্টি করুন।" কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর মহাপ্রভুর কর্ণে কোন কথাই যাইতেছে না। তিনি ভূমিতলে বদন অবনত করিয়া বসিয়া আছেন,—নয়নজলে সে স্থান কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে,—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। তাঁহার পক্কবিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠদ্বয় মৃদুমন্দ কাঁপিতেছে, তিনি মৃদু মৃদু প্রেমগদগদভাষে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে গভীর বিরহব্যঞ্জক এক একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়সমুদ্র উদ্বেলিত করিয়া যেন সেই দীর্ঘনিশ্বাসগুলি নির্গত হইতেছে। যত বেলা অধিক হইতেছে, ততই তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যথা বৃদ্ধি হইতেছে। রামানন্দ রায় ও স্বরূপদামোদর বড় বিপদে পড়িলেন,—মহাপ্রভুর নিত্যকৃত্য কিছুই হয় নাই, স্নানাহার ত দূরের কথা। তিনি যে কি ভাবে মগ্ন আছেন, তাহা বুঝিতে রামানন্দ এবং স্বরূপগোসাঞির মত সুচতুর রসিক ভক্তের কিছু বাকি থাকিল না। যদিও বেলা অধিক হইয়াছে, ললিতাসখির অংশ।—স্বরূপদামোদর একটি চণ্ডীদাসের পদ ধরিলেন

রাধার কি হইল অন্তর ব্যথা।
বসিয়ে বিরলে, থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা॥

অমনি মহাপ্রভুর চমক ভাঙ্গিল, তিনি তখন প্রেম বিস্ফারিত লোচনে ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোসাঞির গলা ধরিয়া প্রেমাবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "স্বরূপ! তুমি আমাকে আমার প্রাণবল্লভের নিকট লইয়া চল, আর আমি তাঁহাকে না দেখিয়া একতিলার্দ্ধও থাকিতে পারিতেছি না"। স্বরূপ গোসাঞি সুযোগ পাইয়া বলিলেন "প্রভু চল"। অমনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া প্রভু উঠিলেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রেমে টলমল,—তিনি চলিতে অশক্ত,—এক হাতে স্বরূপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আর এক হাত রামানন্দের স্কন্ধে দিয়া তিনি সমুদ্র স্নানে চলিলেন। রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে চলিয়াছেন—কৃষ্ণদরশনে,—ললিতা বিশাখা দুই সখীসঙ্গে। পথিমধ্যে পুষ্পের উদ্যান দেখিয়া তাঁহার মনে হইল এই বৃন্দাবন। অমনি রামানন্দ ও স্বরূপ গোসাঞির হাত ছাড়াইয়া তিনি প্রেমাবেগে উদ্যান মধ্যে কৃষ্ণান্বেষণে ছুটিলেন (১)। সঙ্গী ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন। শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধিকাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন, সখীগণ তখন যে ভাবে বিভাবিত হইয়া বনের মধ্যে তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আজ মহাপ্রভুর সেই ভাব। তিনি রামানন্দ ও স্বরূপের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া কহিলেন "সখি, বৃন্দাবনে ত আসিলাম, আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ কোথায়? তোমরা দেখাইয়া দাও"।

এত কহি গৌরহরি, দু'জনার কণ্ঠধরি,
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাহা করো কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়। চৈঃ চঃ

তিনি এই বলিয়াই প্রতি তরুলতার প্রতি সাশ্রুনয়নে চাহিয়া ভাগবতের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া পরম আবেগপূর্ণ গদগদভাষে কহিতে লাগিলেন—

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার
জম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলা
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥

অর্থ। হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্বু! হে অর্ক! হে বিল্ব! হে বকুল! হে আম্র! হে নীপ! হে কদম্ব! হে যমুনাতীরবাসী অন্যান্য তরুগণ! তোমরা পরার্থেই

(১) একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র স্নানে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যানে তাঁহা দেখে আচম্বিতে॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিলা ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥ চৈঃ চঃ

জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। কৃষ্ণবিরহে আমরা ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি। তিনি কোন পথে গিয়াছেন কৃপা পূর্ব্বক বলিয়া দাও। আমাদের প্রাণ রক্ষা কর।

ইহা কৃষ্ণবিরহকাতরা ব্রজগোপীগণের বিলাপবাক্য। মহাপ্রভুর ভাব গোপীভাব। তিনি প্রতি তরুর নিকটে যাইয়া প্রেমাশ্রুনয়নে কাতরভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ তাঁহার ভাব বুঝিয়া নীরব আছেন। তাঁহারা প্রভুকে দেখিতেছেন কৃষ্ণবিরহব্যাকুলা প্রেমোন্মাদগ্রস্তা ব্রজবালা। ভাগবতের শ্লোকটি তাঁহারা পড়িয়াছিলেন মাত্র, আজ সেই শ্লোকোক্ত বিষয়টি সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন, সেই শ্লোকোক্ত কৃষ্ণবিরহিনী ব্রজবালাবৃন্দের বিরহব্যাকুল আক্ষেপোক্তি যেন স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন। তাঁহাদিগের হৃদয় প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইল,—কিন্তু মহাপ্রভুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা বড়ই কাতর হইলেন।

এদিকে কৃষ্ণবিরহবিদগ্ধ মহাপ্রভু পুষ্পকাননের তরু-দিগের নিকট যে কাতর নিবেদন করিলেন, তাহার কোন উত্তর না পাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—

এসব পুরুষ জাতি, কৃষ্ণসখার সমান।

এ কেন কহিবে কৃষ্ণোদ্দেশ আমায়। ইতি চৈঃ চঃ

অর্থাৎ এই যে তরুগণ ইহারা পুরুষ জাতি,—কৃষ্ণের সখা,—তাহারা নারীজাতির বিরহবেদনা কি বুঝিবে? তাহারা কৃষ্ণের সখা,—আমার কেহ নহে, তাঁহারা কৃষ্ণের সমাচার জানিলেও আমাকে কেন বলিবে? মহাপ্রভুর এক্ষণে পরিপূর্ণ গোপীভাব, তিনি যে পুরুষ জাতি নহেন,—ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস,—তিনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া এরূপ কথা বলিতেছেন। অন্তরে পুরুষত্বের লেশাভাস থাকিলেও এরূপ কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হয় না।

এখন কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভুর লক্ষ্য পড়িল তুলসী, মালতী,যূথী,মাধবী,মল্লিকা প্রভৃতি লতা বৃক্ষের উপর। তাঁহারা স্ত্রীজাতি,—স্ত্রীলোকের দুঃখ বুঝিবে,—এবং তাঁহার কথার উত্তর দিবে,—এই ভাবিয়া তিনি প্রেমাবেগে ভাগবতের আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে প্রতি লতা বৃক্ষের নিকট সকাতরে কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করি-লেন,—যথা—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দ চরণপ্রিয়ে।

সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্‌ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥

মালত্যদর্শিবঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।

প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥

অর্থ। হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দ চরণ-প্রিয়ে! তোমার অতিপ্রিয় ভগবান অচ্যুত অলিকুলের সহিত তোমাকে বহন করিয়া এই পথে গমন করিয়াছেন তাঁহাকে কি তুমি দেখিয়াছ?

তুলসী দেবিকে এই কথা বলিয়া মালতী মল্লিকা প্রভৃতি বৃক্ষের দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! মাধব কর-স্পর্শদ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া কি এই পথে গিয়াছেন? তাঁহাকে কি তোমরা দেখিয়াছ? তোমরা সকলে আমার সখির তুল্য,—আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের সমাচার বলিয়া আমাকে প্রাণদান কর"।

তুলসী এবং লতা বৃক্ষদিগের নিকটেও কোনরূপ উত্তর না পাইয়া তাঁহার মন বড়ই ব্যথিত হইল। তিনি ভাবি-তেছেন,—ব্যথিতের বেদন কেহই শুনিল না। বিশেষতঃ ইহারা সকলে কৃষ্ণদাসী,—কৃষ্ণের ভয়ে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিলেন না। উত্তম কথা। এই ভাবিয়া কৃষ্ণবিরহ-কাতর মহাপ্রভু কৃষ্ণঅঙ্গগন্ধবহ মৃগীগণের মুখের দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া ভাগবতের আর একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

অপ্যেণ পত্‍ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহগাত্রৈ

স্তন্বন্ দৃশাং সখি! সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।

কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ

কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥

অর্থ। হে সখি হরিণবধূতে! মাধব তাঁহার প্রিয়তমার সহিত এইস্থানে আগমন করিয়া তদীয় অঙ্গশোভা প্রদর্শনে

কি তোমাদিগের নয়নরঞ্জন করিয়াছেন? যেহেতু এখানকার বায়ু তাঁহার কান্তাঙ্গসঙ্গ নিমিত্ত কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালার গন্ধ বহন করিতেছে। কৃষ্ণবিরহকাতর প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু হরিণীগণকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন,—

কহ মৃগী রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইল, না কর অন্যথা॥
রাধা প্রিয় সখি আমরা নহি বহিরঙ্গ।
দূরে হইতে জানি তার যৈছে অঙ্গগন্ধ॥
রাধা অঙ্গ সঙ্গে কুচকুঙ্কুমভূষিত।
কৃষ্ণ কুন্দমালাগন্ধে বায়ু সুবাসিত॥
কৃষ্ণ ইহাঁ ছাড়ি গেল ইহ বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে, এই না শুনে কাহিনী॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু উৎকর্ণ হইয়া সতৃষ্ণনয়নে উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃগীগণ চমকিত হইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল দেখিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পুনরায় উদ্যানস্থ ফলপুষ্পাবনত শাখাপল্লব সমন্বিত তরুগণের প্রতি করুণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন,-

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরণ্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ভাগবত

অর্থ হে তরুগণ। তুলসীগন্ধোন্মাদ অলিকুলকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া রামানুজ কৃষ্ণ প্রিয়তমার স্কন্ধে বাম বাহু অর্পণ করিয়া দক্ষিণ করে নীলপদ্ম ধারণপূর্ব্বক এইস্থানে বিহার করিতে করিতে প্রেমগর্ব্বনেত্রে তোমাদের এই প্রণাম ও অভিবাদন কি তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। (১)

(১) কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু তরুদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন,—

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্য চিতে॥
তোমার প্রণাম কি করিয়াছে অবধান।
কিবা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ॥

ভাগবতের উক্ত শ্লোকটি মহাপ্রভু প্রেমভরে মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতেছেন, আর ফলপুষ্পভারে অবনতশির তরুগণের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার তাঁহার প্রশ্নোত্তর অপেক্ষায় ঘনঘন চাহিতেছেন। কিন্তু কে তাঁহার কৃষ্ণবিরহ মর্ম্মবেদনা বুঝিবে? তাঁহার কথার উত্তর দিবে? তিনি কৃষ্ণান্বেষণে বনবাজির চতুর্দ্দিকে অতিশয় উদ্বিগ্নভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, আর যাহাকে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই তাঁহার প্রাণবল্লভের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—কিন্তু কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিতেছে না,—ইহা দেখিয়া তাঁহার মনের দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে,—মনাগুন ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিতেছে। তিনি আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া যমুনাপুলে সমুদ্রকূলে ছুটিলেন। সেখানে কদম্বতলে তাঁহার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। সে রূপ কেমন-

কোটি মন্মথমথন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র মন॥ চৈঃ চঃ

কৃষ্ণের এই অপরূপ রূপ দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। পূর্ব্ববৎ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের বিকারলক্ষণ সকল একে একে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার অন্তরে পরমানন্দ অনুভূত হইতেছে, কিন্তু বাহ্য লক্ষণ মহা উদ্বেগপূর্ণ প্রেমবিহ্বল ভাব। স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ উচ্চ কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। মহাপ্রভু তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া প্রেমাবেশে ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়নকমলে অবিরল প্রেমধারা বহিতেছে,—তিনি রামানন্দ রায়ের মুখের পানে চাহিয়া রাধিকার উক্তি গোবিন্দলীলামৃতের এই শ্লোকটি অতি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিলেন—

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্র মুরলীস্ফুরৎ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।

তখন মনে মনে ভাবিতেছেন-

বৃক্ষের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিত॥ চৈঃ চঃ

ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥

অর্থ। হে সখি বিশাখে! মদনমোহন কৃষ্ণের নবজলধর সন্নিভ অঙ্গকান্তি সমুজ্জ্বল,—তাহার পীতাম্বর নবতড়িদ্বৎ-মনোমোহন, রত্নবিনির্ম্মিত মুরলীবদনে সুশোভিত, মুখ-কমল শারদপূর্ণেন্দুবৎ স্নিগ্ধ, শিরদেশে ময়ূরপুচ্ছ বিভূষিত, এবং মনোহর মুক্তাহারের দীপ্তিতে বক্ষঃস্থল সমুদ্ভাসিত করিয়া অদ্য আমার নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন।

এই শ্লোকটি সখি বিশাখার প্রতি রাধিকার উক্তি। মহাপ্রভুর রাধাভাব এক্ষণে পরিপূর্ণতম। রামানন্দ তত্ত্বতঃ সখি বিশাখা তাঁকেই সম্বোধন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের এই অপরূপ রূপকথা বলিতেছেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকার্থ ত্রিপদিতে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত হইল।

নবঘনস্নিগ্ধ বর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কন,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
যিনি উপমার গণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি! কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক (১) মোর নেত্র চাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্র-ধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূর চয়।
অকলঙ্ক পূর্ণ কল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল
চিত্র চন্দ্রের তাহাতে উদয়।
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা পবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে,
মরে চাতক পিতে না পাইল।

অর্থাৎ প্রভু বলিতেছেন, হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত মেঘ স্বরূপ। আমার নেত্ররূপ চাতক সেই অপূর্ব্ব মেঘ না দেখিয়া পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণের যে পীতবসন,—তাহা সেই মেঘের সৌদামিনী স্বরূপ,—তাহা অস্থির। তাহার গলদেশে যে মুক্তাহার আছে, তাহা মেঘের নিম্নভাগে বক-শ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার যে শিখিপুচ্ছ তাহা মেঘের ইন্দ্রধনুর ন্যায় বৈজয়ন্তী মালা ধনু সদৃশ। কৃষ্ণমুখে যে মুরলীর কলধ্বনি, তাহা কৃষ্ণরূপ মেঘের মধুর গর্জ্জন স্বরূপ,—তাহা শুনি বৃন্দাবনের ময়ূরগণ অপূর্ব্ব নৃত্য করিতেছে। কৃষ্ণের লাবণ্যজ্যোৎস্না অকলঙ্ক পূর্ণকলা অপূর্ব্ব চন্দ্রের ন্যায় উদয় হইয়াছে,—কৃষ্ণমেঘের লীলামৃত বরিষণ চৌদ্দ ভুবনকে সিঞ্চিত করিতেছে। সেই মেঘ দেখা দিল, আমার দুর্দ্দৈব রূপ ঝঞ্ঝাবাত সেই মেঘকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিল। এক্ষণে মেঘ না দেখিয়া নেত্রচাতক জলাভাবে মৃতপ্রায়।

মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদদশা অপূর্ব্বভাবময় এবং অদ্ভুত দর্শন। ভক্তগণ কেবল তাঁহার শ্রীবদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন,—ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার শ্রীমুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে,—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতেছে,—মধুর হইতে মধুরতর জ্যোতি বদনমণ্ডলে বিভাবিত হইতেছে। মহাপ্রভুর সুধামাখা প্রেমগদগদবচনে ভক্তবৃন্দের কর্ণে সুধাবৃষ্টি হইতেছে। তাঁহারাও প্রভুর সঙ্গে ভাবরাজ্যে বাস করিতেছেন।

তারপর মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের প্রতি চাহিয়া গদগদ বচনে কহিলেন "রামরায় পড়, শ্লোক পড়"। রামানন্দ রায় তখন শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহাপ্রভুর তৎকালিক ভাবসম্মত শ্লোক পাঠ করিলেন। ব্রজগোপীগণের উক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি,—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি—
গণ্ডস্থলাধর সুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃশ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥

(১) বলাহক মেঘ।

অর্থ,—হে সুন্দর! তোমার অলকাবৃত মুখ, কুণ্ডল শোভিত গণ্ড, পীযূষমণ্ডিত অধর, সস্মিত দৃষ্টিসমন্বিত বদনমণ্ডল, অভয়প্রদ বাহুযুগল এবং লক্ষ্মীদেবীর রতিস্থল বক্ষের শোভা দেখিয়া আমরা আনন্দে তোমার দাসী হইতে বাসনা করি।

কৃষ্ণবিরহবিধুর মহাপ্রভু স্বয়ং এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যা পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শুনুন—

কৃষ্ণ জিনি পদ্ম চান্দ, পাতিয়াছে মুখফান্দ,
তাতে অধর মধুস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী
ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার॥
বান্ধব! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্মাধর্ম, হরে নারী-মৃগী মর্ম,
করে নানা উপায় তাহার॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর কুণ্ডল
সেই নৃত্যে হরে নারী চয়।
সস্মিত কটাক্ষ বাণে, তা সবার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মনোবক্ষ
হরি, দাসী করিবারে দক্ষ॥
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজ যুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্প কায়।
দুই শৈল ছিদ্রে (১)পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে
মরে নারী সে বিষ জ্বালায়॥
কৃষ্ণকর পদতল, কোটী চন্দ্র সুশীতল
জিনি কর্পূর বেনামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালা বিষনাশে
যার স্পর্শে লুব্ধ নারী মন॥

এইরূপ কৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী ব্রজগোপীভাবে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে বহুবিধ বিলাপ করিতেছেন,—আর স্বরূপাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রেমাবেশে, নিশ্চেষ্টভাবে তাহা শুনিতেছেন। তাঁহারা প্রভুকে দেখিতেছেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা। মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাব পরিপূর্ণভাবে তাঁহার প্রতি অঙ্গে, প্রতি কথায়, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে বিদ্যমান দেখিতে পাইতেছেন। তিনি কৃষ্ণপাগলিনীর ন্যায় বহুবিধ প্রলাপ করিতেছেন। তাঁহার রাধাভাবের অবধি নিম্নলিখিত শ্রীরাধিকার উক্তি গোবিন্দলীলামৃত শ্রীগ্রন্থোক্ত সুন্দর শ্লোকটিতে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইবে। কৃষ্ণপ্রেম পাগলিনী শ্রীরাধিকা বিশাখা সখিকে তাঁহার মনের নিগূঢ় কথাটি এই শ্লোকে বলিতেছেন। মহাপ্রভু এখানে তাঁহার বিশাখা সখীরূপী রায় রামানন্দকে সম্বোধন করিয়া এই শ্লোকটি প্রেমগদগদ ভাষে আবৃত্তি

হরিন্মণি কবাটিকা প্রততহারি বক্ষঃস্থলঃ,
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃ কলুষহারি দোরর্গলঃ।
সুধাংশু হরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাং॥

অর্থ। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন "হে সখি! যাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ ইন্দ্রনীলমণি কবাটিকার ন্যায় মনোহর—যাঁহার অর্গল সদৃশ বাহুদ্বয় কন্দর্পপীড়িত যুবতীগণের মনস্তাপ বিনাশে সমর্থ,—এবং শশাঙ্করশ্মি, হরিচন্দন, নীলপদ্ম ও কর্পূর অপেক্ষাও যাঁহার অঙ্গগন্ধ সুস্নিগ্ধ,—সেই মদনমোহন কৃষ্ণ আমার বক্ষঃস্থলের স্পৃহা উৎপাদন করিতেছেন।

রাধাভাবোন্মত্ত মহাপ্রভু এই স্থানে এই কথাতে তাঁহার রাধাভাবের অবধি দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভের উদ্দমবাসনার লোভ তিনি নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট এক্ষণে ব্যক্ত করিলেন। এই যে এতক্ষণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী বর্ণনা করিতেছিলেন, এই বর্ণনা-গীতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা পানও করিতেছিলেন। তিনি যমুনাপুলিনে কদম্ববৃক্ষতলে তাঁহার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেমোন্মাদিনী অঙ্গসঙ্গভিখারিণী

(১) শৈলছিদ্রে স্তনরূপ হৃদয় ছিদ্র।

দাসী ভাবে তাঁহার সহিত কত কথাই বলিতেছিলেন। এতক্ষণ তিনি কৃষ্ণ-সঙ্গ-সুখে এবং কৃষ্ণমুখদর্শনানন্দে মগ্ন হইলেন। তাঁহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান ছিল না। এক্ষণে হঠাৎ তাঁহার ভাব সম্বরণ হইল। তখন তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া উন্মাদের ন্যায় কহিলেন—

———"কৃষ্ণ মাঞি এখনে পাইনু।
আপনার দুর্দ্দৈব দোষে পুনঃ হারাইনু॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রহে এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্দ্ধানে॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণ বিরহাকুলভাবে অধীর হইয়া স্বরূপগোসাঞির প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে কাতরবচনে কহিলেন "স্বরূপ! দয়া করিয়া এমন একটি গান গাও যাহাতে আমার এই চঞ্চলচিত্ত একটু স্থির হয়। স্বরূপগোসাঞি তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া সময়োচিত গীত-গোবিন্দের একটী পদের ধুয়া ধরিলেন যথা—

রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসং॥

এই গান শুনিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেগে ভূমিতল হইতে উঠিয়া মধুর প্রেম-নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাব সকল প্রকট হইল,—তাঁহার হৃদয়ে হর্ষাদি ব্যাভিচার ভাবতরঙ্গ সকল উথলিয়া উঠিল,—ভাবসন্ধি, ভাবোদয় ও ভাবশাবল্য হৃদয়ে মনে ও শরীরের মধ্যে মহা যুদ্ধ বাধাইয়া দিল। তিনি মধুর নৃত্যরঙ্গে আপনভাবে আপনি উন্মত্ত। স্বরূপগোসাঞি যেমন একটী পদ শেষ করিতেছেন, অন্য আর একটী পদ ধরিতেছেন—মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্যরঙ্গ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। উপস্থিত ভক্ত-গণ তাঁহার এই অদ্ভুত নয়নরঞ্জন প্রেম-নৃত্য দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। বহুক্ষণ ধরিয়া স্বরূপগোসাঞি এই পদটি পুনঃপুনঃ গান করিলেন। যতক্ষণ গান হইল, প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুও ততক্ষণ প্রাণ ভরিয়া নাচিলেন। স্বরূপগোসাঞি যখন তাঁহার গীত শেষ করিলেন, তিনি দেখিলেন মহাপ্রভু নৃত্যশ্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু তবুও নাচিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "বোল বোল" অর্থাৎ "গান থামাইও না, গান কর"। মহাপ্রভুকে ঘর্ম্মাক্তকলেবর এবং বিশেষ ক্লান্ত দেখিয়া স্বরূপ আর গান গাইলেন না। প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু বারম্বার "বোল বোল" ধ্বনি করিতেছেন দেখিয়া ভক্তবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন। তখন রামা-নন্দরায় গিয়া প্রভুকে হাত ধরিয়া বসাইলেন। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিয়া, এবং শ্রীঅঙ্গে জলের ছিটা দিয়া তাঁহার শ্রম দূর করিলেন। তাহার পর তাঁহাকে সমুদ্র স্নান করাইয়া সকলে মিলিয়া বাসায় লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে তখন অনেক করিয়া প্রসাদ ভোজন করাইয়া শয়ন করাইলেন,—তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। ইহার পর রামানন্দরায় প্রভৃতি ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে গিয়া ভোজনাদি সমাপন করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তখন নীলাচলে ছিলেন,—মহাপ্রভুর এই লীলারঙ্গটি তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্যাষ্টকের একটি শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন, সে শ্লোকটী এই—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরজণিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি প্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥

অর্থ। যদি সমুদ্রতীরে উপবন-শ্রেণী দেখিয়া বারম্বার বৃন্দাবনস্মরণজনিত প্রেমে বিবশ হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে যাহার রসনা চঞ্চল হইয়াছিল, সেই ভক্তরসিক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কবে আমার নয়ন গোচর হইবেন?

মহাপ্রভু কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার পর জগন্নাথ দেবের আরতি দর্শন করিতে গেলেন। তিনি জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছেন। জগন্নাথকে দেখিলেন মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণ,—বলরামকে দেখিলেন শ্রীরাধা,—সুভদ্রাকে দেখিলেন শ্রীরাধার প্রধানা সখি ললিতা। আর আর সখিবৃন্দ যেন মণ্ডলী করিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। শ্রীমন্দির দেখিলেন শ্রীরাসমণ্ডল। তিনি এইরূপ ভাবে জগন্নাথ দর্শন করিয়া আনন্দস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার শরীর নিস্পন্দ,—চক্ষে পলক নাই।

গোবিন্দ প্রভুর নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বরূপ গোসাঞি এবং রামানন্দ রায় তাঁহার পশ্চাতে, অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দেখিতেছেন। স্বরূপ মহাপ্রভুর শ্রীমুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। পাছে মহাপ্রভু আছাড় খাইয়া পড়িয়া যান, এই ভয়ে তিনি তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাড়াইলেন। রামানন্দ রায়কে অপর পার্শ্বে দাড়াইতে বলিলেন। কাশীশ্বর, জগদানন্দ প্রভৃতি প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। হঠাৎ মহাপ্রভু আচম্বিতে হা কৃষ্ণ বলিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন,—অমনি সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া কোলে করিয়া সেখানে বসিলেন। স্বরূপ গোসাঞির ক্রোড়ে মূর্চ্ছাগত প্রভুর শ্রীবদন,—রামানন্দ বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা ব্যজন করিতেছেন, গোবিন্দ করঙ্গের জলের ছিটা প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে দিতেছেন। প্রভুর প্রেমমূর্চ্ছা অপগত হইলে নয়ন মেলিয়াই স্বরূপকে সম্মুখে দেখিলেন, তাঁহাকে কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিলেন "স্বরূপ আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ কোথায় গেলেন? এই যে আমি তাঁহাকে রাসমণ্ডলে দেখিতেছিলাম" এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। স্বরূপগোসাঞি প্রভুর তাৎকালিক ভাব বুঝিয়া উত্তর করিলেন "চল, তোমাকে কৃষ্ণের নিকটে লইয়া যাই"। অমনি তিনি সশব্যস্তে উঠিলেন। তাঁহাকে লইয়া তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ বাসায় আসিলেন।

মহাপ্রভুর নিজ বাসা কাশীমিশ্রের বাটী। এই বাটীর ভিতরে একটী প্রকোষ্ঠ আছে,—তাহাকেই গম্ভীরা বলে। মহাপ্রভু যখন বাহির প্রকোষ্ঠে বসিলেন, তিনি অন্যমনস্ক, ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন,—থাকিয়া থাকিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন,—এক একবার এদিক ওদিক চাহিতেছেন, আর স্বরূপের প্রতি চাহিয়া কাতর বচনে কহিতেছেন "আমার কৃষ্ণ কৈ?" স্বরূপ গোসাঞি ও রাম রায় দুই জনে পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভুকে ধরাধরি করিয়া গম্ভীরার মধ্যে লইয়া গেলেন। তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থাই করিলেন।

গম্ভীরার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণবিরহজর্জ্জরিত মহাপ্রভু আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে স্বরূপ গোসাঞি এবং রামানন্দ রায় দুইজনে আসন গ্রহণ করিলেন,—তখন রাত্রি এক প্রহর। প্রকোষ্ঠ মধ্যে একটী ঘৃতের দীপ মৃদুভাবে জ্বলিতেছে। তিন জনেই নীরব। প্রকোষ্ঠ মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। সেই পবিত্র নিরবতা ভঙ্গ করিয়া কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর মহাপ্রভু স্বরূপ গোসাঞিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"পিয়ায় পিরীতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবু ত দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পানু॥"

স্বরূপ! তুমি যে আমাকে প্রবোধ দাও,—বলত, আর কতকাল তুমি এইরূপ প্রবোধ দিবে? আমার মন যে আর প্রবোধ মানে না,—তোমরা তাহা বুঝ না,—আমার দুঃখ না বুঝিয়া তোমরা দুঃখিত হও। কিন্তু আমি কি করি এখন বল দেখি? কৃষ্ণ দেখা দিয়ে পলাইলেন,—আসব বলে গেলেন, আর আসিলেন না,—এদুঃখ কি প্রাণে সহে? এই জগমাঝে আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে? আমার প্রাণ বড়ই কঠিন, তাই কৃষ্ণবিরহে এখনও বেচে আছি। আমি আর এপ্রাণ রাখিব না—কৃষ্ণবিরহদুঃখ সহ্য করা অপেক্ষা আমার মরণ মঙ্গল"। এইরূপ মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি করিতে করিতে মহাপ্রভু ভূমিতলে ধুলায় পড়িয়া আছাড়ি বিছাড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন সশব্যস্তে দুই জনে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন "প্রভু! কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কখন যান না,—তিনি ত বৃন্দাবনেই আছেন"। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণবিরহকাতর প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল, তিনি সহর্ষে গদগদ বচনে ভাবভরে বলিলেন "কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন? তবে আর কি? চল আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল। সখি! আমার বেশ বনাইয়া দেও, আর বিলম্ব করিও না,—তোমার হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি, আমাকে শীঘ্র কৃষ্ণসন্নিধানে লইয়া চল"। এই বলিয়া কৃষ্ণপাগলিনী শ্রীরাধিকার ভাবে প্রেমাবেগে মহাপ্রভু স্বরূপ গোসাঞির দুটি হাত ধরিলেন। স্বরূপ গোসাঞি এবং রামানন্দ রায় কি করিবেন ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে ভাবনিধি প্রভু পুনরায় বলিলেন "সখি থাক্ —আর বেশে কাজ নাই।

প্রাণবল্লভের কাছে যাব,—তাহাতে আবার বেশের প্রয়োজন কি? এই দেখ সখি। আমি সর্ব্বাঙ্গে কত ভূষণ পরিয়াছি এই বলিয়া প্রভু ধীরে ধীরে এই গানটি মধুর স্বরে গাইলেন।

কানু পরশমনি আমার॥ ধ্রু।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন॥
বদনের ভূষণ আমার তার গুণ গান।
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন॥
ভূষণ কি আর বাকি আছে?
আমি শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রহার পরিয়াছি গলে॥ (১)

মহাপ্রভু রাধাভাবে একবারে বিহ্বল হইয়াছেন, তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি একবার স্বরূপ গোসাঞির হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেছেন, "ললিতে! তুই কৃষ্ণদরশনে যাইতে বিলম্ব করিতেছিস কেন? আবার রামানন্দ রায়ের হাত ধরিয়া কাতর স্বরে বলিতেছেন, "বিশাখে! তুই কৃষ্ণদরশনে যাবি কি না আমাকে বল্"। দুই জনেরই বিলম্ব দেখিয়া মহাপ্রভু সক্রোধে বলিলেন "তোরা যাস্ আর না যাস্, আমি এই কৃষ্ণদরশনে বাহির হইলাম" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন, এবং প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। মহাপ্রভুর ভাব বুঝিয়া স্বরূপ গোসাঞি তাঁহার ভাবোচিত বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটী গান ধরিলেন যথা—

নব অনুরাগিনী রাধা। কিছু না মানয়ে বাধা॥
একলি করল পয়ান। পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মনিময় হার। উচকুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কন মুদরী। পথহি তেজল সগরি।
মনিময় মঞ্জরি পায়। দূরহি ত্যজি চলি যায়॥
যামিনী ঘোর আঁধিয়ার। মনমথ হিয়া উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারল বাট। প্রেমক আয়ুধ কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান। ঐছন না দেখি আন॥

প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু গান শুনিয়া চমকিয়া সেখানেই থমকে দাঁড়াইলেন। তখন রামানন্দরায় সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার কানের নিকট মুখ দিয়া চুপি চুপি বলিলেন "প্রভু, তুমি কোথা যাইবে? এখনও রাত্রি বেশী হয়নি। জটিলা বুড়ি এখনও জাগিয়া আছে। সে আগে নিদ্রা যাউক,—তবে আমরা যাইব।" কৃষ্ণ-অভিসারিণী ভাবনিধি মহাপ্রভু অমনি চমকিত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে গিয়া বসিলেন এবং চুপি চুপি কথা বলিতে লাগিলেন। রামানন্দ ও স্বরূপ দুই জনেই তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন। ভাবনিধি মহাপ্রভু এক্ষণে কিছু শান্ত হইয়াছেন, কথঞ্চিৎ ভাব সম্বরণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব-চাপল্য মনে করিয়া কিছু লজ্জিতও হইয়াছেন। তিনি স্বরূপ গোসাঞির হাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "স্বরূপ! আমি কি তোমাদের সঙ্গে কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি? আমি কি করিতেছিলাম, কি বলিতেছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি কি প্রলাপ বকিতেছি? আমার ত কিছুই মনে নাই। স্বরূপ! রামরায়! তোমাদের আমি কত না কষ্টই দেই। তোমরা আমাকে বড় ভালবাস, তাই আমার এত উপদ্রব সহ্য কর। কি দিয়ে আমি তোমাদের এ ঋণ শোধ দিব?" এই বলিয়া মহাপ্রভু অধোবদনে অঝোরনয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। সে দিন রাত্রিতে দুইজনে মিলিয়া মহাপ্রভুকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত অবুঝের মত কথা বলিতে লাগিলেন। যেমন সরলা নবানুরাগিনী নববালা মনের ভাব কিছুতেই গোপন করিতে পারে না, মহাপ্রভুও তাঁহার মনে যখন যে ভাবটি উদয় হইতেছে, তাহা তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়কে না বলিয়া থাকিতে পরিতেছেন না। ভাবনিধি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবদনে ভাবের অনন্ত তরঙ্গ খেলিতেছে। রসিকভক্তবর স্বরূপ ও রামরায় তাহা দেখিয়া মনে মনে কত না আনন্দ পাইতেছেন। তাঁহারা মহাভাব শ্রীরাধিকাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন।

(১) এই মধুর পদটি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর রচিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ঢাকা নিবাসী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত দ্বিতীয় ভাগ সঙ্গীত মুক্তাবলী গ্রন্থের ২৬২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার এই কথা লিখিয়াছেন, এবং প্রাচীন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় গৌরভক্তপ্রবর গোলকগত রাজীবলোচন রায় ইহার কিছু বিচার করিয়া ইহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বাঙ্গালী ছিলেন। বাংলা পদ রচনা করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার রচিত বহু শ্লোক আছে। বাংলা পদ যে থাকিবে না, একথা কাজের কথা নহে। গ্রন্থকার।

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা গোবিন্দকে ডাকিয়া মহাপ্রভুর শয়ন ও নিদ্রার ভার তাঁহার উপর দিয়া দুইজনে নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

—:০:—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণন।

(দ্বিতীয় চিত্র)

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণনে অশক্ত হইয়া পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী ক্ষান্ত দিয়াছেন,—অন্যে পরে কা কথা। পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণনের চেষ্টাও জীবাধম গ্রন্থকারের পক্ষে ধৃষ্টতা। কেবলমাত্র মহাজনবাক্য উদ্ধৃত করিব।

মহাপ্রভু এক্ষণে তিনটি ভাবে কোনক্রমে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেছেন। ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ যখন মহাভাবে মগ্ন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না,—যখন তাঁহার অর্দ্ধ বাহ্যজ্ঞান,—তখন কিছু জ্ঞান থাকে,—এই সময়ে তিনি প্রলাপ বাক্যাদি বলেন। আর যখন তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি থাকে,—তখনকার অবস্থা সহজভাব। এই শেষোক্ত ভাবে তিনি দিবারাত্রির মধ্যে অল্পক্ষণই থাকেন। এই সময়েই তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতেন।

একদিন কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধ মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছেন। তিনি জগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণ সকল (১) একে একে তাঁহার মনমধ্যে অকস্মাৎ উদয় হইল,—সেই গুণস্মৃতিতে তাঁহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তুলিল,—শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণে তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষিত হইল। তাঁহার চক্ষুকর্ণ, ত্বক্‌, নাসিকা ও জিহ্বা কৃষ্ণগুণরসে বিহ্বল হইল। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণে তাঁহার তনু ও মনকে পাঁচ দিকে টানিতে লাগিল। তিনি প্রেমাবেশে তৎক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। স্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাসায় লইয়া আসিলেন। এইসময় জগন্নাথদেবের উপলভোগ হইল।

বাসায় আসিয়া প্রেমমূর্চ্ছিত মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া প্রেমাবেগে স্বরূপ ও রামরায়ের গলা ধরিয়া নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণ স্মরণ করিয়া মহাপ্রভু প্রেমগদগদস্বরে গোবিন্দ লীলামৃতের নিম্নলিখিত শ্রীরাধার উক্তি সখি বিশাখার প্রতি এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—

> সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা চিত্তাদ্রি সংপ্লাবকঃ
> কর্ণানন্দি সনর্ম্ম রম্য বচন কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ॥
> সৌরভ্যামৃত সংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ
> শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ সকর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে॥

অর্থ। হে সখি! যিনি সৌন্দর্য্যামৃত সাগরের তরঙ্গদ্বারা ললনাগণের চিত্ত পর্ব্বত প্লাবন করেন,—যাঁহার কর্ণানন্দী সনর্ম্ম রম্যবচন—যাঁহার অঙ্গ কোটী চন্দ্র হইতেও শীতল,—যিনি স্বীয় অঙ্গ সৌরভ-বন্যার দ্বারা জগৎ সংপ্লাবিত করেন,—এবং যাঁহার অধরামৃত অমৃত হইতেও রম্য এবং লোভনীয়, সেই গোপেন্দ্রনন্দন বলপূর্ব্বক আমার পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ করিতেছেন।

কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু স্বয়ং এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার মর্ম্মী ভক্ত দুইজনকে শুনাইলেন। কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর এই ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা—

> কৃষ্ণরূপ শব্দ স্পর্শ, সৌরভ অধর রস
> যার মাধুর্য্য কথন না যায়।
> দেখি লোভী পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন
> চড়ি পাঁচে পাঁচ দিকে ধায়॥
> সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ।
> মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট—দস্যুগণ
> সবে কহে হরে পরধন। ধ্রু॥

(১) চক্ষে রূপ, কর্ণে গীত, নাসিকায় ঘ্রাণ, জিহ্বায় রস, ত্বকে স্পর্শ। শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চ অপ্রাকৃত গুণ।

এক অশ্ব এক ক্ষণে, পাঁচে পাঁচ দিকে টানে
এক মন কোন দিকে ধায়।
এক কালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে
এত দুঃখ সহন না যায়॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ইহা সবার কাঁহা দোষ
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন॥
কৃষ্ণরূপামৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥
কৃষ্ণবচন মাধুরী, নানা রস নর্ম্মধারী
তার অন্যায় কথন না যায়।
জগত নারীর কানে, মাধুরী গুণে বান্ধি টানে
টানাটানি কানের প্রাণ যায়॥
কৃষ্ণঅঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন॥
কৃষ্ণঅঙ্গ সৌরভভর মৃগমদ মদহর
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব ধন।
জগত নারীর নাসা, তার ভিতরে করে বাসা
নারীগণে করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দস্মিত
সমাধুর্য্যে হরে নারীমন।
অন্যত্র ছাড়য় লোভ, না পাইলে মনঃ ক্ষোভ
ব্রজনারীগণের মূলধন।

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের কথা, কবিরাজ গোস্বামী কেবল ছন্দবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণের অপূর্ব্ব মাধুরী কি ভাবে তাঁহার ভক্তগণের পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে,—তাঁহার হৃদিপ্রাণমনহারী গুণাবলী ভক্তগণকে কি রূপে ও কি ভাবে মুগ্ধ করে,—তাহাই মহাপ্রভু বুঝাইলেন। কৃষ্ণপ্রেমে যখন জীব মুগ্ধ হয়, তাঁহার আর অন্য কিছুই ভাল লাগে না। প্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য,—অপ্রাকৃত কৃষ্ণমাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনাই হয় না। শ্রীকৃষ্ণনামের মাধুরীতে যখন জগজ্জীব মুগ্ধ,—শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমায় যখন জগত মহিমান্বিত,—তখন তাঁহার রূপগুণমাধুরী-স্মৃতিতে পঞ্চেন্দ্রিয় যে প্রেমোন্মত্ত হইবে, তাহার আর কথা কি? সাধক কবিবর চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতরে গিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়।
পাশরিতে চাহি মনে, পাশরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচয়॥

কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু দুইহস্তে স্বরূপ ও রামরায়ের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া কৃষ্ণগুণমাধুর্য্য সঙরিয়া প্রেমাবেগে বিলাপ করিতেছেন, আর ব্যাকুল প্রাণে বলিতেছেন –

——"শুন স্বরূপ রাম রায়।
কাঁহা করোঁ কাহা যাও, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও
দুঁহে মোরে কর সে উপায়॥"

এইরূপ মহাপ্রভুর অবস্থা এখন প্রতি দিনই দৃষ্ট হয়। দিনের বেলা তিনি একরূপ থাকেন, রাত্রি হইলে তাঁহার কৃষ্ণবিরহজ্বরের অদ্ভুত বিকারলক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। স্বরূপ ও ও রামানন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দের শ্লোক, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ভাবোচিত পদ গাইয়া তাঁহার কৃষ্ণবিরহ-ব্যাধির

ঔষধ প্রদান করেন। কৃষ্ণমাধুর্য্যের একেইত স্বাভাবিক বল, যাহাতে নরনারীর মন কেন,—স্থাবর জঙ্গমাদিও চঞ্চল হয়। তাহার উপর স্বরূপ দামোদরের সুকণ্ঠের প্রেমসঙ্গীত, এবং রামানন্দরায়ের সুললিত সুন্দর সুছন্দে শ্লোকগীতি,—ইহাতেই কৃষ্ণবিরহজর্জ্জরিত মহাপ্রভুর প্রাণ রক্ষা হইতেছে। তাঁহার এই অকথন কৃষ্ণবিরহব্যাধির ইহাই এখন একমাত্র ঔষধ,—তিনি এখন যতই কৃষ্ণরূপ-গুণ-লীলা-কথা-পিপাসা-কাতর হইয়া জল জল করিতেছেন, স্বরূপ ও রামরায় ততই তাঁহাকে কৃষ্ণকথা-জল পান করাইতেছেন,—কিন্তু তাঁহার পিপাসার শান্তি না হইয়া কেবলই বৃদ্ধি হইতেছে।

এই মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥

শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপসুধা পান করিয়া যেমন চক্ষের তৃপ্তিলাভ হয় না,—যত দেখ ততই দেখিতে ইচ্ছা করে,—সেইরূপ তাঁহার গুণকথা শুনিয়াও কর্ণের পরিতৃপ্তি হয় না,—যত শুন ততই আরও শুনিতে ইচ্ছা করে। মহাজন কবি গাইয়াছেন—

জনম অবধি হাম, ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবনহি শুনল
শ্রুতি-পথ পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়া রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল॥

কৃষ্ণপ্রেমাব্ধিমগ্ন মহাপ্রভু বসিয়া আছেন, রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে,—স্বরূপ গোসাঞি ও রামানন্দরায় তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে নিরন্তর কৃষ্ণকথা শুনাইতেছেন। গোবিন্দ দ্বারদেশে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। মহাপ্রভুকে শয়ন করাইবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়াছেন,—তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বরূপকে কহিলেন,—"স্বরূপ! তোমারাই কৃষ্ণবিরহদগ্ধ আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণটির রক্ষাকর্ত্তা,—তোমাদের ঋণ আমি এ জীবনে শুধিতে পারিব না,—তোমরা আমাকে একান্ত ভালবাস,তাই আমার জন্য এত কষ্ট করিয়া রাত্রি জাগরণ কর। এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে, তোমরা নিজ নিজ গৃহে যাইয়া বিশ্রাম কর"। মহাপ্রভুর এখন বাহ্যাবস্থা,—ক্ষণেকের জন্য হইয়াছে, তাই একথা বলিতেছেন। স্বরূপ উত্তর করিলেন "প্রভু হে! এক তিলার্দ্ধের জন্যও তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে আমাদের মন সরে না, তবে তোমাকে সুস্থ দেখিলে,—তুমি একটু নিদ্রা যাইলে,—আমাদের মনে বড় আনন্দ হয়,—আমরা সুস্থির হইয়া বাসায় যাইতে পারি। আজ তোমাকে একটু সুস্থির দেখিতেছি, তুমি নিদ্রা যাও,—আমরা বিদায় হইতেছি"। মহাপ্রভু সজল নয়নে কাতরকণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিলেন "আমি আবার সুস্থ হব,—আমার আবার নিদ্রা হবে,—প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের ইচ্ছা নয় যে আমি সুস্থির হই"। স্বরূপ এবং রামানন্দ আর কথা কহিলেন না। গোবিন্দের উপর মহাপ্রভুর শয়নের ভারার্পণ করিয়া উভয়ে তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া বাসায় গেলেন। কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একাকী শয়ন করিয়া গুন গুন করিয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ সে বিরহ গানের ঝঙ্কার কিছু কিছু শুনিতে পাইলেন। মহাপ্রভু পদ ধরিয়াছেন—

সুখের লাগিয়া, এঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥

সমস্ত রাত্রি মহাপ্রভু জাগিয়া জাগিয়া কৃষ্ণনাম জপ করেন, কৃষ্ণগুণ গান করেন, আর মধ্যে মধ্যে কাতরস্বরে রোদন করেন। রাত্রি প্রভাত হইতে বহু বিলম্ব। স্বরূপ ও রামরায়ের সঙ্গে থাকিলে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান থাকে,—একাকী থাকিলে তিনি প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন। তখন প্রেমোন্মাদের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় (১)। তিনি তখন তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অঙ্গস্পর্শসুখ যেন অনুভব করিতেছেন, এইরূপ প্রেমানন্দে তিনি বিভোর থাকেন।

(১)। তা সবার সঙ্গে প্রভুর থাকে বাহ্যজ্ঞান।
তারা গেলে পুন হৈল উন্মাদ প্রধান॥ চৈঃ চঃ

প্রত্যুষে উঠিয়াই প্রেমাবেশে তিনি দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া জগন্নাথ দর্শনে গেলেন। সিংহদ্বারের দ্বারবানকে দেখিয়াই মহাপ্রভু পরম প্রেমভরে তাঁহার হাত দুখানি ধরিয়া কহিলেন —"সখি! আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ কোথায়? আমাকে একবার দেখাও"। তাঁহার ভাব,—দ্বারবান সখি, তাঁহার মন-চোরা কৃষ্ণের সন্ধান জানে। দ্বারবান তাঁহাকে উত্তমরূপ জানে ও চিনে। সে জানে জগন্নাথদর্শনে প্রভুর অতিশয় আগ্রহ, এবং অত্যন্ত আনন্দ। তাই সে মহাপ্রভুর হাত ধরিয়া জগমোহনে লইয়া গেল,—তিনি তাহার হাত ছাড়িলেন না,—তাঁহার মুখে সেই একই কথা "সখি! আমার প্রাণ-নাথকে দেখাও (১)" দ্বারবান জগন্নাথকে দেখাইয়া দিয়া বলিল "ঐ দেখ! জগন্নাথ,—ঐ দেখ নীলাচলনাথ,—ঐ দেখ তোমার প্রাণনাথ।" মহাপ্রভু আবেশভরে গরুড় স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া জগন্নাথকে দেখিতেছেন গোপবেশ মুরলীবদন ব্রজেন্দ্রকুমার রাধানাথ! তিনি জড়বৎ নিশ্চেষ্টভাবে প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্রের সুধা পান করিতেছেন,—তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত কমল নয়নদ্বয় জগন্নাথ দেবের শ্রীবদনে যেন লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভুর এই লীলারঙ্গটিও রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যস্তবকল্প-বৃক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন। যথা—

> ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে।
> ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।
> দ্রুতং গচ্ছন্ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্-
> ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

অর্থ। "হে সখে! আমার প্রাণকান্ত কৃষ্ণ কোথায় একবার শীঘ্র দেখাও" জগন্নাথের দ্বারপালকে এইরূপ প্রেমোন্মত্তভাবে বলিলে, তদুত্তরে দ্বারপাল "তদীয় প্রিয়তমকে দর্শন করিবে'ত এখনি চল" এই বলিয়া উত্তর করিলে যিনি দ্বার-রক্ষকের হস্তপ্রান্ত ধারণ করিয়া জগন্নাথ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে আনন্দে উন্মত্ত করিতেছেন।

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের শ্রীবদনসরোজ দর্শন করিতেছেন,—এমন সময় গোপাল-বল্লভভোগের সময় উপস্থিত হইল,—ভোগ আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভোগ সমাপ্ত হইলে জগন্নাথের সেবকগণ প্রসাদ লইয়া তাঁহার বাসায় আসিলেন। মহাপ্রভুও ভোগ আরতি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলেন। বাসায় আসিয়া মহাপ্রভুর গলদেশে প্রসাদী মালা পরাইয়া তাঁহার শ্রীহস্তে সেবকগণ প্রসাদ দিলেন। এই সকল প্রসাদ বহুমূল্য এবং সর্ব্বোত্তম, জগন্নাথের সেবকগণ মহাপ্রভুকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন,—প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। তাঁহারা জিদ করিলেন "প্রভু, এই প্রসাদ গ্রহণ কর, আমরা দেখিয়া নয়ন সার্থক করি"। মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহরসে মগ্ন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত অতিশয় ভক্তি ও যত্ন সহকারে অত্যল্প পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অগ্রে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক পরে জিহ্বাগ্রভাগে দিলেন,—আর বাকি প্রসাদ গোবিন্দ যত্ন করিয়া রাখিলেন। প্রসাদের অত্যুত্তম স্বাদ পাইয়া মহাপ্রভু প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইলেন,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূরিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত জ্ঞানে তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইলেন। কিন্তু জগন্নাথের সেবকগণকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি তখন নিজ ভাব সম্বরণ করিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে "সুকৃতিলভ্য ফেলালব" এই কথা দুইটি বারম্বার উচ্চারিত হইতে লাগিল। জগন্নাথের সেবকগণ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "একথার অর্থ কি প্রভু?" মহাপ্রভু প্রেমাবেশে বলিতে লাগিলেন—

> ——"এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
> ব্রহ্মাদি দুর্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত।
> কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার ফেলা নাম।
> তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান॥
> সামান্য ভাগ্য হইতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
> কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥
> সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য।
> সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের মহিমা বর্ণনা করিয়া

---

(১) তুমি মোর সখি দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত॥ চৈঃ চঃ

অতিশয় সম্ভ্রম ও আদরের সহিত জগন্নাথের সেবকগণকে বিদায় দিলেন,—তাহার পর তিনি উপলভোগ দর্শন করিতে গেলেন। স্বভাববশে তিনি মধ্যাহ্নকৃত্যাদি করিলেন, প্রসাদও পাইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরুক রহিয়াছে,—প্রেমানন্দে তাঁহার মন গরগর, প্রেমাবেশে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ টলমল করিতেছে,—অতিকষ্টে তিনি ভাব সম্বরণ করিতেছেন। তিনি যেন আপনাকে আপনি গোপন করিতেছেন। এই ভাবে সন্ধ্যা আগত হইল, মহাপ্রভু সন্ধ্যা-কৃত্যাদিও স্বভাববশে সমাপন করিলেন। সন্ধ্যার পর ভক্তগণ একে একে তাঁহার নিকটে আসিলেন। ইহাঁদের মধ্যে পুরী ও ভারতী গোসাঞি ছিলেন না,—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আছেন,—রামানন্দ রায়,—স্বরূপ গোসাঞিও আছেন,—জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর পণ্ডিতও আছেন। গোপালবল্লভভোগের যে সুন্দর প্রসাদ পাইয়া মহাপ্রভুর মনে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, সেই প্রসাদ গোবিন্দ অতি যত্নে রাখিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে, সেই অপূর্ব্ব স্বাদযুক্ত প্রসাদ কিঞ্চিৎ পুরী ও ভারতী গোসাঞিকে পাঠান হইল। অবশিষ্ট তাঁহার আদেশে উপস্থিত ভক্তগণকে গোবিন্দ বণ্টন করিয়া দিলেন। সকলেই এই অপূর্ব্ব প্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদ, এবং সৌগন্ধ অনুভব করিয়া প্রেমানন্দে মত্ত হইলেন,—সকলেরই আশ্চর্য্য বোধ হইল — এমন উত্তম স্বাদযুক্ত প্রসাদত কখনও পান নাই। প্রেমাবেশে মহাপ্রভু তখন সর্ব্বভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

——এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ এলাচি লবঙ্গ গব্য॥
রসবাস (১) গুড়ত্বক (২) আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব॥
সে সে দ্রব্য এত স্বাদ গন্ধ লোকাতীত
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত॥
আস্বাদ দূরে রহু গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ॥

(১) কাবাবচিনি (২) দারুচিনি।

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহা সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদ অন্য বিস্মারণ।
মহা মাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥
অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সংপ্রাপ্তি।
সবে ইহা আস্বাদ কর করি মহাভক্তি॥' চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে প্রসাদ-মহিমা শুনিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন প্রেমাবেশে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া শ্লোক পাঠ করিতে আদেশ করিলেন,—রামানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি ছন্দবন্ধে সুর করিয়া আবৃত্তি করিলেন।

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতং।
ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতং॥

অর্থ। শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজগোপীবৃন্দ বলিতেছেন "হে বীর। তোমার সেই সুখার্পিত মুরলী চুম্বিত, প্রেমরসোদ্দীপক, শোকাপনোদন মানবের ইতর সুখেচ্ছাবিস্মারক অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর।

এই শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণাধরামৃতলোভী মন অধিকতর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রেমাবেগে স্বয়ং শ্রীরাধিকার উক্তি গোবিন্দলীলামৃতের আর একটী শ্লোক পাঠ করিলেন, সেই শ্লোকটী এই :—

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালি তৃষ্ণাহর
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্য-ফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি জিহ্বা স্পৃহাং॥

অর্থ। শ্রীমতি রাধিকা বিশাখা সখিকে বলিতেছেন "হে সখি। যাঁহার অধরে অমৃতরস সদা বিরাজমান, যাহা লাভ করিতে পারিলে, নিরুপম ব্রজকুলাঙ্গনাগণের ইতর রসে ইচ্ছা হয় না, বহু সুকৃতি না থাকিলে, সে অপূর্ব্ব অধরামৃতের কনিকা মাত্রও সুলভ্য নয়, এবং যাঁহার তাম্বুল চর্ব্বিত সুধার আস্বাদনকে পরাভব করিয়াছে, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ অদ্য আমার জিহ্বার স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন।

এখন পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম ব্যাখ্যা মহাপ্রভু স্বয়ং করিতে বসিলেন। পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামীর ভাষায় তাহা শুনুন। কৃষ্ণাধরামৃতলোলুপ রসিকশেখর মহাপ্রভু প্রেমাবেশে ও প্রেমাবেগে ব্যাখ্যা করিতেছেন—

তনু মন করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত লোভ,
হর্ষ শোকাদি ভার বিনাশয়।
পাশরায় অন্যরস জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়।
নাগর! শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ
বিচারিতে সব বিপরীত। ধ্রু।।
আছুক নারীর কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্য রস সব পাশরায়।
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে
তোমার অধর বড় বাজীকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়মন
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর।
বেণু বড় পুরুষ হঞা পুরুষাধর পিয়াইয়া,
গোপীগণে জানায় নিজপান।
অয়ে! শুন গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ধর্ম্ম ভয় ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু আকর্ষিয়া পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহি ডর,
অন্যে দেখো তৃণের সমান॥
অধরামৃত নিজ স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয় ত্রিজগত মন।
আমরা ধর্ম্মে ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন॥
নীবী খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করায় তোমার দাসী, শুনি লোক করে হাসি,
এই মত নারীরে নাচায়॥
শুষ্ক বাঁশের লাঠিখান এত করে অপমান
এত দশা করিলে গোসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাঞি॥
অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় কৃষ্ণ ফেলা॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কেবা পাতিয়া।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতি তার লব পায়॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃতসার,
গোপী মুখ করে আলবাটী॥
এ তোমার কুটী নাটী, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণু দ্বারে কাহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত দান॥

মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণন ইহারই নাম। ইহার বর্ণনা ত দুঃসাধ্য,—ভাব হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্য নহে। এই প্রলাপের মধ্যে যে কি মধু আছে, তাহা রসিকভক্ত আস্বাদন করিবার চেষ্টা করেন। এই মধুময় ও মধুগন্ধময় মহাপ্রভুর প্রলাপ-কাহিনী সহজ বস্তু নহে। শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-রস তাঁহার সৃষ্ট জীবের কিরূপ হৃদয়োন্মত্তকারী, মনমোহনকারী সর্ব্বেন্দ্রিয় উত্তেজনকারী, তাহা মহাপ্রভুর এই প্রলাপ-কাহিনী পাঠ করিলেই কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হয়। এই প্রলাপ-কাহিনী জীবজগতের অশেষ মঙ্গলকর,—জগজ্জীবের ত্রিতাপনাশক পরম শুভকর বস্তু। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! একটু স্থিরচিত্তে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক পরম আগ্রহসহকারে মহাপ্রভুর এই সকল

জগন্মঙ্গলকর নিগূঢ় প্রেমরসাত্মক প্রলাপকাহিনী সকল পাঠ করিবেন। তাঁহার চরণকমল স্মরণ করিয়া যখন ইহার মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিবেন, ভাবনিধি মহাপ্রভুর কৃপায় আপনিই এই সকল ভাবের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিবেন। ইহা কেহ বুঝাইতে পারিবেন না।

এইরূপ কৃষ্ণবিরহ-প্রলাপ করিতে করিতে মহাপ্রভুর হঠাৎ ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তিনি প্রণয়-কোপাবেগে এইসকল প্রলাপ বাক্য বলিতেছিলেন, এক্ষণে কিছু শান্তভাব ধারণ করিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেমোৎকণ্ঠা বাড়িল। তিনি রামানন্দরায়ের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া সোৎকণ্ঠচিত্তে প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন "রামরায়! এই যে আমি শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের কথা বলিলাম,—ইহা পরম দুর্লভ বস্তু। যাহার ভাগ্যে ইহার প্রাপ্তি হয়, তাহার মনুষ্য জীবন সার্থক। কিন্তু দেখিতেছি পরম যোগ্য ব্যক্তিও এই দুর্লভ বস্তু লাভে বঞ্চিত হয়, তথাপি তিনি নির্লজ্জ ভাবে লোভমাত্র সম্বল করিয়া জীবন ধারণ করেন। আর দেখি পরম অযোগ্য ব্যক্তিও সদাসর্ব্বদা এই অপূর্ব্ব বস্তু পান করিতেছে,—না জানি সে কোন্ তপস্যার ফলে এরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে? রামরায়! বল দেখি শুনি ইহার কারণ কি? তোমার মুখে ইহার মর্ম্ম কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে" এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন। রামানন্দরায় তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রজগোপিকার উক্তি, নিম্নলিখিত ভাবোচিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন,—

> গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু
> র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং।
> ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্ট রসং হ্রদিন্যো
> হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥ ভাগবত

অর্থ। শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুরী শ্রবণে কোন ব্রজবালা কহিলেন "হে সখিগণ! এই নিরস দারুময় বেণু পূর্ব্বজন্মে কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল? যেহেতু ইহা কেবলমাত্র ব্রজগোপীভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতরস স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতেছে। কুলবৃদ্ধ আর্য্যগণ স্ব স্ব কুলে ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিলে যেরূপ পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন ও প্রেমানন্দে রোমাঞ্চিত হন, সেইরূপ এই বেণুর সৌভাগ্য দেখিয়া যাহাদিগের জলে উহা পরিপুষ্ট জননী সদৃশ সেই তটিনীসকল বিকশিত কমলচ্ছলে রোমাঞ্চিত লক্ষিত হইতেছে এবং এই বেণু আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই মনে করিয়া বংশধরগণও মধুধারাচ্ছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে।

রামরায়ের মুখে এই শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া স্বয়ং ইহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কবিরাজ-গোস্বামীর ভাষায় মহাপ্রভুর এই প্রলাপপূর্ণ ব্যাখ্যা ভক্তি-পূর্ব্বকশ্রবণ করুন,—

> অহো ব্রজেন্দ্র নন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ
> অবশ্য করিব পরিণয়।
> সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন,
> সেই সুধা অন্য লভ্য হয়।
> গোপীগণ! কহ সব করিয়া বিচারে।
> কোন্ তীর্থ কোন তপ, কোন সিদ্ধ মন্ত্রজপ
> এই বেণু কৈল জন্মান্তরে। ধ্রু॥
> হেন কৃষ্ণাধর সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা (১)
> যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
> এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর পুরুষ জাতি
> সেই সুধা সদা করে পান॥
> যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে
> পিতে তারে ডাকিয়ে জানায়।
> তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
> ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়॥
> মানস গঙ্গা কালিন্দী ভুবন পাবন নদী,
> কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
> বেণুঝুটাধর রস, হৈয়া লোভে পরবশ,
> সেই কালে হর্ষে করে পান॥
> এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষসব তার তীরে,
> তপ করে পর উপকারী।

(১) বৃথা।

নদীর সেষ রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া
কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি।
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকশিত,
মধু-মিশে বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজ জাতি আর্য্যের যেন পুত্র নাতি
বৈষ্ণব হইলে আনন্দ বিকার॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে
এ অযোগ্য, আমর যোগ্য নারী।
যা না পাইয়া দুঃখে মরি, অযোগ্য দিয়ে সহিতে নারি
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥

এইরূপে কৃষ্ণবিরহব্যাকুলপ্রাণে মহাপ্রভু বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া আছেন। তাঁহার শ্রীবদনে কৃষ্ণবিরহকালিমার দাগ পড়িয়াই বর্ণ মলিন হইয়াছে,—দেহ ক্ষীণ হইয়াছে। ভক্তগণ দেখিতেছেন মহাপ্রভুর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। স্বরূপ গোসাঞি ও রামানন্দরায় তাঁহার এই বিরহদশা সম্বন্ধে যাহা জানেন, অন্যে তদ্রূপ জানেন না। তাঁহারা দুই জনেই মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহজ্বালা-দগ্ধ প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। মহাপ্রভু প্রলাপ করিতে করিতে প্রেমাবেশে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন,—ভক্তগণ দুঃখে হাহাকার করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর শ্রীবদনে জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। স্বরূপগোসাঞি বহির্ব্বাস দ্বারা ধীরে ধীরে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর চৈতন্যলাভ হইল। তিনি "হা কৃষ্ণ" বলিয়া ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোসাঞির ইঙ্গিতে অন্যান্য ভক্তগণ তখন মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া সেখান হইতে উঠিলেন। রাত্রি তখন প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। স্বরূপ ও রামরায় রহিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণকথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। স্বরূপ দামোদর চণ্ডীদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণের বংশী-মাহাত্ম্য সূচক একটী গান ধরিলেন যথা—

শ্যামের বাঁশরী, দুপুরে ডাকাতি
সবরস হরি নিল।
হিয়া দগ দগি পরাণ পাগলী
কেন বা এমতি কৈল॥
এমতি সে ভাব, না বুঝি তাহার
পিরীতি তাহার সনে।
গোপত করিয়া, কেন না রাখিল
বেকত করিল কেনে॥
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে
বসিল কানের বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী,
মানয়ে বরণ দাসী॥
কুলের করম, বৈরজ ধরম,
সবার মরম-ফাঁসি।
চণ্ডীদাস ভণে, এই সে কারণে,
কানু-সরবস বাঁশী॥

গান শুনিয়া মহাপ্রভু পুনরায় প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্যামের বাঁশীর গান যেন তাঁহার কর্ণের মধ্যে বাজিতে লাগিল,—সুধু কর্ণের মধ্যে বাজিয়া ক্ষান্ত হইল না—কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। তিনি প্রেমাবিষ্ট-ভাবে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। স্বরূপ গোসাঞির গান বন্ধ হইল। রামানন্দ রায় প্রেমমূর্চ্ছিত মহাপ্রভুর সেবাশুশ্রূষায় রত হইলেন। সকলে মিলিয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া স্বরূপের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া প্রেমগদগদস্বরে কহিলেন—"স্বরূপ! তোমার গানে যে কি মধু আছে, তাহা আমি জানি না। তোমার মধুকণ্ঠের মধুময় গীত শুনিলে আমি একেবারে পাগল হইয়া যাই। তোমার মুখে শ্যামের বাঁশীর গান শুনিয়া আমার প্রাণে শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে। এখন কি করি বল,—আমার বংশীবদন কৃষ্ণ কোথায়? কবে আমি তাঁহার দর্শন পাব?" এই বলিতে বলিতে কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি স্বয়ং পদ ধরিলেন—

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝোরে দি। পোড়ে প্রাণ কান্দে নিতি॥
শুইলে সোয়াথ নাহি নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥ চণ্ডীদাস।

স্বরূপ গোসাঞি ও রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর কাঁদ-কাঁদ স্বরে এই গানটি শুনিয়া মরমে মরিয়া গেলেন, তাঁহার দুঃখের দুঃখী তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ নাই। নানাবিধ উপায়ে তাঁহারা মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি কিন্তু নিতান্ত অবোধের মত কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আপনা আপনিই কিছু সংযত ও সুস্থির হইলেন। তখন প্রায় অর্দ্ধরাত্রি। মহাপ্রভুকে তখন কোনগতিকে শয়ন করাইয়া দুইজনে গৃহে গেলেন।

মহাপ্রভু গম্ভীরার মধ্যে শয়ন করিলেন। সমস্ত রাত্রি তিনি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া জাগরিত রহিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় তিনি আচম্বিতে তাঁহার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের বাঁশীর গান শুনিতে পাইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি অমনই উঠিয়া ভাবাবেশে গৃহত্যাগ করিয়া ছুটিলেন। গম্ভীরার তিন দিকের দ্বার বন্ধ,—সম্মুখের দ্বারে গোবিন্দ শুইয়া আছেন,—কোথা দিয়া যে প্রভু বাহিরে গেলেন,—তাহা তিনিই জানেন। প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু গিয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণে যেখানে বড় বড় তেলেঙ্গা গাভীগণ শুইয়া আছে, সেখানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। গোবিন্দের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তন্দ্রাবেশে তিনি মহাপ্রভুর শ্রীমুখের কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। এক্ষণে গৃহমধ্যে কোনরূপ তাঁহার শব্দ শুনিতে না পাইয়া এবং তাঁহাকে না দেখিয়া বাহিরে আসিয়া স্বরূপ গোসাঞিকে ডাকিলেন। স্বরূপ গোসাঞি আরও কয়েকজন ভক্ত সঙ্গে করিয়া গোবিন্দের সঙ্গে প্রদীপ জ্বালিয়া মহাপ্রভুর অন্বেষণে বাহির হইলেন। প্রথমে বাসার এদিকে ওদিকে দেখিয়া সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া—

"গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে দেখিল"।

তাঁহাকে কি ভাবে দেখিলেন তাহা শুনুন—

পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা ভিতরে আনন্দ বিহ্বল॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গসঙ্গ॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ ভীত এবং চমকিত হইলেন। ভীত হইবার কারণ তাঁহারা প্রভুর একরূপ প্রেম-বিকার অবস্থা পূর্ব্বে কখন আর দেখেন নাই, তাঁহার হস্তপদ পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,—তিনি কূর্ম্মাকৃতি হইয়া পড়িয়াছেন,—ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হইলেও যে ধ্রুব সত্য ও প্রকৃত ঘটনা, তাহা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। ইহা কি ভাব তাহা শাস্ত্রে লেখা নাই,—কেহ কখন দেখেন নাই—শুনেন নাই এই জন্যই তাঁহাদিগের ভয় এবং বিস্ময়। সুতরাং ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভক্তগণ ক্ষণেক কাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহারা যত্ন করিয়া কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না দেখিয়া, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাসায় লইয়া আসিলেন। কারণ সেই গাভীগণের মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের সর্ব্বস্বধন প্রভুকে ধূলা কাদায় লুণ্ঠিত অবস্থায় অধিকক্ষণ রাখিতে পারিলেন না। বাসায় লইয়া আসিয়া বহুক্ষণ শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার কানের নিকট উচ্চ করিয়া কৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর চৈতন্য হইল এবং তাঁহার হস্তপদ পুনরায় ধীরে ধীরে বাহির হইল,—তাঁহার পূর্ব্ববৎ শরীর হইল (১)। ইহা দেখিয়া ভক্তগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু তখন স্বয়ং ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া প্রেমাবেশে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। সম্মুখে স্বরূপ গোসাঞিকে দেখিয়া প্রেম-গদগদভাষে কহিলেন—

(১) চেতন পাইলে হস্ত পদ বাহির হৈল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হৈল॥ চৈঃ চঃ

———"আমা আনিলে তুমি কতি?
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আসি গেলা কুঞ্জ ঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
ভূষণ ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
গোপীগণ সহ বিহার হাস্য পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহা লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃত সম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি॥ চৈঃ চঃ

কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু বলিলেন, তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন — শ্যামের বংশীধ্বনি শুনিয়া মোহিত হইয়া তিনি ছুটিয়াছিলেন। সেখানে দেখিলেন তাঁহার প্রাণবল্লভ গোষ্ঠে বেণু বাজাইতেছেন,—সেই সঙ্কেত বেণুধ্বনি শ্রবণে কৃষ্ণ সঙ্গাভিলাষিণী শ্রীরাধিকা গৃহ ছাড়িয়া সখিগণসহ কুঞ্জে আসিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে অমনি কুঞ্জ কুটীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনিও গেলেন। তাঁহাদিগের অঙ্গে ভূষণ ধ্বনি গোপীগণের হাস্য পরিহাস ধ্বনি,—তাঁহার কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল। এমন সময়ে ভক্তগণ কোলাহল করিয়া উঠিলেন, এবং মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে যেন বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া আসিলেন।

এই যে মহাপ্রভুর কূর্ম্মাকৃতি প্রেম-বিকার ভাব,—তেলেঙ্গা গাভীগণের মধ্যে পতন,—এই যে তাঁহার মানসে শ্রীবৃন্দাবন গমন, রাধাকৃষ্ণের কেলিলীলা দর্শন,—এ সকলি অলৌকিক এবং অদ্ভুত লীলারঙ্গ। রসিক ভক্তগণ যখন ভাবে বিভোর হন, তখন তাঁহাদের দেহের অনুমাত্র অনুসন্ধান থাকে না। কিন্তু মহাপ্রভুর এই যে কূর্ম্মাকৃতি ধারণ ভাবে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ,--ইহা মানব বুদ্ধির অগম্য। মানসিক চিন্তাস্রোতের সম্বন্ধ মানবদেহে লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তজ্জনিত এরূপ ভাবে যে দেহের ভাবান্তর সাধিত হয়, তাহা এপর্য্যন্ত কেহ কখন কোন সাধক ও সিদ্ধ পুরুষে দেখেন নাই। মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ইহা নূতন দেখিলেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত লীলারঙ্গটিও তাঁহার স্তবকল্পবৃক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন; যথা—

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহা-
দ্বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

মহাপ্রভুর এখনও সম্পূর্ণ ভাবাবেশ রহিয়াছে। তিনি প্রেমাবেশে স্বরূপকে কহিলেন "স্বরূপ। আমার কর্ণে আমার কৃষ্ণের সেই বাঁশের স্বর এখনও যেন বাজিতেছে, কিন্তু তাহা তেমন করিয়া আর শুনিতে পাইতেছি না। তুমি আমার কর্ণের পিপাসা দূর কর,—শ্লোক পড়"। স্বরূপ-গোসাঞি তখন শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রজগোপীর উক্তি নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুম মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

অর্থ। ব্রজগোপীগণ, কহিলেন হে শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিলোক মধ্যে এমন স্ত্রী কে আছে যে তোমার অমৃতময় বেণুর কলগীতে বিমোহিত হইয়া এবং তোমার ত্রৈলোক্য বিমোহন অপরূপ সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ রূপরাশি দর্শন করিয়া স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? স্ত্রীজাতির কথা দূরে থাকুক, তোমার বেণুগীত শ্রবণ এবং অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া গো, দ্রুম, পক্ষী এবং মৃগগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়।

মহাপ্রভু এই শ্লোক শুনিয়া প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া স্বয়ং ইহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুন্দর ব্যাখ্যা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শুনুন—

নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয়?

কৈছে জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারীমন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া আর্য্যপথ ছাড়াইয়া
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণু দ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে
লজ্জাভয় সকল ছাড়াও।
এবে মোরে করি রোষ, কহ পরিত্যাগ দোষ
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও।
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ
এই সব শঠ পরিপাটি।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এসব কুটি নাটি॥
বেণুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত সম মিঠা বোলে,
অমৃত সম ভূষণ শিঞ্জিত।[১]
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥

কৃষ্ণপ্রেমাবেশকাতর মহাপ্রভু প্রণয়ক্রোধাবেশে শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার হৃদয় মহা ভাব সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছে,—তাঁহার মন মহাভাবের তরঙ্গে ভাসিতেছে, প্রাণ উৎকণ্ঠা-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মহাভাবের মহা জ্যোতির্ম্ময় ছটা শোভা পাইতেছে। রাধা-ভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যমহিমা-সূচক গোবিন্দলীলামৃতের শ্রীরাধিকার উক্তি আর একটী শ্লোক স্বয়ং পাঠ করিলেন। যথা—

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষি সচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষর পদার্থ-ভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারি বংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ! সখি তনোতি-কর্ণ-স্পৃহাং।

অর্থ। শ্রীরাধা কহিলেন "হে সখি! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি মেঘমন্দ্রবৎ গম্ভীর, এবং যাঁহার ভূষণশিঞ্জিত শ্রবণ-রসায়ন,—যাঁহার নর্ম্মোক্তি স্বল্পাক্ষরে বহু অর্থ ও ভাবব্যঞ্জক এবং নানা রসাভিব্যক্তি পূর্ণ,—যাঁহার বংশীর মধুর রব রমাদি দিব্যাঙ্গনা-গণেরও হৃদয় বিমোহনকারী, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আমার কর্ণস্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন।

মহাপ্রভু এই শ্লোকেরও ব্যাখ্যা স্বয়ং করিলেন। কবি-রাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শুনুন —

নবঘনধ্বনি জিনি, কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি,
যার গানে কোকিল লাজায়।
তার এক শ্রুতিকণে, ডুবায় জগতের কাণে
পুনঃ কাণ বাহুড়ি না আয়॥
কহ সখি! কি করি উপায়।
কৃষ্ণরস শব্দ গুণে, হরিল আমার কাণে
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়॥ ধ্রু॥
নূপুর কিঙ্কিণীধ্বনি হংস সারস জিনি
কঙ্কন ধ্বনি চটক লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কানে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায়॥
সেই শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর জীবন,
কর্ণ-চকোরী জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু নাহি পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে।
যে বা বেণুকলধ্বনি, একবার তাহা শুনি
জগন্নারী চিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনা মূলে হয় দাসী,
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥
যে বা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, তিঁহ যে কাকলি শুনি
কৃষ্ণপাশ আইসে প্রত্যাশায়॥
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায়॥
এই শব্দামৃতচারী, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণে ইহা করে পান।

১) শিঞ্জিত—ধ্বনি।

ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কানাকড়ি সম সেই কাণ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রেমাকুলচিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মহাপ্রভুর মনে নানারূপ উদ্বেগের ভাব উঠিল। উদ্বেগের ভাব উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে লিখিত আছে—

উদ্বেগো মনসঃ কম্প স্তত্র নিশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভ চিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্য স্বেদাদয় উদীরিতাঃ ॥

অর্থাৎ মনের উদ্বেগে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ,—স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে কৃষ্ণবিরহজনিত উদ্বেগভরে এই সকল ভাব লক্ষণ সকল সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইল। তাঁহার মন নানাভাবে বিষাদপূর্ণ। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে লিখিত আছে ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি এবং অপরাধজনিত যে অনুতাপ জন্মে তাহার নাম বিষাদ এই বিষাদের উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে (১)। প্রভুর বিষাদের লক্ষণ সকল তাঁহার ভক্তগণ সকলি দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ও শ্রীমুখে নানাভাবের মিলনজনিত এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ নবভাব দৃষ্ট হইতেছে এই সকল নানাভাবের নামও গ্রন্থে লিখিত আছে যথা—ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি ও মতি। অভীষ্টবস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তি স্পৃহা নিমিত্ত যে কাল বিলম্বের অসহিষ্ণুতা তাহাকে ঔৎসুক্য বলে (২)। ভয়ানক শব্দবৎ প্রখর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ জন্মে তাহার নাম ত্রাস (৩)। এই ত্রাসে পার্শ্বস্থ বস্তুর আলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ এবং ভ্রমাদি হইয়া থাকে। জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং উত্তম বস্তু প্রাপ্তির অর্থাৎ ভগবৎ সম্বন্ধীয় প্রেমলাভ দ্বারা মনের যে পূর্ণতা অর্থাৎ অচাঞ্চল্য, তাহার নাম ধৃতি। ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হয় না (৪)। সদৃশ বস্তু দর্শন অথবা দৃঢ়াভ্যাস জনিত পূর্ব্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি, তাহার নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রূবিক্ষেপাদি ভাব হইয়া থাকে (৫)। শাস্ত্রাদি দ্বারা বিচারোৎপন্ন অর্থ নির্দ্ধারণকে মতি বলে। ইহাতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদন হেতু কর্ত্তব্যকরণ শিষ্যদিগকে উপদেশ দান এবং তর্ক বিতর্কেচ্ছা হইয়া থাকে (৬)।

এই সকল ভাব প্রাবল্যজনিত মহাপ্রভু এখন উন্মাদের মত হইলেন। ভাব সকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম শাবল্য।

"শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃস্যাৎ পরস্পরং"

উন্মাদের লক্ষণ সকল মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে, চরিত্রে ও ভাবে দৃষ্ট হইতে লাগিল। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।
অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থ চেষ্টিতং।
প্রলাপ ধাবণ ক্রোশ বিপরীত ক্রিয়াদয়ঃ ॥

অতিশয় আনন্দ, আপদ বিপদ, এবং বিরহাদি জনিত হৃদ্‌ভ্রমকে উন্মাদ বলে এই উন্মাদে অট্টহাস্য, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থ চেষ্টা, ধারণ, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদির লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তগণ দেখিতেছেন যে কৃষ্ণ-বিরহাতিশয্যে মহাপ্রভু উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্রীরাধিকার উক্তি একটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই শ্লোকটি এই—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ং।

---

(১) ইষ্টানবাপ্তিঃ প্রারব্ধ কার্য্যাসিদ্ধি বিপত্তিতঃ।
অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা ॥
তত্রোপায় সহায়ানুসন্ধি শ্চিন্তাচ রোদনং।
বিলাপ শ্বাস বৈবর্ণ্য মুখশোষাদয়োঽপিচ ॥

(২) কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তি স্পৃহাদিভি।
মুখ শোষ ত্বরা চিন্তা নিঃশ্বাস স্থিরতাদি কৃৎ ॥

(৩) ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্‌ঘোরসত্ত্বোগ্রনিঃস্বনৈঃ।
পার্শ্বস্থা লম্বরোমাঞ্চ কম্প স্তম্ভ ভ্রমাদি কৃৎ ॥

(৪) ধৃতিঃস্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞান দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদি কৃৎ ॥

(৫) যাস্যাৎ পূর্ব্বানুভূতার্থ প্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়া।
দৃঢ়াভ্যাসাদিনা বাপি সা স্মৃতি পরিকীর্ত্তিতা ॥
ভবেদত্র শিরঃ কম্পো ভ্রূবিক্ষেপা দয়োঽপি চ ॥

(৬) শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্থ মর্থ নির্দ্ধারণং মতিঃ।
অত্র কর্ত্তব্যাকরণং সংশয় ভ্রময়োশ্ছিদা ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

মধুর মধুর স্মেরাকারে মনো নয়নোৎসবে
কৃপণ কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে।

অর্থ — কৃষ্ণবিরহের চরমদশায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধিকা তাঁহার সখিগণকে কহিতেছেন "হে সখিগণ! এখন কি করিলে কৃষ্ণের দর্শন পাই বল,—তোমরাও দেখিতেছি আমার ন্যায় কাতরা তবে কাহাকেই বা আমার এই বিরহযাতনার কথা বলি? কৃষ্ণের আশায় যাহা করিয়াছি, সেই ভাল, আর নয়,—এখন তাঁহার কথা পরিত্যাগ করিয়া, অন্য সৎকথা বল। হায়! হায়! যাঁহার কথা শুনিব না বলিতেছি, তিনি যে আমার হৃদয় কন্দরে শয়ন করিয়া মধুর মধুর ঈষৎ হাসিতেছেন,—তাঁহার কথা ত্যাগ করা দূরে থাকুক, সেই মধুর হাস্যপূর্ণ মনোনয়নের আনন্দোৎসব শ্রীকৃষ্ণে আমার তৃষ্ণা চিরদিনই লাগিয়া আছে।

কৃষ্ণবিরহোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার ন্যায় মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণের প্রতি উদভ্রান্ত নয়নে চাহিয়া স্বয়ং উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া প্রেমাবেগে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় সেই অপরূপ প্রলাপ বাক্য শ্রবণ করুন,—

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যে বা তুমি সখিগণ, বিষাদে বাউল মন
কারে পুছোঁ কে কহে উপায়॥
হা হা সখি! কি করি উপায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়॥ ধ্রু॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাব মতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হবে মন।
ছাড়ি কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥

এই কথা বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুর মনে কৃষ্ণস্মৃতি পুনরায় উদিত হইল, এবং তাঁহার মনে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি বিস্মিতভাবে একবার ইতি উতি চাহিয়া পুনরায় কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন—

চাহি যারে ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিতে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে।
রাধা-ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিতে॥
কহে, যে জগত মোরে, সেই পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে।
ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিতি অন্য ভাব-সৈন্য,
উদয় হৈল নিজ রাজ্য মনে।
মনে হইল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে॥
মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মনোনেত্র রসায়নে,
কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্য সদ্গুণ সাগর।
হা হা শ্যাম সুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাস-বিলাস নাগর।
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই—

এই বলিয়া মহাপ্রভু উঠিয়া উন্মত্তের ন্যায় নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন। স্বরূপগোসাঞি তাঁহাকে দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া সজোরে ক্রোড়ে ধরিয়া টানিয়া আসনে বসাইলেন। মহাপ্রভু তখন প্রেমাবেশে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলেন। তাঁহার ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতেছে মাত্র। বহুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন স্বরূপের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া তিনি বলিলেন "স্বরূপ! গান কর,—কৃষ্ণবিরহে আমার প্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল,—তোমার গান শুনিলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয়"

স্বরূপ তখন গান ধরিলেন—

বঁধু ! কি আর বলিব আমি !
জীবনে মরণে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি,
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইনু দাসী ॥
শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে,
ও পদ করেছি সার।
ধন মান জন, জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার ॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ক্রটি, হয় শত কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা ॥
একূলে ওকূলে, দুকূলে গোকুলে,
আপন বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়।
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু এই গান শুনিযা কহিলেন "স্বরূপ ! এটি বড় সুন্দর আত্মনিবেদনের পদ। আর একটী গাও।" স্বরূপ পুনরায় মধুকণ্ঠে গান ধরিলেন,—

বঁধু ! তুমি যে আমার প্রাণ !
দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি দীন,
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহি দুঃখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ।
সতি বা অসতী, তোমারে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম
তোমার চরণ খানি ॥

মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া গান শুনিতেছেন,—স্বরূপ যে তাঁহার হইয়া এই সকল গান করিতেছেন। স্বরূপ আমার মনে ভাবের অনুসন্ধান পাইল কি করিয়া ? তখনি আমার সিদ্ধান্ত করিতেছেন, স্বরূপত আমার সখি,—সে জানিবে না ত আর আমার অন্তরের মর্ম্মব্যথা কে জানিবে ? স্বরূপ আমার মর্ম্মী সখী,—স্বরূপ আমার দরদের দরদিয়া। "স্বরূপ "স্বরূপ !" বলিয়া প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু দুটি বাহুদ্বারা প্রেমাবেশে তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তুমিই আমার কৃষ্ণবিরহ-দগ্ধ প্রাণ রক্ষা করিতে জান,—তুমিই এত দিন আমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ ! তোমার মধুকণ্ঠের মধুর গানে আমার শুষ্ক প্রাণে নব নব রসের সঞ্চার হয়,—সেই রসে আমার জীবন, প্রাণ, মন, হৃদয়, সকলি রসিত হয়,—তবে আমি বাঁচিয়া থাকি। স্বরূপ ! তুমি আমাকে এখন একটী গীতগোবিন্দের পদ শুনাও"। স্বরূপ গান ধরিলেন—

কথিত সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্ ॥
যামি হে কমিহ শরণং সখী-জন-বচন-বঞ্চিতা।
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসম-শর-কীলিতম্।
মম মরণমেব বরমতি বিতথকেতনা।

আপনার আমিত্ব লোপ করিয়াছেন, কিন্তু স্বরূপকে দেখিতে ঠিক স্বরূপগোসাঞি। তাহার মনে মনে লজ্জাও হইতেছে, কিন্তু মুখে কোন কথাই প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ অবস্থায় বহুক্ষণ গেল। রামরায় নীরবে বসিয়া ভাবনিধি মহাপ্রভুর ভাবরঙ্গ সকল দর্শন করিতেছেন এবং ভাবিতেছেন রাত্রি অধিক হইয়াছে, তাঁহাকে এক্ষণে একবার শয়ন করাইতে পারিলে ভাল হয়। মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান আছে দেখিয়া তিনি স্বরূপকে কহিলেন "স্বরূপ গোসাঞি! রাত্রি অধিক হইয়াছে। কাল আবার গান শুনাইও। আজ এই পর্য্যন্ত।" স্বরূপের জ্ঞান ছিল না। তিনিও অপ্রাকৃত রসসাগরে মগ্ন ছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট কোন গতিকে বিদায় লইয়া তখন বাসায় গেলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর ভার লইলেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই অপূর্ব্ব লীলার ফল-শ্রুতি লিখিয়াছেন,—

——ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কান।
অলৌকিক গূঢ় চেষ্টা প্রেম হয় জ্ঞান॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য।

অতএব,—

সর্ব্ব ভাবে ভজ লোক চৈতন্য-চরণ।
যাহা হইতে পাবে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত ধন॥

কবিরাজগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—

লিখ্যতে শ্রীল গৌরস্য অদ্ভুতমলৌকিকং।
যৈর্দ্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং॥

অর্থাৎ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করিয়া এই সকল অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক দিব্যোন্মাদ ও প্রেম-চেষ্টা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥
ইহার সত্যত্ব প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমর গীতাতে॥
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ বিশেষে॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস॥

অতএব তর্কাবতারবুদ্ধিহীন হইয়া পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে এই সকল অলৌকিক লীলা-কথা পাঠ করুন,—শ্রবণ করুন,—ইহাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করুন,—শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন,—অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অহৈতুকী কৃপা আপনাদের উপর বর্ষিত হইবে,—আর এই কৃপাবৃষ্টির ফলে কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না।

পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামীর এই কথাটী যেন মনে থাকে—

অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহকাল পরকাল তার হয় নাশ।

এক্ষণে বলুন সকলে মিলিয়া জয় গৌর।

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

—:০:—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণন।

(তৃতীয় চিত্র)

—:০:—

ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি কৃষ্ণ চমৎকার।
কৃষ্ণ যার অন্ত না পান তাঁর কোন ছার॥ চৈঃ চঃ

—:০:—

পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—

সহস্র বদনে যাঁর কহয়ে অনন্ত।
এক দিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত॥
কোটি যুগ পর্য্যন্ত যদি লিখেন গণেশ,
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ

গৌরাঙ্গলীলা-সমুদ্র এইরূপ গম্ভীর, এবং অনন্তই বটে বিশেষতঃ মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমের বিকার ও প্রলাপ বর্ণন একেবারেই অসম্ভব।

কবিরাজগোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেইজন।
চান্দ ধরিতে চাহে যৈছে হইয়া বামন॥

একথার বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই। মহাপ্রভুর এই যে প্রেমবিকারাবস্থা,—ইহা রসরাজ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেমভাবের অবধি। স্বয়ং ভগবানও ভক্তের এই অপূর্ব্ব প্রেম-বিকারের মর্ম্ম সম্যক বুঝিতে পারেন না। এইজন্য শ্রীগৌর ভগবান ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত-হৃদয়োত্থ এই অপূর্ব্ব প্রেমরসাস্বাদন করিতেছেন। ভক্তপ্রেমের কিরূপ পরিণাম বা চরমগতি, ভক্তিজগতে তাহাই দেখাইবার জন্য মহাপ্রভুর এই প্রেমবিকার-দশা প্রকাশ। ইহাতে দুঃখের মধ্যে সুখানুভূতিই অধিক পরিস্ফুট,—ইহার মর্ম্ম সামান্য জীবে কি বুঝিবে? কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

বাসি যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেমের কণ তৈছে জীবের স্পর্শন॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত॥

মহাপ্রভু যেরূপে ভক্তভাবে ভক্তিরস আস্বাদন করিতেছেন,—তাহার মর্ম্ম বুঝেন একমাত্র তাঁহার নিজগণ স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ। কেবল মাত্র আত্মশোধনের জন্য জীবাধম গ্রন্থকার মহাপ্রভুর এই সকল প্রেমবিকার লক্ষণ সকল মহাজন-মুখে-বর্ণন শ্রবণ পূর্ব্বক আস্বাদনের প্রয়াস পাইতেছে মাত্র।

শরৎকালের রাত্রি,—নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদে নিজগণসঙ্গে সমুদ্রতীরবর্ত্তী উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন,—সঙ্গে স্বরূপ ও রামরায় আছেন। ব্রজ ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার শ্লোক সকল আবৃত্তি করিতেছেন,—আর প্রেমানন্দে তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন, এবং কখন কখনও তাহার ব্যাখ্যাও করিতেছেন। কখনও প্রেমাবেশে তিনি মধুর নৃত্য করিতেছেন,—কখনও বা কীর্ত্তনরঙ্গে উন্মত্ত আছেন। ভাবাবেশে কখনও বা তিনি রাসলীলার অনুকরণ করিতেছেন,—কখনও বা প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িতেছেন,—অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিকার সকল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লক্ষিত হইতেছে। স্বরূপ তাঁহার ভাবোচিত শ্লোক পড়িয়া তাঁহাকে প্রেমানন্দ দিতেছেন। রাসলীলার যত শ্লোক সকলই একে একে পাঠ, ও আস্বাদন করা হইল। মহাপ্রভুর কখনও হর্ষ, কখনও শোক, কখনও মূর্চ্ছা, কখনও কম্প প্রভৃতি হইতেছে,—ভক্তগণ তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত। স্বরূপদামোদর সর্ব্বশেষে ব্রজগোপিকাবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলির শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্লোকটি এই,—

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাডিব ভিন্নসেতুঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত

অর্থ। মদমত্ত করী যেমন করিণীগণের সহিত জলক্রীড়া করে, লৌকিক মর্য্যাদাতীত শ্রীকৃষ্ণভগবান সেইরূপ শ্রমাপনোদনার্থ গোপবালাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীযমুনায় অবগাহন করিলেন। তখন গোপিকাগণের কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুসুমমালায় কতিপয় ভ্রমর উপবিষ্ট ছিল, তাহারা গন্ধর্ব্বরাজের ন্যায় মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া সমুদ্রের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন,—তখন তিনি আইটোটায় উদ্যানে। এস্থান হইতে সমুদ্রের দৃশ্য অতীব মনোহর। শারদপূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্ররশ্মি সমুদ্র-তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মহাপ্রভু দেখিতেছেন,—

চন্দ্রকান্তি উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥ চৈঃ চঃ

তিনি এই যমুনার জলে গোপবালা সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের

জলকেলি দেখিতে ছুটিলেন। কেহ দেখিতে পাইল না,—কেহ বুঝিতে পারিল না,—তিনি কোথায় গেলেন। অলক্ষিতে তিনি গিয়া একেবারে সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিলেন। যেমন সমুদ্রজলে পতন,—অমনি তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। তিনি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সমুদ্রতরঙ্গে তাঁহার শ্রীঅঙ্গকে কখন ডুবাইতেছে,—কখন ভাসাইতেছে,—যেন একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে মহাপ্রভু কোনারকের দিকে চলিলেন। কোনারক সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি মনোরম স্থান,—পুরীর সন্নিকট। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালাগণের সঙ্গে যমুনার জলে প্রেমানন্দে জলকেলিরঙ্গে মগ্ন,—এইভাবে মহাপ্রভু সমুদ্রজলে কভু মগ্ন,—কভু ভাসমান। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কখন জলে ভাসিতেছে,—কখন ডুবিতেছে। তাঁহার জ্ঞানমাত্রও নাই।

এদিকে স্বরূপগোসাঞি প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার অকস্মাৎ অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদিগের মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা বড়ই শঙ্কিত হইলেন,—সকলেই বিমর্ষমনে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, প্রভু হয়ত জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছেন,—কেহ বলিলেন তিনি বোধ হয় অন্য উদ্যানে গিয়া প্রেমোন্মাদাবস্থায় পড়িয়া আছেন,—কেহ বলিলেন তিনি গুণ্ডিচামন্দিরে কিম্বা নরেন্দ্রসরোবরে গিয়াছেন,—কেহ বলিলেন তিনি বোধ হয় চটকপর্ব্বতের দিকে গিয়াছেন। একজন বলিলেন তিনি হয়ত কোনারকের দিকে গিয়াছেন। এইরূপে সকলে মিলিয়া নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। জনকয়েক ভক্ত সমুদ্রতীরে ছুটিলেন,—চারিদিকে লোক ছুটিল,—কোথাও কেহ প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল, তবুও তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। তখন সকলে ভাবিলেন মহাপ্রভু বুঝি তাঁহাদিগকে জনমের মত ছাড়িয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন (১)। ভক্তবৃন্দের দেহে যেন প্রাণ নাই,—মনে কেবলমাত্র তাঁহার অনিষ্টাশঙ্কা ভিন্ন আর কিছুই স্থান পাইতেছে না। এইরূপ অবস্থায় মনের এইরূপ ভাবই হইয়া থাকে। সকলে মিলিয়া সমুদ্রতীরে বসিয়া তখন পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কয়েকজনকে চিরায়পর্ব্বতের দিকে পাঠাইলেন,—স্বরূপগোসাঞি কয়েকজনের সঙ্গে সমুদ্রতীরের পূর্ব্বদিকে মহাপ্রভুর অন্বেষণে চলিলেন। সকলেরই বদন শুষ্ক,—হৃদয় বিকল,—দেহ অবসন্ন,—তথাপি মহাপ্রভুর প্রেমে বিহ্বল হইয়া তাঁহারা কলের পুত্তলিকার ন্যায় ছুটিয়া চারিদিকে বেড়াইতেছেন। এক্ষণে প্রাতঃকাল হইয়াছে। স্বরূপগোসাঞির দল পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের তীরে যাইতে যাইতে দেখিলেন,—

——এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে "হরি হরি" ॥ চৈঃ চঃ

একজন জেলে তাহার জাল কান্ধে করিয়া প্রেমানন্দে কখন নাচিতেছে,—কখন কাঁদিতেছে,—কখন উচ্চৈঃস্বরে "হরি হরি" বলিয়া গান করিতেছে। ইহা দেখিয়া সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্য হইলেন। স্বরূপগোসাঞি সেই প্রেমোন্মত্ত জেলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কহ জালিক, এ দিকে দেখিলে একজন।
তোমার এ দশা কেন কহত কারণ॥" চৈঃ চঃ

পরম সৌভাগবান জেলে তখন তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত খুলিয়া স্বরূপগোসাঞিকে বলিল। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহার উত্তর শুনুন—

জালিয়া কহে "ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি মুঞি উঠাইনু যতনে।
মৃতক দেখিয়া মোর ত্রাস হৈল মনে॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।
স্পর্শ মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥

---

(১) চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে রাত্রি শেষ হইল।
অন্তর্দ্ধান হৈল প্রভু নিশ্চয় করিল॥ চৈঃ চঃ

ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী রোম উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্ত পাদ তার তিন তিন হাত।
অস্থিসন্ধি ছাড়ি চর্ম্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কারো নাহি রহে ধড়ে॥
মড়া রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু দেখি অচেতন॥
সাক্ষাৎ দেখিনু মোরে পাইল সেই ভূত।
মুঞি মৈলে মোর কৈছে জীবেক স্ত্রী পুত॥
সেই ত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা ঠাঁই যাঙ যদি সে ভূত ছাড়ায়॥
একা রাত্রে বুলি, মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহস্মরণে।
এ ভূত নৃসিংহ নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে॥
ওথাকারে না যাইও নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে॥

স্বরূপগোসাঞি বুঝিলেন জেলের এই ভূতই তাঁহাদের হারাধন মহাপ্রভু। ভক্তগণও বুঝিলেন মহাপ্রভু ভিন্ন অন্যে ইহা সম্ভবে না। তাঁহাদের হারাধনের অনুসন্ধান পাইয়া মৃতদেহে যেন প্রাণ আসিল। স্বরূপগোসাঞি বড় রসিক পুরুষ। তিনি সেই সৌভাগ্যবান্ জেলেকে লইয়া সেখানে কিছু রঙ্গ করিলেন। তিনি হাসিয়া মধুর কথায় জেলেকে বলিলেন "ভাই জেলে! আমি একজন ভূতের ভাল ওঝা। আমি ভূত ছাড়াইতে জানি" এই বলিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনি ভূতগ্রস্থ জেলের মস্তকে হস্তাপণ করিলেন। তাহার পৃষ্ঠদেশে তিনটি চপটাঘাত করিয়া বলিলেন—"তোমার দেহ হইতে ভূত পলাইয়াছে"। স্বরূপ গোসাঞির করস্পর্শে তাহার সকল ভয় দূর হইল,—সে কিছু সুস্থির বোধ করিল। প্রেমবিকারগ্রস্থ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে তাহার দেহে প্রেমোদয় হইয়াছে,—কিন্তু মনে বড় ভয় হইয়াছিল। স্বরূপগোসাঞির কথায় এবং করস্পর্শে জেলের মনের ভয় দূর হইয়া গেল,—শুধু প্রেম রহিল। শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গস্পর্শরূপ কৃপার উপর ভক্তের শ্রীকরস্পর্শরূপা সে লাভ করিল,—তাহার মত মহাসৌভাগ্যবান্ আর কে আছে? সে ভয়ে বড়ই অধীর হইয়াছিল,—এক্ষণে সুস্থির হইল। তখন স্বরূপগোসাঞি হাস্যবদনে তাহাকে বলিলেন—

—— "তুমি যাঁরে কর ভূতজ্ঞান।
ভূত নহে তিঁহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তিঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁহারেই তুমি উঠাইলা নিজ জালে॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূতজ্ঞানে তোমার মনে হৈল মহাভয়।
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাহাঁ তাঁরে উঠাইছ দেখাও আমারে।" চৈঃ চঃ

এই ভাগ্যবান জেলে মহাপ্রভুকে বহুবার দেখিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম নীলাচলে কে না জানে? তাঁহার নাম শুনিবামাত্র সে তাঁহাকে চিনিতে পারিল কিন্তু স্বরূপগোসাঞি বলিলেন সে তাহার জালে যিনি উঠিয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, —ইহা তাহার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না, কারণ মহাপ্রভুকে সে স্বচক্ষে বহুবার দেখিয়াছে। শবদেহাকৃতি দীর্ঘাকার বিকট ভূতের মত কিস্তৃতকিমাকার বিকৃত আকার তাঁহার নহে,—সেই কথা সে স্বরূপগোসাঞিকে বলিল (১)। স্বরূপগোসাঞি তখন তাহাকে বলিলেন—"ভাই জেলে! তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু! প্রেমের বিকারাবস্থায় তাহার অস্থি-সন্ধি সকল শিথিল হইয়া দীর্ঘাকার ধারণ করিয়াছে"। ইহা শুনিয়া জেলের মনে বড় আনন্দ হইল। তখন সে সকলকে সঙ্গে লইয়া জাল কাঁধে করিয়া পুনরায় সমুদ্রতীরে গেল, এবং মহাপ্রভু যেখানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া আছেন,

(১) জালিয়া কহে প্রভুকে মুঞি দেখিয়াছো বারবার।
তিঁহো নহে এই অতি বিকৃত আকার॥ চৈঃ চৈঃ

সেই স্থানটি দেখাইয়া দিল। স্বরূপাদ ভক্তগণ দেখিয়াই তাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্বধন মহাপ্রভুকে চিনিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। জলে জলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ বালুকাময়, অস্থিসন্ধি সকল অতিশয় শিথিল, চর্ম্ম সকল দীর্ঘাকার। পরিধানে কেবলমাত্র আর্দ্র কৌপিনখানি। তাঁহাকে তখন উঠাইয়া বাসায় লইয়া যাইবার উপযুক্ত তিনি নহেন। গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে মহাপ্রভুর কৌপীন ও বহির্ব্বাস সর্ব্বদা রাখিতেন। তাঁহার আর্দ্র কৌপীন ছাড়াইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া দিলেন, বহির্ব্বাস দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের বালুকা ঝাড়িয়া দিলেন। আর একখানি বহির্ব্বাস সমুদ্রতীরে বালুকার উপর বিছাইয়া তাঁহার উপর মহাপ্রভুকে শয়ন করাইলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই মহা ভাগ্যবান জেলে সেখানে দাঁড়াইয়া এ সকলি দেখিল। তাঁহার অঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলক, কদম্ব প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব দৃষ্ট হইল। মহাপ্রভুর কাণের কাছে বহুক্ষণ কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বসিলেন,—আর তখন অস্থিসন্ধি সকল আপনা আপনিই স্ব স্ব স্থানে সংযোজিত হইয়া গেল।

ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা, তিনি উঠিয়াই অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ উন্মত্তের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিয়া স্বরূপদামোদরের মুখের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া করুণস্বরে কহিলেন,—

"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী দেখায় মোরে সেই সব রঙ্গে॥" চৈঃ চঃ

এই বলিয়াই মহাপ্রভু প্রেমাবেশে গোপীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলিরঙ্গ-কথা বিস্তারিত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এই যে ব্রজগোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণসহ জলকেলিরঙ্গ,—ইহা পরম নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ লীলা। ব্রজরসের রসিক না হইলে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। অধিকারী রসিক ভক্তদিগের চিত্তবিনোদনার্থ এই মধুর লীলা বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রভু স্বয়ং এই পরম রহস্যপূর্ণ লীলাকথার বক্তা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ইহার শ্রোতা। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এই অপূর্ব্ব লীলাবর্ণন কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শুনুন—

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখি করে,
সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লৈয়া কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন
জলকেলি রচিল সুঠাম॥
সখি হে দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণমত্ত করিবর, চঞ্চল কর-পুষ্কর,
গোপীগণ করি নিজ সঙ্গে। ধ্রু

আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার।
কভু জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার।
বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘনবর্ষে তড়িত উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ,
সে অমৃত সুখে পান করে॥
প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, তবে হৈল রদারদি,
তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি॥
সহস্র কর জলসেকে, সহস্র নেত্র গোপী দেখে,
সহস্র পদে নিকটে গমনে।
সহস্র মুখে চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী মর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে॥

কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্নজলে
ছাড়ি দিল যাহা অগাধ পাণী।
তিঁহ কৃষ্ণ কণ্ঠধরি, ভাসে জলের উপরি
গজোদ্ঘাতে যৈছে কমলিনী।
যত গোপ সুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি
সবার বস্ত্র করিল হরণ।
যমুনা জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন॥
পদ্মিনী লতা সখীচয়, কৈল কারো সহায়
তার হস্তে পত্র সমর্পিল॥
কেহ মুক্ত কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস
স্বহস্তে কেহো কাচলি ধরিল।
কৃষ্ণ-কলহ রাধা সনে, গোপীগণ সেইক্ষণে
হেমাব্জ বন গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠবপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে॥
হেথা কৃষ্ণ রাধাসনে, কৈল যে আছিল মনে
গোপীগণ অন্বেষিতা গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি
সখিমধ্যে আসিয়া মিলিলা॥
যত হেমাব্জ (১) জলে ভাসে, তত নীলাব্জ (২) তার পাশে
আসি আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় পরতেকে,
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ।
চক্রবাক মণ্ডল (৩) পৃথক পৃথক যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, (৪) পৃথক পৃথক যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন।
উঠিল বহু রক্তোৎপল, (৫) পৃথক পৃথক যুগল,
পদ্ম গণে কৈল নিবারণ।

পদ্ম চাহে লুটি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক লাগি দুহার রণ॥
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাক পদ্ম আস্বাদয়। (৬)।
ইহা দুহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম্ম হইল বিপরীতি
কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ন্যায় হয়॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী (৭) চক্রবাকে লুটে আসি,
কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুমিত্র (৮) রাখে উৎপল এবড় চিত্র
এবড় বিরোধ অলঙ্কার॥
অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র কর্ণযুগ্ম জুড়াইল।
ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি তীরে আইলা শ্রীহরি
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখি জন॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধপুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যতজন,
ফল পাড়ি আনিল সকল॥

(১) হেমাব্জ—গোপীবদন। (২) নীলাব্জ—শ্রীকৃষ্ণবদন (৩) চক্রবাকমণ্ডল—গোপী-স্তনমণ্ডল। (৪) পদ্মমণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণকর। (৫) রক্তোৎপল—শ্রীগোপীকর। অচেতনপদ্ম সচেতন চক্রবাকে আস্বাদন করে, ইহাই বিপরীত। (৭) চক্রবাক সূর্য্যোদয়ে অবিযোগী হয় বলিয়া পদ্মের মিত্র সূর্য্যের মিত্র, তাহাতে যে জলে পদ্ম বাস করে, সেই জলে চক্রবাক বাস করে বলিয়া পদ্মের সহবাসী তাহাকে লুট করিতেছে, ইহা অন্যায় ব্যবহার। (৮) উৎপল রাত্রিতে বিকসিত হয়, এই নিমিত্ত উৎপলের শত্রু সূর্য্য। তাহার মিত্র চক্রবাক তাহাকে রক্ষা করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য। যেহেতু শত্রুর মিত্রকে রক্ষা করা উচিত হয় না। উৎপল—শ্রীকৃষ্ণকরযুগল।

উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি,
রত্নমন্দিরে পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে॥

এক নারিকেল নানাজাতি, এক আম নানা ভাতি,
কলা, কোলি, বিবিধ প্রকার।
পনস, খর্জ্জুর, কমলা, নারঙ্গ, জাম, সন্তারা,
দ্রাক্ষাবাদাম মেওয়া যত আর॥

খরমুজ ক্ষিরিলি তাল, কেশর পাণিফল মৃণাল,
বিল্ব পিলু, দাড়িম্বাদি যত।
কোন দেশে কারো খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি,
সহস্র জাতি লেখা যায় কত॥

গঙ্গাজল অমৃত কেলি, পীযূষগ্রন্থি কর্পূর কেলি,
সরপুপি অমৃত পদ্মচিনি।
খণ্ডক্ষীরসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি।

ভক্ষ্য পরিপাটি দেখি, কৃষ্ণ হৈল মহাসুখী,
বসি কৈল বন্য ভোজন।
সঙ্গে লৈয়া সখিগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দুঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥

কেহ করে ব্যজন কেহ পাদ সম্বাহন
কেহ করে তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈলা মন॥

হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি
তুমি সব ইহা লঞা আইলা।
কাহা যমনা বৃন্দাবন? কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ?
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা॥

এইরূপে বিস্তারিত জলকেলিরঙ্গ বর্ণনা করিয়া মহাপ্রভু বলাপ করিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তাঁহার দুটী কমল নয়নের কোণে যেন প্রেম-সমুদ্র বহিতেছে। তাঁহার শ্রীমুখে কেবলমাত্র কথা—

কাঁহা যমুনা। বৃন্দাবন?
কাহা কৃষ্ণ গোপীগণ?
কেন সুখ ভঙ্গ করাইলা?

মহাপ্রভুর এখন বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে। তিনি অর্দ্ধ-বাহ্যাবস্থায় কৃষ্ণের জলকেলিরঙ্গ বর্ণনা করিতেছিলেন। স্বরূপের প্রতি সজলনয়নে চাহিয়া এখন তিনি কেবল বলিতেছেন—

"ইহা কেন তোমরা সব আমা লঞা আইলা?"

স্বরূপগোসাঞি তখন করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত মহাপ্রভুকে বলিলেন, —শেষে কহিলেন "তুমি মূর্চ্ছিত হইলে প্রেমাবেশে বৃন্দাবনলীলা দর্শন কর, আর আমরা সকলে এখানে তোমার জন্য প্রাণে মরি।"

তুমি মূর্চ্ছিছিলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পায় পীড়া॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু তখন বুঝিলেন প্রকৃত ব্যাপারটা কি? তখন তিনি জানিলেন তিনি এ বাহ্যে ছিলেন না। তিনি যে অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় অপূর্ব্ব প্রলাপ-গীতি গাইয়াছেন, তাহাও তাঁহার সম্পূর্ণ স্মরণ নাই। তখন তিনি মহা লজ্জিতভাবে অধোবদনে ধীরে ধীরে স্বরূপদামোদরকে কহিলেন—

——"স্বপ্ন দেখি গেলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করে, গোপীগণ সনে॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্য ভোজন।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মন॥" চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া কিছুক্ষণ তিনি নীরব রহিলেন। তাঁহার মনে যেন আত্যন্তিক উৎকণ্ঠার ভাব। শ্রীমুখের ভাবে তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। তাঁহার বদন শুষ্ক,—অধরপ্রান্ত মলিন,—মনে যেন একটা নিদারুণ মর্ম্মব্যথা সর্ব্বদা জাগিতেছে। এইভাবে তিনি নিজজন বেষ্টিত হইয়া বালুকাপরি সমুদ্রতীরে বসিয়া আছেন। স্বরূপদামোদর ও রামরায় তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া স্নান করাইয়া ধীরে ধীরে বাসায় লইয়া আসিলেন। প্রেমাবেগে মহাপ্রভু যেন আর চলিতে পারিতেছেন না,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলস এবং অবশ। একপদ যাইতেছেন, আর যেন ঢলিয়া পড়িতে-

ছেন—স্বরূপদামোদর ও রামরায় দুইজনে দুইদিকে তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে বাসায় আনিলেন। কবিরাজগোস্বামী তখনকার মহাপ্রভুর ভাব লিখিয়াছেন—

অলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাড়াইতে পায়॥

মহাপ্রভু যখন এই ভাবে বাসায় আসিলেন তখন বেলা একপ্রহর। তিনি প্রেমাবেশে সমুদ্রে ঝম্প দিয়াছিলেন গতরাত্রির প্রথম প্রহরে। সমস্ত রাত্রি তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া সমুদ্রজলে বাস করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুন-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ॥

ইহার অর্থ। যিনি শরৎজ্যোৎস্নাযুক্ত সিন্ধু অবলোকন করিয়া যমুনাভ্রমে দ্রুতবেগে গমন করিয়া কৃষ্ণবিরহতাপরূপ সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া সমস্ত রাত্রি তাহাতে বাসপূর্ব্বক প্রভাতে স্বরূপাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন গৌরহরি আমাদিগকে রক্ষা করুন।

একবাক্যে সকল মহাজনগণই বলিয়া গিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অতিশয় অদ্ভুত, অলৌকিক এবং গম্ভীর ভাবপূর্ণ। এই যে মহাপ্রভুর একরাত্রি সমুদ্রবাসলীলা-রঙ্গ—ইহা মহা অলৌকিক এবং পরম অদ্ভুত হইলেও ধ্রুব সত্য। যাহারা ইহা স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারাই ইহা স্বরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রেমের অবতার প্রেমময় মহাপ্রভু রাত্রিদিনে প্রেমসিন্ধুতে দিবারাত্র মগ্ন থাকেন,—তাঁহার পক্ষে একরাত্রি প্রাকৃত সমুদ্রে বাস কিছুই অসম্ভব নহে। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে এই সকল অলৌকিক লীলাকথা পাঠ ও শ্রবণ করিতে হয়। তাহা হইলে মনে পরানন্দসুখোদয় হয়, এবং কুতর্কাদি আধ্যাত্মিক দুঃখের অবসান হয়,—আর যাহার মনে পুণাক্ষরে অবিশ্বাসের ছায়াও পতিত হয়, তাহার ইহকাল পরকাল নাশ হয়। ইহাও কবিরাজগোস্বামীর কথা—

অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহকাল পরকাল তার হয় নাশ॥

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণন।

(চতুর্থ চিত্র)

মাতৃভক্ত মহাপ্রভুর বিলাপকাহিনী ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তর্জ্জা।

মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥

মহাপ্রভুর মাতৃভক্তির কথা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা গৌরভক্ত কৃপাময় পাঠকবৃন্দ অবশ্যই অবগত আছেন। তিনি দামোদর পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন—

যতোকিছু বিষ্ণুভক্তি সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব দ্বিধা নাহি আর॥
তাহার ইচ্ছায় মুঞি আছো পৃথিবীতে।
তার ঋণ আমি কভু না পারি শুধিতে॥ চৈঃ ভাঃ

আর একস্থানে মহাপ্রভু তাঁহার জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

প্রভু বোলে বিষ্ণুভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্তে সব প্রসাদে তোমার॥
কোটি দাস দাসেরো সে সম্বন্ধ তোমার।
সেইজন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার॥
বারেকো যে জন তোমা করিবে স্মরণ।
তার কভু নহিবেক সংসার বন্ধন॥
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।
তানাও হবেন ধন্য তোমায় পরশি॥

তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিয়ে তাহা না হয় শোধন॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে।
তোমার সদগুণা যে তাহার প্রতিকারে॥

মহাপ্রভুর মাতৃভক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়। পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছেন কি বলিয়া শুনুন—

"বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্ত-শিরোমণিং"

মহাপ্রভুর এক্ষণে কৃষ্ণপ্রেমবিকারাবস্থা। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলারস কথা ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না। কিন্তু মাতৃভক্তশিরোমণি মহাপ্রভু এই অবস্থাতেও তাঁহার জননীকে ভুলিতে পারেন নাই। দিবারাত্রি এখন তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ দশা। এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার স্নেহময়ী জননীর পরম পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। তিনি মাতৃস্নেহবিহ্বলচিত্তে তাঁহার পরম প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিতকে নিভৃত নিকটে ডাকিয়া একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে গোপনে কহিলেন "জগদানন্দ! তুমি একবার নবদ্বীপে যাও, আমার স্নেহময়ী জননীকে আমার নমস্কার জানাইয়া কুশলসংবাদ দিয়া এস"। প্রভু প্রতি বৎসর তাঁহার শোকাতুরা জননীকে দেখিতে জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠান (১)। গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ জগদানন্দ তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইলেন। মাতৃভক্তচূড়ামণি মহাপ্রভু তাঁহার দুটি হাত ধরিয়া সজলনয়নে গদগদ বচনে কহিলেন,—

"কহিও মাতারে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল সর্ব্ব নাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর এই কথাগুলি তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তির পরিচায়ক। এই কথাগুলি আবার নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। তিনি নীলাচলে মাতৃ আজ্ঞায় বাস করিতেছেন। নীলাচল ও নবদ্বীপ বহুদূর। মহাপ্রভু বলিলেন "মাকে কহিও আমি নিত্য যাইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করি?" ইহা কি প্রকারে সম্ভব? ইহার একটু বিচার প্রয়োজন।

শ্রীগৌরাঙ্গকে যাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া মানেন এবং বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। শ্রীভগবানের শক্তি ঐশী,—এই ঐশী শক্তিবলে তিনি সকলি করিতে পারেন—কত শত লৌকিক লীলা তিনি করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না,—এ সৌভাগ্য যাহাদের হয় নাই, তাহাদিগকে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করিবেন সূক্ষ্মদেহে সিদ্ধপুরুষগণ যোগবলে যেখানে সেখানে বিচরণ করিতে পারেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে যাহারা ভক্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাও অবশ্য বিশ্বাস করিবেন তিনি একজন সামান্য ভক্ত ছিলেন না; তিনি ভক্তাবতার ছিলেন। সিদ্ধভক্তের স্থান মুক্ত পুরুষের উপর। তাঁহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই; সুতরাং মহাপ্রভুর বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার অলৌকিক লীলারঙ্গ সকল একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে তাঁহার কৃপায় সকলি হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি বলিলেন, তিনি প্রত্যহ নীলাচল   নবদ্বীপ যাইয়া তাঁহার স্নেহময়ী জননীর চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন। একথায় সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি লীলাময় মহাপ্রভু শচীমাতার হস্তের পাক অন্ন-

(১) নদীয়া চলহ মাতারে কহিও নমস্কার।
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে॥ চৈঃ চঃ

ব্যঞ্জন শাক প্রভৃতি ঠাকুরের ভোগ নবদ্বীপে আসিয়া ভোজন করিতেন। শচীমাতা অনুরাগ ভরে তাঁহার নিমাইচাঁদকে স্মরণ করিতেন, আর ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেন "আহা আমার নিমাই মোচার ঘণ্ট বড় ভাল বাসিত,—সুকতুনী বড় তার প্রিয় ছিল,—বাছার আমার শাকে বড়ই আসক্তি ছিল,—সেই সব আমি রাঁধিয়াছি—ঠাকুরের ভোগ দিয়াছি,—কিন্তু হায় সোনার বাছা আমার নিমাই কোথায়? এই বলিয়া শচীমাতা নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যানে বসিতেন ও ভাবিতেন তাঁহার নিমাইচাঁদ যদি এখনি বাড়ী আসে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। এদিকে নিমাইচাঁদ নীলাচলে বসিয়া স্নেহময়ী জননীর অনুরাগভরা প্রাণের আকাঙ্ক্ষার কথাগুলি সকলি শুনিলেন,—মাতৃস্নেহে তাঁহারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তাঁহাকে নবদ্বীপে যাইতে হইল,—স্নেহময়ী জননীর হস্তের প্রীতিপূর্ণ পাক অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতে হইল। নবদ্বীপ নীলাচল হইতে বহুদূর,—হাঁটিয়া গেলে বহুদিন লাগিবে,—কিন্তু যাওয়া চাই তদ্দণ্ডেই, কি করেন মহাপ্রভুকে ঐশ্বর্য্য দেখাইতে হইল। নররূপ ধারণ করিয়া যখন শ্রীভগবান ভূতলে অবতীর্ণ হন,—নরলীলারঙ্গ প্রকট করেন, ঐশ্বর্য্য দেখাইতে তিনি বড় ইচ্ছা করেন না। কিন্তু বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কখন কখন ঐশ্বর্য্য দেখাইতে হয়। এই ঐশ্বর্য্য কি বস্তু, তাহা সকলেই জানেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্য তাঁহার ঐশী শক্তি, তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তেরও ঐশ্বর্য্য আছে, তাহার নাম ভক্ত-শক্তি, ভক্ত শ্রীভগবানের সেবক,—ভগবানের শক্তি ভক্তেতে নিহিত। গুরুবলে যেমন শিষ্য বলীয়ান্,—ভগবানের ঐশী শক্তিবলে ভক্ত অলৌকিক শক্তিশালী। শ্রীভগবানের ঐশী শক্তির প্রমাণ জগতের সকল লোক পাইয়াছে,—তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রভাব সকলে জানে,—সাধু মহাজনগণের প্রতাপ ও প্রভাব ইংরেজগণও মানেন,—তখন ইহাতে আর অবিশ্বাসের কারণ কি আছে? শচীমাতা তাঁহার অতি স্নেহের নিমাইচাঁদের সুন্দর বদনচন্দ্র খানি চিন্তা করিয়া যখন ধ্যানে বসিতেন, তখন তাঁহার মাতৃভক্ত-শিরোমণি পুত্ররত্নটি নীলাচল হইতে আসিয়া অনুরাগভরে সকলি ভোজন করিতেন,—কিন্তু কেহ দেখিতে পাইতেন না। শচীমাতা চক্ষু খুলিয়া দেখিতেন ঠাকুরের ভোগ কে খাইয়া গিয়াছে,—এদিক ওদিক দেখিতেন,—কুকুর বিড়ালত নাই? কিছুই না দেখিয়া তিনি মহা চিন্তিত হইতেন, নিশ্চয়ই কুকুরে ঠাকুরের ভোগ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। পুত্রবিরহকাতরা বৃদ্ধা শচীমাতা তাঁহার পতিবিরহিনী দুঃখিনী পুত্রবধূর সাহায্যে পুনরায় রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন,—তবে তাঁহার মন শান্ত হইত। এসকল কথা আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ। পূর্ব্বে মহাপ্রভুর এইরূপ অলৌকিক লীলারঙ্গ বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে শ্রীভগবান তাঁহার ভক্তের একান্ত অধীন, এবং তিনি ভক্তবশী, একথা তিনি বারম্বার স্বমুখে বলিয়াছেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহার স্নেহময়ী জননীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আসিতেন, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

মাতৃভক্তশিরোমণি মহাপ্রভু তাঁহার জননীর জন্য জগদানন্দ পণ্ডিতের হাতে জগন্নাথের প্রসাদীবস্ত্র এবং নানা-প্রকার প্রসাদ পাঠাইতেন। অতিশয় যত্ন করিয়া তিনি স্বয়ং নিজহস্তে এই সকল প্রসাদ বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া দিতেন এবং তাঁহার মনের কথা সকলি বলিয়া পাঠাইতেন।

জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া প্রসাদাদি লইয়া নবদ্বীপ রওনা হইলেন। যথাকালে নবদ্বীপে তিনি শচীমাতাকে তাঁহার পুত্রের কুশল সংবাদ দিয়া তাঁহার প্রেরিত বস্ত্র ও প্রসাদ দিলেন। নবদ্বীপে পণ্ডিত জগদানন্দ একমাস কাল থাকিয়া গৌরকথা শচীবিষ্ণুপ্রিয়াকে শুনাইলেন। তাহার পর তিনি শান্তিপুরে গিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণবন্দনা করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। গৌর-আনা-গোসাঞি জগদানন্দপণ্ডিতকে কহিলেন—

"প্রভুরে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥

বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা করিয়াছে বাউল ॥ (১)

জগদানন্দ পণ্ডিত ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ইহা শুনিয়া কেবলমাত্র হাসিলেন। তিনি ভাবিলেন ইহা একটি প্রহেলিকা মাত্র। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এই তর্জ্জা প্রহেলি যে নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ, পণ্ডিত জগদানন্দের মনে সে ভাব একেবারে আসিল না। কিন্তু তিনি ইহা মনে করিয়া রাখিলেন এবং নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুকে এই তর্জ্জার কথা কহিলেন। মহাপ্রভু এই তর্জ্জা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং মৃদুস্বরে কহিলেন "শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের যে আজ্ঞা, তাহাই পালিত হইবে"। এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন। স্বরূপগোসাঞি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মনে এই তর্জ্জা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! আচার্য্যের এই তর্জ্জার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, আপনি কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিন"। প্রভু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন

———আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন ॥
পূজা নির্ব্বাহন হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তাঁর মন ॥
মহা যোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু কহিলেন তিনিও এই তরজার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এরূপ কথা শুনিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই পরম বিস্মিত হইলেন। স্বরূপ গোসাঞি কিছু অন্যমনস্ক হইলেন। কারণ মহাপ্রভু একটি বিষম কথা বলিয়াছেন। সে কথাটি এই "শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সাধক চূড়ামণি, তিনি উপাসনার জন্য তাঁহার ইষ্টদেবকে আহ্বান করেন, কিছুকাল পূজা করেন, এবং পূজা সমাপ্ত হইলে বিসর্জ্জন করেন"। স্বরূপ দামোদর গোস্বাঞির মত সুচতুর রসজ্ঞ এবং গৌরাঙ্গতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের পক্ষে মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্যের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ কিছু কঠিন বলিয়া বোধ হইল না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আমাদের গৌর-আনা-গোসাঞি,—আর তিনি যে গোলকপতি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে গোলক হইতে ভূতলে কেন আনিয়াছেন তাহাও স্বরূপ দামোদরের বুঝিতে বাকি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া তিনি উপাসনা করিয়াছেন। তবে কি এখন বিসর্জ্জনের সময় আসিল? এই চিন্তায় স্বরূপ গোসাঞিকে পাগল করিল,—তিনি আনমনা হইলেন। স্বরূপদামোদরের ভাব অন্য ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু বুঝিলেন, বুঝিয়াই তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন।

যে দিন এই কথা হইল, সেই দিন হইতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহদশা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন ভাব তাহার হৃদয়ে হঠাৎ স্ফূর্ত্তি হইল। তাঁহার তখন অবস্থা কিরূপ হইল তাহা মন দিয়া শুনুন—

উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা গমন।
উদঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ ॥ চৈঃ চঃ

নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকেই উদঘূর্ণা বলে। "স্যাদ্বিলক্ষণ মদঘূর্ণা নানা বৈবশ্য চেষ্টিতং" (১)। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন বার্ত্তা শ্রবণে শ্রীরাধিকার এই ভাব হইয়াছিল। শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত মহাপ্রভুর আজি সেই ভাব। সে দিনটা কোন প্রকারে কাটিয়া গেল। রাত্রিতে মহাপ্রভুর প্রেমবিকারভাব বৃদ্ধি হয়। সেদিন রাত্রিতে মহাপ্রভুকে

(১) ভাবার্থ—মহাপ্রভুকে কহিও যে লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে আর প্রেমের হাটে সেরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থান নাই। তাঁহাকে আরও কহিও যে আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক কাজে নাই। আরও বলিবে প্রেমোন্মত্ত হইয়া তোমার অদ্বৈত একথা বলিয়াছে। তাহার অর্থ এই যে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এখন তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।

(১) উজ্জ্বলনীলমণি।

স্বরূপ ও রামরায় বড়ই অধৈর্য্য ও কাতর দেখিলেন। তিনি রামানন্দরায়ের গলদেশে স্ববলিত বাহুযুগল বেষ্টন করিয়া স্বরূপগোস্বামীর প্রতি সজল করুণনয়নে চাহিয়া উন্মাদের ন্যায় ললিতমাধব নাটকের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ॥
ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তম ক বত হন্ত হা ধিগ্বিধিং॥

অর্থ। কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধিকা কহিতেছেন "হে সখি নন্দকুলচন্দ্রমা আমার কৃষ্ণ কোথায়? সেই শিখিপুচ্ছালঙ্কৃত আমার শ্যামসুন্দর কোথায়? তাঁহার সেই মন্দমধুর মুরলীরব,—সেই ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যামল অঙ্গকান্তি,—রাসমণ্ডলের সেই রাসরসতাণ্ডবনৃত্য, এ সকল কোথায় গেল? হে সখি! আমার প্রাণ-রক্ষার মহৌষধি কোথায়? হা হা! হায় হায়! আমার সুহৃত্তম কৃষ্ণ কোথায়? হা হা। এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত আমার যে বিয়োগ উৎপাদন করিল, সেই হতবিধিকে শত ধিক।

মহাপ্রভুর প্রলাপপূর্ণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—

ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগত উজোর।
যার কান্ত্যামৃত পিয়ে নিরন্তর পিয়া জীয়ে
ব্রজজনের নয়ন চকোর॥
সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন॥
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥ ধ্রু॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত কুমুদিনী, (১)
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি! রাখ মোর প্রাণ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, কাঁহা শিখিপিচ্ছের উড়ান
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বক পাতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণতনু যেন আম্র আঠা।
নারীর মনে পশি যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে, সেয়াকুলের কাঁটা (২)॥
জিনিয়া তমাল দ্যুতি, ইন্দ্রনীল সমকান্তি,
যেই কান্তি জগত মাতায়।
শৃঙ্গাররস সার ছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্না আনি
জানি বিধি নিরমিল তায়॥
কাঁহা সে মুরলী ধ্বনি, নবাম্বুদ গর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যামৃত ধার॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষার মহৌষধি,
সখি! মোর তিঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক এজীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন।
যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেন জীয়ায়
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক।
বিধিকে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক।

উন্মাদের ন্যায় এইরূপ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে মহাপ্রভু পুনরায় ক্রোধভরে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী

(১) গোপীগণের কাম অর্ক তুল্য। গোপীহৃদয় কুমুদিনীতুল্য। অর্ক কিরণতপ্ত কুমুদিনীরূপা কৃষ্ণকামতাপিত গোপীহৃদয়। নিজ—কৃষ্ণ। কর—কিরণ। কর রূপ অমৃত। কৃষ্ণচন্দ্রের কিরণ অথবা কৃষ্ণপাণিরূপ চন্দ্র॥

(২) আম্র আঠা লাগিলে ছাড়ান কঠিন,—যেখানে লাগে সেখানে ক্ষত পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা। সেয়াকুলের কাঁটা একবার লাগিলে ছাড়ান দুষ্কর। কৃষ্ণতনুকে এইজন্য সিয়াকুলের কাঁটার সহিত তুলনা করিলেন।

শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। এই শ্লোকটি ব্রজগোপীগণের উক্তি,—বিধির প্রতি যথা—

অহো বিধাতা স্তব ন কচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চা কৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽভকচেষ্টিতং যথা॥

অর্থ। হে বিধাতঃ। তোমার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও নাই। দয়া থাকিলে দেহীগণকে সখ্য ও প্রেমে পরস্পর মিলিত করিয়া, বাসনা পূর্ণ হইতে না হইতেই তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা কেন? ইহাতে জানিলাম তোমার ক্রিয়া বালকের ন্যায় নিরর্থক।

মহাপ্রভুর মনে এখন বিধাতার উপর বড়ই রাগ। তাঁহার কমল নয়ন দুইটি এক্ষণে ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তিনি ভ্রুকুটি করিয়া কঠোর ও পরুষভাবে বিধাতাকে কি বলিতেছেন, পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহা শ্রবণ করুন,—

রে বিধি!
না জানিস প্রেমমর্ম্ম, বৃথা করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগি পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে
আর যেন না করিস বিধান॥
আরে বিধি তো বড় নিঠুর।
অন্যোন্য দুর্লভ জন, প্রেমে করায় সম্মিলন,
অকৃতার্থা (১) কেন করিস দূর। ধ্রু॥
আরে বিধি অকরুণ দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাইলি আমার॥
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলে অন্যস্থান,
পাপ কৈলি দত্ত অপহার॥
অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেন কর রোষ,
ইহো যদি কহ দুরাচার।
তুই অক্রূর রূপ ধরি, কৃষ্ণ নিলি চুরি করি
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥

(১) কৃতার্থ হইতে না হইতে।

তোরে কিবা করি রোষ, আপনার কর্ম্মদোষ,
তোর আমায় সম্বন্ধ বিদূর (১)।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেইকৃষ্ণ হইলা নিঠুর॥
সব ত্যজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে,
নারী বধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি উলটি না চাহে হরি
ক্ষণ মাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥
কৃষ্ণে কেন করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন
এই মোর অভাগ্য প্রবল॥

মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া এইরূপ প্রলাপ উচ্চারণ করিতেছেন, আর উন্মাদের ন্যায় স্বীয়বক্ষে ও শিরে এক একবার সজোরে করাঘাত করিতেছেন। স্বরূপদামোদর ও রামরায় নানা উপায়ে তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ ফলোদয় হইতেছে না দেখিয়া তাঁহারা বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। স্বরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি পদ ধরিলেন—

রাই, তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি বসি, গীত আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুন হে কিশোরী, চারি দিক হেরি,
যেমন চাতক পাখী॥

(১) বিদূর—অতি দূরে।

তবরূপ গুণ, মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর।
ভজন সাধন, জানে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন, তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি ॥

এই পদটী শুনিয়া কৃষ্ণবিরহজর্জ্জরিত মহাপ্রভুর মন যেন কিছু সুস্থির বোধ হইল। তিনি স্বরূপদামোদরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "স্বরূপ! বল দেখি, বাস্তবিকই একথাগুলি কি কৃষ্ণের সরল প্রাণের সরল কথা? কৃষ্ণ ত কপট চূড়ামণি,—তাঁহার কথায় ত বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যদি কৃষ্ণ সরল হইতেন, তাঁহার যদি এই কথাগুলি মনের কথা হই—তাহা হইলে তিনি কখন এতদিন শ্রীমতিকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন না।" এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন। তাঁহার এখন অদ্ধবাহ্যাবস্থা, তিনি আপনাকে রাধাজ্ঞানে পূর্ব্বে যে প্রলাপ বলিতেছিলেন, সেভাব এক্ষণে নাই। তাই তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমতির কথা আসিল। তাঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল দেখিয়া স্বরূপ গোসাঞি তাঁহাকে গম্ভীরার ভিতর লইয়া গিয়া শয়ন করাইলেন। তখন রামানন্দ রায় গৃহে গেলেন এবং স্বরূপ দামোদর নিজ কুটীরে গিয়া শয়ন করিলেন। গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন। তিনি একাকী শুইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না,—কারণ মহাপ্রভুর অবস্থা আজ ভাল বোধ হইতেছে না। তিনি স্বরূপকে বলিলেন "ঠাকুর! তুমিও আজ আমার সঙ্গে দ্বারে শয়ন কর"। স্বরূপদামোদর আসিয়া দ্বারে শয়ন করিলেন।

মহাপ্রভু গম্ভীরার ভিতর প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া প্রথমতঃ শ্রীমুখে প্রেমগদগদস্বরে মন্দ মন্দ নামসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন আজ অত্যন্ত চঞ্চল—প্রাণ বড়ই বিরহব্যাকুল,—শরীর প্রেমাবেশে অবশ তাঁহার প্রাণ যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে,—মন প্রেমাবেশে গরগর। তিনি কৃষ্ণবিরহানলে দগ্ধ হইতেছেন; তিনি আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দের একটুখানি তন্দ্রা আসিয়াছে। মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহজ্বালায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল,—ভূমিতল কদমাক্ত হইল। তিনি আর বসিতে পারিলেন না উঠিয়া দাড়াইলেন। অন্ধকারে গম্ভীরার প্রকোষ্ঠের দ্বার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেওয়ালের ভিতে কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুর শ্রীবদনে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত হইল। তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি প্রেমাবেগে সেই দেওয়ালের ভিতে পুনঃ পুনঃ নিজ বদন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাসিকায়, শ্রীমুখে, গণ্ডে অসংখ্য ক্ষত হইল—অজস্র রক্তধার পড়িতে লাগিল,—তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই,—কোন দিকে দৃষ্টি নাই। সমস্ত রাত্রি মহাপ্রভু আমার এই হৃদিবিদারক কার্য্য করিলেন। তাহার পর তিনি হতাশ্বাস হইয়া বসিয়া পড়িলেন,—তাঁহার শ্রীমুখে গোঁ! গোঁ! শব্দ শ্রুত হইল। স্বরূপদামোদর তাহা শুনিয়া উঠিয়া দীপ জালিলেন(১)। গোবিন্দ ও তিনি প্রদীপ লইয়া ভিতরে গিয়া মহাপ্রভুর অবস্থা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মহাপ্রভুর শ্রীমুখের প্রতি চাহিয়া চক্ষের জলে তাঁহাদের দুই জনের বক্ষ ভাসিয়া গেল। দুই জনেই চক্ষু মুদিত করিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারা মহাপ্রভুকে ধরিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করাইলেন,—এবং নানাপ্রকার সেবা সুশ্রুষা দ্বারা

(১) বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরার ভিতে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥
সব রাত্রি করে ভিতে মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন॥ চৈঃ চঃ

তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করাইলেন। তাঁহারা দুই জনেই মহা সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—আমাদের নিদ্রাই কাল হইল,—যদি জাগিয়া থাকিতাম মহাপ্রভুর এ অবস্থা হইত না—আমাদের মরণ মঙ্গল। এই বলিয়া তাঁহারা দুই জনেই দুঃখে ও ক্ষোভে গালে মুখে চড়াইতে লাগিলেন—দেওয়ালের ভিতে মাথা কুটিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কিছু সুস্থ হইলে স্বরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু হে! তোমার এসব কি? কি করিয়া তুমি তোমার শ্রীবদনমণ্ডল এমন করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিলে?" মহাপ্রভু তখন ধীরে ধীরে কহিলেন—

———"উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বলি শীঘ্র বাহিরে যাইতে॥
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে॥" চৈঃ চঃ

প্রভুর শ্রীমুখের এই কথা শুনিয়া স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দের মনের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা দুইজনে মনোদুঃখে ক্ষোভে পুনরায় গালে মুখে চড়াইতে লাগিলেন। কেন তাঁহারা জাগিয়া সমস্ত রাত্রি কাটান নাই,—কেন তাঁহারা মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করেন নাই,—কেন তাঁহারা গৃহে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখেন নাই,—এই সকল নানা প্রকার তাঁহাদের ত্রুটি বশতঃই মহাপ্রভুর এই দশা হইল,—ইহা ভাবিয়া তাঁহারা যেন জীবন্মৃত হইলেন। যাহা হইয়াছে,—তাহার আর হাত নাই। মহাপ্রভু এক্ষণে কৃষ্ণবিরহজ্বালায় উন্মাদগ্রস্থ হইয়াছেন, তিনি যাহা কিছু বলিতেছেন, এবং করিতেছেন, তাহাতে উন্মাদের লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহাকে রাত্রিকালে আর একা ঘরে রাখা কোনপ্রকারে ঠিক নহে,স্বরূপগোসাঞি ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নীরব আছেন,—শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করান হইয়াছে সত্য, কিন্তু শয্যা তাঁহার কণ্টকস্বরূপ হইয়াছে। তিনি এপাশ ওপাশ করিতেছেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। কোন গতিকে রাত্রি প্রভাত হইল,—ভক্তগণ আসিলেন,—আসিয়া তাঁহারা যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের হৃদয় শতধা ফাটিয়া গেল,—চক্ষে জল আসিল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। স্বরূপদামোদর সকল কথা তাঁহাদিগকে খুলিয়া বলিলেন এবং রাত্রিতে মহাপ্রভুর নিকটে ভিতর প্রকোষ্ঠে যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে একজনের থাকিবার বন্দোবস্ত হয়, তাহার কথা তুলিলেন। মহাপ্রভুর নিষেধ,—ভিতরে তাঁহার নিকট কেহ থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে। সর্ব্ব ভক্তগণ একত্র হইয়া মহাপ্রভুকে বুঝাইলেন,—এবং অনেক করিয়া সাধিলেন। তিনি নীরবে সকলি শুনিলেন, কিন্তু মৌন হইয়া রহিলেন। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং". এই বিবেচনা করিয়া সকলে বিচার করিয়া সেদিন হইতে শঙ্কর পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর নিকট রাত্রিকালে গম্ভীরামন্দিরে শয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিলেন (১)।

শঙ্কর পণ্ডিতের এখানে একটু পরিচয় দিব। এই মহাপুরুষ দামোদর পণ্ডিতের অনুজ। ইনিও উদাসীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বঙ্গবাসী অন্যান্য ভক্তের সহিত নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবায় ব্রতী ছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গগত প্রাণ। মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিতেন। ভক্তগণ সেইজন্য এই মহাপুরুষকে তাঁহার নিকট রাত্রিবাসের জন্য নিয়োজিত করিলেন। শঙ্করপণ্ডিতের মনে ইহাতে বড় আনন্দ হইল। তিনি মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সেবার জন্য লালায়িত ছিলেন। এক্ষণে ভক্তবৃন্দের কৃপায় এই সর্ব্বোচ্চ সেবার অধিকারী হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি নয়ন তুলিয়া চাহিয়াছেন; তিনি ভক্তগণের আদেশ পাইয়া একেবারে গিয়া মহাপ্রভুর চরণতলে পড়িলেন। তিনি তখন বসিয়া ছিলেন,—মালা জপ করিতেছিলেন,—এখন তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা। তিনি গতরাত্রির কাণ্ড মনে করিয়া আজ যেন বড় লজ্জিত,—তাই, অধোবদনে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। শঙ্করপণ্ডিতকে চরণতলে দেখিয়া শ্রীবদন উঠাইয়া তাঁহার প্রতি করুণ নয়নে একবার চাহিলেন। তখন শঙ্করপণ্ডিত করযোড়ে সাহসে ভর করিয়া নিবেদন

(১) সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল॥ চৈঃ চঃ

করিলেন "প্রভু হে! তোমার চরণসেবার আমি অধিকারী নই,—তবে তোমারই কৃপায় আজ আমি ভক্তগণের আদেশ পাইয়াছি, আমার চিরদিনের সাধ আজ মিটিল,—আমার মানব জীবন সার্থক হইল। আমি ক্ষুদ্র জীব,—তুমি পতিতপাবন, দয়ার সাগর, নিখিল জগতের অধীশ্বর। আমি তোমাকে কি বলিতে পারি? আমার চিরজীবনের আশা দয়া করিয়া তুমি প্রভু পূর্ণ কর, শ্রীমুখের একটী মধুর কথা কহিয়া বল—"এদাসকে তোমার রাতুল পদসেবার অধিকারী করিবে,—তাহার এই দেহটাকে তোমার অভয় চরণতলে একটু স্থান দিবে"। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু ভক্তের কাতর ভিক্ষা ও সকরুণ প্রার্থনা কি না শুনিয়া থাকিতে পারেন? এত দুঃখের উপরও ভক্তের কাতর মনোবেদনায় তাঁহার করুণ হৃদয় মথিত করিল। তিনি শঙ্করপণ্ডিতের মস্তকে পদ্মহস্ত দিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "শঙ্কর! আমি এখন অকথন ব্যাধিগ্রস্থ,—রাত্রিতে আমার নিদ্রা নাই,—তুমি আমার নিকটে থাকিলে তোমারও নিদ্রা হইবে না,—তবে তুমি যখন আমার জন্য এতদূর কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত,—আমার তাহাতে কি আপত্তি হইতে পারে?" মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়া শঙ্করপণ্ডিত প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া বারম্বার তাঁহার চরণধূলি লইতে লাগিলেন, এবং ভক্তগণ সমীপে অতিশয় দীনভাবে নিজ সৌভাগ্যের কথা বলিতে লাগিলেন।

আজি হইতে শঙ্করপণ্ডিত গম্ভীরাপ্রকোষ্ঠে মহাপ্রভুর সহিত একত্রে থাকিতে অনুমতি পাইলেন। মহাপ্রভুর চরণতলে তিনি শয়ন করিতেন, আর কৃপানিধি প্রভু তাঁহার শরীরের উপর তাঁহার অজভববন্দিত কমলাসেবিত শ্রীচরণ প্রসার করিয়া মৃদুমন্দ কীর্ত্তন করিতেন (১)। এই জন্য ভক্তগণ এই মহা ভাগ্যবান্ শঙ্কর পণ্ডিতের নাম দিলেন "প্রভু-পাদোপধান"। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেঃ—

"প্রভু-পাদোপধান বলি তাঁর নাম হইল"।

পূর্ব্ব লীলায় বিদুরের ভাগ্যে একবার এইরূপ শুভ সংযোগ হইয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে (২)। শঙ্কর পণ্ডিত আজ যে সৌভাগ্য পাইলেন,—শিববিরিঞ্চি তাহা পান নাই। হে গৌরাঙ্গ! শঙ্করের প্রতি তুমি যেরূপ কৃপা-বৃষ্টি করিলে,—জগতের সমস্ত জীবের প্রতি তুমি সেইরূপ কৃপাবৃষ্টি কর,—কেহ যেন তোমার এরূপ কৃপায় বঞ্চিত না হয়। জগজ্জীবের মধ্যে তোমার এরূপ কৃপাভিখারী জীবাধম গ্রন্থকার একটী নগণ্য কীটানুকীট। হে করুণা-নিধে! হে দয়াসিন্ধো! হে জগদৈকবন্ধো! জগজ্জীবের আশা ও প্রাণের পিপাসা পূর্ণ কর; তাহা হইলেই এ জীবাধমের আশা ও পিপাসা পূর্ণ হইবে। তুমি যে প্রভু বহুবল্লভ,—তাহা জানি। সর্ব্বজীবে তোমার সমান দয়া। সর্ব্বজীবের মধ্যে জীবাধম একটী ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীব। তাহার প্রতি তোমার কৃপাসিন্ধুর একবিন্দুও কি পতিত হইবে না? তাহার ভাগ্যে কি তোমার শ্রীচরণসেবা ঘটিবে না?

বহুদিন পূর্ব্বে একদিন মনের আবেগে লিখিয়াছিলাম—

গৌরাঙ্গ বলিয়া পরাণ ত্যজিব
চির জীবনের আশ।
মিটাবে কি তাহা গৌরভগবান্
পূরাবে কি অভিলাষ?
কোন আশা নাই কিছু না চাই
(সুধু) চাই এই বরদান।
গৌরাঙ্গ বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে
যায় যেন মোর প্রাণ॥

* * * *

গৌর ভকত! সকলে কর গো
(মোর) মাথায় চরণাঘাত।
ভক্ত-পদাঘাতে সবার সমক্ষে
হয় হেন প্রাণপাত।
গৌরাঙ্গ বলিয়া জীবন ত্যজিব
এবড় উচ্চ আশা।

(১) প্রভুপাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তাঁর উপরে করে পাদ প্রসারণ॥ চৈঃ চঃ

(২) ইতি ব্রুবানং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানং।
প্রহৃষ্ট-রোমা ভগবৎ কথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥
শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৩।৫

হবে কি কপালে এহেন সুদিন,
হরি যে করম নাশা।

ভাবের স্রোতে ভাসিয়া অকুলে পড়িয়াছি—লীলাকথার রসভঙ্গ হইল,—কৃপানিধি পাঠকগণের চরণে অপরাধী হইলাম,—তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

শঙ্করপণ্ডিত কিরূপ ভাবে মহাপ্রভুর পাদসেবা করিতেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া রাখিয়াছেন ; যথা—

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ সম্বাহন।
ঘুমাইয়া পড়েন, তৈছে করেন শয়ন॥
উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাঁহারে জড়ায়॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ॥
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে প্রভু মুখাব্জ ঘসিতে॥

অর্থাৎ মহাপ্রভু যখন নিদ্রা যান, তখন শঙ্করপণ্ডিত ধীরে ধীরে তাঁহার চরণতলে বসিয়া কমলাসেবিত রাঙ্গা পা দুঃখানি নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া পাদ সম্বাহন করেন। আবার যখন অনাবৃত অঙ্গে শঙ্কর কখন কখন নিদ্রাভিভূত হন, ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তখন নিজ শ্রীঅঙ্গের জীর্ণ কন্থা খানি শঙ্করের গাত্রে চাপাইয়া দেন। কারণ শীতকাল,—শঙ্কর শীতে কষ্ট পাইবে,—ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তাহা কি করিয়া দেখিবেন? শঙ্করের নিদ্রা প্রগাঢ় হইলেও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। যেমন মহাপ্রভু তাঁহার কন্থাখানি শঙ্করের গাত্রে নিক্ষেপ করেন,—তেমনি শঙ্কর উঠিয়া বসেন এবং পুনরায় মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে কন্থাখানি দিয়া তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিতে বসেন! এই ভাবে তিনি রাত্রিজাগরণ করিয়া কৃষ্ণবিরহদশাগ্রস্থ মহাপ্রভুর সেবা করেন। শঙ্কর পণ্ডিতের ভয়ে মহাপ্রভুর আর গম্ভীরার বাহিরে যাওয়া হয় না,—দুঃখ-লীলাভিনয় করাও হয় না। ভক্তগণ এই জন্যই শঙ্কর পণ্ডিতকে রাত্রিতে মহাপ্রভুর পদসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রভুর নিদ্রাকালে তিনি তাঁহার চরণতলে শয়ন করিয়া তাঁহার শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত চরণ দুখানি নিজ অঙ্গের উপর ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাতে মহাপ্রভুর আরাম হয়। এই জন্যই ভক্তগণ তাঁহার নাম রাখিলেন "প্রভুর পাদোপধান।"

রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর এই মুখাব্জঘর্ষণ-লীলা-কাহিনীটি তাঁহার শ্রীচৈতন্য-স্তবকল্পবৃক্ষে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

যিনি স্বকীয় প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ ব্রজবিরহে উন্মত্ত হইয়া প্রলাপ করিতে করিতে বিকলচিত্ত হইতেন এবং যাঁহার ভিত্তিতে মুখঘর্ষণজনিত ক্ষতদ্বারে রুধিরধারা নির্গত হয়, সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিতেছেন।

রঘুনাথদাস গোস্বামীর মুখে কবিরাজ গোস্বামী এই সকল লীলাকথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভুর গম্ভীরার লীলারঙ্গ সকলি অতিশয় গম্ভীর। এই সকল লীলা-রসাস্বাদনের অধিকারী কোটীর মধ্যে একজন। কিন্তু গৌরভক্তগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় অনেকেই উচ্চাধিকারী। গম্ভীরার গৌরাঙ্গলীলা তাঁহাদিগের ধ্যানের বস্তু। রঘুনাথদাস গোস্বামী এই লীলা ধ্যান করিতেন, তাহা তাঁহার লিখিত উক্ত শ্লোক পাঠেই বুঝিতে পারিবেন।

মহাপ্রভুর এই গম্ভীরামন্দিরের ভিত্তিতি শ্রীমুখাব্জ ঘর্ষণ-লীলা বর্ণনা করিতে করিতে জীবাধম গ্রন্থকারের মন দুঃখ ও রাগে অভিভূত হইয়াছিল। এই দুঃখ ও রাগের কারণটি না জনাইলে তাহার মনের দুঃখ যেন লাঘব হইতেছে না, এইরূপ বোধ হইতেছে। এইজন্য তাহা এইস্থলে লিখিত হইল।

মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদাবস্থা স্বরূপগোসাঞি এবং গোবিন্দ উভয়েই বিশেষরূপে জানিতেন। তাঁহারা উভয়েই

সে রাত্রিতে গম্ভীরা মন্দিরের দ্বারদেশে শয়ন করিয়াছিলেন,—তাঁহাদের শয়ন করিবার উদ্দেশ্য মহাপ্রভুকে সর্ব্বভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা। স্বরূপ গোস্বামি মহাপ্রভুর একজন একান্ত অন্তরঙ্গ নিজজন,—গোবিন্দ তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য এবং শ্রীঅঙ্গসেবক ও রক্ষক। দুই জনেরই বয়ঃক্রম কম হয় নাই। কবিয়া একজন পণ্ডিত শিরোমণি,—অপরজন সেবক চূড়ামণি। তাঁহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি দেখিয়া জীবাধম গ্রন্থকারের মনে দুঃখ ও রাগ হইয়াছিল। অনায়াসে তাঁহারা পালাপালি করিযা একজন জাগিয়া থাকিতে পারিতেন,—দুই জনের একসঙ্গে নিদ্রা যাইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। যখন দুই জনে তাঁহারা দ্বাররক্ষক এবং দেহরক্ষকরূপে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল, একজনের জাগিয়া থাকা, এবং মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের নিরুপদ্রবতার উপর লক্ষ্য রাখা। এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটির জন্য আজি মহাপ্রভুর শ্রীবদনের যে অবস্থা তাঁহারা দেখিযা মহা দুঃখ পাইলেন, তাহার জন্য তাঁহারাই দায়ী। কারণ মহাপ্রভুর উন্মাদ-দশা,—উন্মাদাবস্থায় যিনি যাহা করেন, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন,—তাঁহার দেহরক্ষক, এবং তত্ত্বাবধারক দায়ী। পুত্র যদি উন্মাদ হয়, পিতামাতা তাঁহাকে চোখে চোখে রাখেন, স্বামী যদি উন্মাদ হন,—স্ত্রী তাঁহাকে চক্ষের আড়াল করে না, ভ্রাতা যদি উন্মাদ হয়,—তাহার কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ কখন তাহাকে একা এক ঘরে রাখিয়া ঘুমাইতে পারে না। মহাপ্রভু তাঁহার স্নেহময়ী জননী এবং ভক্তিমতী স্ত্রীকে জনমের মত দুঃখপাথারে ভাসাইয়া,—তাঁদের বক্ষে শেল মারিয়া,—জীবের মঙ্গলের জন্য,—ভক্তগণের মঙ্গল কামনায় অতি দীনাতিদীনভাবে কন্থা করঙ্গ কোপীন লইয়া গম্ভীরার মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার ভজন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিবার সময়। স্বয়ং ভগবান প্রাণটিকে পর্য্যন্ত এই জগন্মঙ্গল ভজন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে বসিয়াছেন। আজ যদি শচীমাতা তাঁহার পুত্রের নিকটে থাকিতেন,—তিনি কি স্বরূপ গোস্বামির মত ঘুমাইতে পারিতেন? আজ যদি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার উন্মাদগ্রস্থ প্রাণবল্লভের সেবা-ভার পাইতেন, তিনি কি গোবিন্দের মত ঘুমাইয়া পড়িতে পারিতেন? স্বরূপ ও গোবিন্দ যাহা করিলেন, তাহা কোন স্নেহময়ী জননী কিম্বা পরিব্রতা রমণী করিতে পারেন না। ইহাঁদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটির জন্য আজ মহাপ্রভুর যে দশা হইল,—তাহা যদি শচীমাতা বা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বচক্ষে দেখিতেন,—তাঁহারা নিঃসন্দেহ আত্মহত্যা করিতেন। মহাপ্রভু সংসারে থাকিলে, এদশা তাঁহার কখনই হইত না।—একথা নিশ্চিৎ। স্বরূপ গোসাঞি এবং গোবিন্দের উপর এই জন্যই জীবাধম গ্রন্থকারের অভিমান ও রাগ। রাগভরে তাঁহাদিগকে কত কথা বলিয়াছি,—এখনও রাগ সম্পূর্ণ যায় নাই। যদি কখন তাঁহাদিগকে দেখা পাই,—সে সৌভাগ্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ যদি কখন দেন, —মনে বড় ইচ্ছা আরও দু'কথা শুনাইয়া দিব, তাঁহারা যদি এই বাতুলের কথায় রাগ করেন,—অপরাধ গ্রহণ করেন,—তাহাতে তাহার কোন দুঃখ নাই,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াভল্লভের দুঃখে তাহার হৃদয় ব্যথিত,—শচীনন্দনের সেই ক্ষতবিক্ষত রক্তধারাপ্লুত শ্রীমুখাব্জ খানি তাহার অন্তরের মধ্যে আজি প্রতি মুহূর্ত্তেই উদয় হইতেছে—সেই দুঃখস্মৃতি তাহার অশান্ত মনকে অত্যন্ত ব্যাকুলিত করিতেছে—প্রাণে তাহার কিছুতেই শান্তি বোধ হইতেছে না। স্বরূপগোসাঞি! গোবিন্দদাস! আপনারা একি করিলেন? আপনাদের মুখেই এই ভীষণ হৃদিবিদারক কথা শুনিতে হইল! এই দুঃখেই মরমে মরিলাম। এই ভীষণ মর্ম্মভেদী হৃৎপিণ্ডছিন্নকারী কথা শুনিবার পূর্ব্বেই আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না কেন? শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামি! আপনিই বা এই ভীষণ প্রাণঘাতী কথা আপনার রচিত স্তবে কি করিয়া লিখিলেন? কবিরাজ গোস্বামি! আপনিইবা কি করিয়া এই প্রাণঘাতী লীলা-কথা বিস্তার করিলেন? জীবাধম গ্রন্থকার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুরীষের কীট আমি,—আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে গিয়া আজ যে প্রাণে মরিলাম! এক্ষণে সকলে মিলিয়া এই জীবাধম গ্রন্থকারকে কৃপা করুন—তাহার মস্তকে চরণাঘাত করিয়া এই জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। কারণ আমি আপনাদের মত পূজ্যপাদ

মহাজনগণের কার্য্যে কটাক্ষ করিতেছি—আপনাদিগকে কুবাক্য বলিতেছি। আমি আজ উন্মাদগ্রস্থ নরপশু! প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুর প্রলাপবর্ণনা করিতে গিয়া আমি আপনার প্রলাপই বর্ণনা করিতেছি। পাগলের সাত খুন মাপ,—পাগলের এই উন্মত্ত প্রলাপের মর্ম্ম বুঝিয়া তবে আমাকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবেন। আর বেশী কিছু আমি বলিতে চাহি না। প্রাণের আবেগে,—মনের আক্ষেপে,—ভাবের উচ্ছাসে ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু কেশে ধরিয়া যাহা বলাইলেন, তাহাই বলিলাম। এপর্য্যন্ত যাহা কেহ বলিতে সাহস করেন নাই,—মুখ ফুটিয়া মনের কথা,—প্রাণের মর্ম্মব্যথা এপর্য্যন্ত যাহা কেহ মুখে বা কাগজে কলমে প্রকাশ করেন নাই—আমি তাহা করিলাম,—এ বড় দুঃসাহসের কার্য্য—তাহাও আমি জানি ও বুঝি—জানিয়া বুঝিয়াও এ কুকার্য্য আমি করিলাম—এ অপরাধ আমি সঞ্চয় করিলাম। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ স্বয়ং ইহার বিচার করিবেন—এই অপরাধের বিচার ভার তাঁহার উপর দিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না—মনে কিছু সন্দেহ হইতেছে,—বুঝি বিচারটা বা ঠিক না হয়—জুরীর বিচার আমি বড় ভালবাসি—গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শচীমাতা এবং নদীয়াবাসিনী বৈষ্ণবগৃহিণীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অপরাধের বিচার করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ানাথ আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন, ইহাই আমার একান্ত প্রাণের প্রার্থনা। জয় গৌর।

ষষ্ঠিতম অধ্যায়।

—০:০—

মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণন।

(পঞ্চম চিত্র)

—০:০—

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে॥ চৈঃ চঃ

—:০:—

মহাপ্রভুর গম্ভীরার লীলারঙ্গ দ্বাদশ বর্ষব্যাপী। কৃষ্ণ বিরহে তিনি এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রেমোন্মাদভাবে যে প্রেমবিকার লীলারঙ্গ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহার আভাস মাত্র আমরা গ্রন্থে দেখিতে পাই। মহাজনগণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সূত্র মাত্র। মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত লীলারঙ্গের প্রতি অঙ্গ যদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইত, তাঁহার ভাব-সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গোচ্ছাস যদি পৃথকভাবে ধ্বনিত হইত, তাহা হইলে কি যে হইত, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার যে ভাবাংশটি ভক্তগণকে দেখাইয়াছেন,—তাহাই জগজ্জীবের গোচরীভূত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারাই ধর্ম্মজগতের মহদুপকার সংসাধিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। যাহা লোকে কখন শুনে নাই,—চক্ষে কখন দেখে নাই,—কল্পনায় চিত্তে যাহা কখন আসে না,—শাস্ত্রে যাহা ঋষিগণ লিখিয়া যান নাই,—যাহা বেদের অগোচর—তাহাই সর্ব্বেশ্বর মহাপ্রভু তাঁহার অনুগত ভক্তজনকে স্বয়ং আচরিয়া কৃপা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর এই সকল অলৌকিক লীলারঙ্গ তর্কের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র,—বিচার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টাও নিষ্ফল। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া"।

এই যে বিশ্বাস, ইহাও মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের কৃপাসাপেক্ষ। কবিরাজ গোস্বামী ইহাও লিখিয়াছেন—

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দুহাঁর দাসের দাস।
যারে কৃপা করে তার হইবে বিশ্বাস॥

অতএব মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত লীলারহস্য বুঝিতে হইলে তাঁহার ভক্তগণের শরণ লইতে হইবে। তাঁহারা কৃপাময়, যেমন দয়ার মহাসাগর মহাপ্রভু,—তেমনি কৃপার সাগর তাঁহার ভক্তবৃন্দ। দীনভাবে অভিমানবর্জ্জিত হইয়া তাঁহাদিগের চরণে শরণ লইলেই তাঁহারা সকলি বুঝাইয়া দিবেন। তখন এই সকল অলৌকিক লীলারঙ্গ শুনিতে মনে অপার সুখ পাইবে,—হৃদয়ে অসীম আনন্দ আসিবে,—কুতর্ক বিচারবুদ্ধিজনিত আধ্যাত্মিক দুঃখ দূর হইবে। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধা করি শুন এই শুনিতে পাবে সুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ॥

এক্ষণে মহাপ্রভু দিবারাত্রি কৃষ্ণবিরহ-সিন্ধু-জলে মগ্ন; কখন ডুবেন,—কখন ভাসেন,—কখন তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া একেবারে ভাসিয়া যান। তাঁহার কৃষ্ণবিরহবিকারের এক্ষণে শেষ দশা উপস্থিত। ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকেন। নদীয়ার ভক্তগণ প্রতিবর্ষে মহাপ্রভু দর্শনে আসেন,—তিনিও তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ সাদর সম্ভাষণ করেন বটে, কিন্তু যেন অন্যমনস্কভাবে স্বভাব ও অভ্যাস-বশে করিতে হয় তাই করেন। নদীয়ার ভক্তগণ মহাপ্রভুকে এরূপ অবস্থায় দর্শন করিয়া মনে বড় কষ্ট পান,—তিনি এখন জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছেন,—কীর্ত্তনে তেমন স্ফুর্ত্তি নাই,—সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বরের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ যেন পূর্ণ হইয়াছে,—ইহাই তাঁহাদের মনে মনে অনুভব হয়। মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া তাঁহারা মরমে মরিয়া যান। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু প্রাণপণে তাঁহাদিগকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করেন,—নিজের মনের ভাব লুকাইতে চেষ্টা করেন,—কিন্তু পারেন না। তিনি প্রেমাবেগে কাঁদিয়া আকুল হন,—নদীয়ার ভক্তগণও কাঁদিয়া আকুল হন। ভক্ত ও ভগবানের নয়নের প্রেম জলে নীলাচল ভাসিয়া যায়—সেই প্রেমনদীর তরঙ্গ নবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়। যে স্থান দিয়া সে প্রেমতরঙ্গ যায়,—সে স্থানের লোকসকলের চক্ষেও প্রেমনদী বহে।

নীলাচলের ভক্তবৃন্দ সর্ব্বদা মহাপ্রভু সন্নিধানে থাকেন। রামানন্দরায় ও স্বরূপগোসাঞি এখন আর তাঁহার কাছ-ছাড়া হন না। এই দুইজনের সঙ্গ না হইলে মহাপ্রভুর দশা অধিকতর কষ্টকর হইত, এবং ভক্তগণের অধিকতর উদ্বেগের কারণ হইত। ইহাঁরা দুইজনে তৈলধারাবৎ অবিরল কৃষ্ণকথারঙ্গে মহাপ্রভুকে সচেতন রাখিতেছেন।

বৈশাখ মাস, পূর্ণিমাতিথি! রাত্রিকালে মৃদুমন্দ মলয় পবন বহিতেছে। সুবিমল চন্দ্রালোকে নীলাচলস্থ উদ্যান সকল সমুদ্ভাসিত। মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমন্দির হইতে হইতে ধীরে ধীরে উঠিলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে উঠিলেন. কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু জগন্নাথবল্লভ উদ্যানের দিকে চলিলেন,—ভক্তগণও চলিলেন। তিনি উদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

তিনি কি দেখিলেন শুনুন—

প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুকশারী পিকভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন।
গুরু হইয়া তরুলতা শিখায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌরভগবান॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু ভাবিতেছেন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। বৃন্দাবনভাবে বিভোর হইয়া তিনি স্বরূপ গোসাঞিকে কহিলেন "স্বরূপ! ললিত লবঙ্গলতা' পদটী গান করত, শুনি"। স্বরূপ গোসাঞি এই পদটী গাইলেন, তাঁহার সুকণ্ঠ স্বর নিশীথগগন ভেদ করিয়া আকাশে উঠিল,—তরুলতা পশুপক্ষী পর্য্যন্ত তাঁহার গীত শুনিয়া উৎফুল্ল হইল। মহাপ্রভুর প্রাণের মধ্যে স্বরূপের গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে প্রতি বৃক্ষলতাবল্লীর নিকট ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সকলেই সঙ্গে আছেন। হঠাৎ মহাপ্রভু একটী অশোক বৃক্ষতলে মধুর মুরলীধারী তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া সেই দিকে চলিলেন। মহাপ্রভুকে দেখিয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণ মৃদুমধুর হাসিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। "এই এখনি কৃষ্ণের দেখা পাইলাম, হায়! পুনরায় হারাইলাম" এই বলিয়া কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন (১)। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উদ্যান পরিপূর্ণ হইল। মহাপ্রভু এই অপূর্ব্ব অঙ্গগন্ধ পাইয়া প্রেমানন্দে অচেতন

---

(১) কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তাঁরে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥ চৈঃ চঃ

হইয়া পড়িয়া আছেন। ভক্তগণ বহুক্ষণ তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন তিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধে উন্মত্ত। কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধিকা যে ভাবে কৃষ্ণঅঙ্গগন্ধলুব্ধচিত্ত হইয়া সখি বিশাখাকে বলিয়াছিলেন ঠিক সেইভাবে, রামানন্দ রায়ের প্রতি চাহিয়া তিনি গোবিন্দলীলামৃতের এই শ্লোকটি প্রেমাবেগে আবৃত্তি করিলেন—

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মিকৃষ্ণাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরু সুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহন সখি তনোতি নাসাস্পৃহাং॥

অর্থ। যিনি মৃগমদগন্ধাপেক্ষাও সুরভিময় অঙ্গ পরিমলের প্রবাহাঘাতে ব্রজবালাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করেন,—যাঁহার মুখ, নেত্র, নাভি, কর, চরণ প্রভৃতি অষ্ট অঙ্গ পদ্মে কর্পূরাক্ত কমলগন্ধ নিহিত আছে,—যিনি কস্তুরী, কর্পূর, শ্বেতচন্দন ও অগুরু দ্বারা নিয়ত সেব্যমান,—সেই মদন-মোহন শ্রীকৃষ্ণ আমার নাসার আঘ্রাণ-লালসা বর্দ্ধিত করিতেছেন।

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু স্বয়ং এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় মহাপ্রভুর শ্রীমুখের ব্যাখ্যা শুনুন—

কস্তুরিকা নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণঅঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাশাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণ পাশ ধরি লঞা যায়॥ ধ্রু॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে।
কর্পূর লিপ্ত কমল, তার যেই পরিমল
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্ম সঙ্গে॥
হেমকীলিত (১) চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূর সঙ্গে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গগন্ধ সঙ্গে,
মিলি যেন করে ডাকা চুরি॥
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন
খসায় নীবী, ছুটায় কেশবন্ধ।
করিয়া আগে বাউরী নাচায় জগত নারী
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ॥
সে গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাঞা পিয়ে পেট ভরে, তবু "পিঙো পিঙো" করে
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥
মদন মোহন নাট পসারি গন্ধের হাট
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনা মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥

মহাপ্রভু এইরূপে উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ করিতেছেন আর ভৃঙ্গের মত এদিক ওদিকে চাহিতেছেন। তিনি এক একবার প্রেমাবেগে বৃক্ষলতার দিকে যাইতেছেন,—তাহা-দিগের গাত্রে শ্রীহস্ত দিতেছেন। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ তিনি এখনও পাইতেছেন—কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না—এই দুঃখে তিনি হাহাকার করিতেছেন। স্বরূপ গোসাঞি এবং রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে ধরিয়া আছেন। স্বরূপ সময়োচিত ও মহাপ্রভুর ভাবানুযায়ী মধ্যে মধ্যে এক একটী গীত গাইতেছেন,—ইহাতে তাঁহার মনে আনন্দ হইতেছে। এইভাবে সেই জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে মহাপ্রভু সমস্ত রাত্রিটি কাটাইলেন,—কাহারও নয়নে নিদ্রার লেশও আসিল না। প্রভাত হইলে ব্রজভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন তিনি স্বরূপ দামোদরের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "স্বরূপ! এখন আমি এই উদ্যানে কেন? কে আমাকে এখানে আনিল?" স্বরূপ তখন পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনাবলী বলিলেন,—শুনিয়া মহাপ্রভু অধোবদনে উত্তর

(১) হেম কীলিত—স্বর্ণবর্ণ নিবদ্ধ।

করিলেন "আমি কি উন্মাদ হইলাম ! কৃষ্ণের কি এই ইচ্ছা ছিল। আমাকে পাগল করিয়া কৃষ্ণের কি লাভ হইবে তাহা ত আমি বুঝি না। স্বরূপ ! আমি যে প্রাণে মরিলাম। যাহার জন্য কুল শীল মান ধর্ম্ম সকলি খোয়াইলাম তাঁর কি এই কাজ ?" এই বলিয়া কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু ভূমিতলে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন।

স্বরূপ ও রামরায় মহাপ্রভুকে বহুপ্রকার সান্ত্বনা করিয়া সমুদ্রস্নান করাইয়া জগন্নাথ দর্শনে লইয়া আসিলেন। কৃষ্ণবিরহকাতর মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের শ্রীবদনচন্দ্র দর্শন করিবামাত্র পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। শ্রীমন্দিরে তখন বহুভক্তের সমাগম হইয়াছে। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে করঙ্গের জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোসাঞি বহির্ব্বাস দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। বহু কষ্টে এবং সুশ্রূষার পর তাহার চৈতন্য উৎপাদন হইল। তিনি "হা কৃষ্ণ" বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। বহুকষ্টে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে বাসায় ধরিয়া লইয়া গেলেন। তিনি নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—গোবিন্দ তাঁহার ভার লইলেন—তখন ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

সেদিন মহাপ্রভু অতি কষ্টে কাটাইলেন। প্রসাদ স্পর্শ করিলেন মাত্র। সন্ধ্যার পর স্বরূপ ও রাম রায় আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া নিকটে বসিলেন; তিনি গম্ভীরার মধ্যে নীরবে বসিয়া অঝোর নয়নে রোদন করিতেছেন। স্বরূপ ও রাম রায়কে দেখিবামাত্র তাঁহার কৃষ্ণবিরহদুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি স্বরূপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "স্বরূপ একটা গান কর"। স্বরূপ তাঁহার ভাবোচিত গান ধরিলেন—

সজনি ! কো কহে আয়ব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পায়ব
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই ॥
এখন তখন করি দিবস গোঙায়িনু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গোঙায়নু
ছোড়লু জীবনক আশা ॥
বরষ বরষ করি সময় গোঙায়নু
খোয়াইনু এ তনু আশে।
হিম কর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধব মাসে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বরযুবতী
অব নাহি হোয়ত নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন, হৃদয় আনন্দন
ঝটিতি মিলব তব পাশ ॥

মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া গান শুনিতেছিলেন,—গান বন্ধ হইলেই তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন। স্বরূপদামোদরের মুখের পানে করুন নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি কাঁদিতেছেন। তিনি এই গানটির ভিতর দিয়া মহাপ্রভুর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, শ্রীমতি রাধিকার ভাবলক্ষণের সহিত তাঁহার ভাবলক্ষণের তুলনা করিয়া, প্রেমে গদগদ হইয়া ঝুরিতেছেন। রাধাভাবোন্মত্ত মহাপ্রভু তাঁহার করপদ্মে স্বরূপের কর ধারণ করিয়া অতিশয় মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন "স্বরূপ ! বিদ্যাপতি ঠাকুরের কথা কি সত্য হইবে,—আমার হৃদয়ানন্দ ব্রজবিহারী কৃষ্ণ কি আসিবেন ?" মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না,—দারুণ বিরহব্যথায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল,—তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি বিরহিণী নববালার ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। স্বরূপ ও রামরায় তাঁহাকে কত বুঝাইলেন,—কিছুতেই তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে অস্ফুট বাক্যে স্বরূপের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"স্বরূপ ! আমি মরিব। তুমি সেই "মরিবমরিব সখি," সেই গানটি একবার গাও দেখি।" স্বরূপ দেখিলেন মহাপ্রভুর যেরূপ মানসিক অবস্থা এই সময়ে এই গানটি শুনিলে তাঁহাকে রক্ষা করা দায় হইবে। তিনি ভাবিতেছেন কি করি ? মহাপ্রভুর আদেশ রক্ষা যদি না করি, তাহা হইলেও তাঁহার মনে দুঃখ দেওয়া হয়,—আর যদি রক্ষা করি, তাহাতেও তাঁহার

দুঃখ। তবে প্রথম দুঃখ হইতে দ্বিতীয় দুঃখ মহাপ্রভুর পক্ষে সুখকর, এবং ইচ্ছা করিয়া তিনি তাহা চাহিয়া লইতেছেন, কারণ এদুঃখ তিনি দুঃখ বলিয়া মনে করেন না। বহুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বরূপ মধুকণ্ঠে গান ধরিলেন,—

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব ॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণ কালে কৃষ্ণনাম লিখ মোর অঙ্গে ॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কানে।
মরা দেহ প'ড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে ॥
না পোড়াইও মোর অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।
সেই সে তমালতরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অচেতন তনু মোর তাতে যেন রয় ॥
কবহু সে প্রিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাইব হাম প্রিয়া দরশনে ॥
পুন যদি চাঁদমুখ দরশন না পাব।
বিরহ অনলে মাহ তনু তেয়াগিব ॥

প্রভু বসিয়া গান শুনিতেছিলেন,—গান শুনিতে শুনিতে তিনি রামরায়ের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন,—তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অবশ, শিথিল ও শীতল,—নয়নকমল দুইটি উত্তান। তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া রামানন্দ রায় ভয় পাইলেন,—ইঙ্গিতে স্বরূপগোসাঞিকে গান বন্ধ করিতে বলিলেন। দুইজনে মিলিয়া তখন তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানহীন মহাপ্রভুর সেবা সুশ্রূষায় ব্যস্ত হইলেন। গোবিন্দকে ডাকিলেন। আরও কয়েকজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ নিশ্চেষ্ট,—শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ,—দেহে প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ। সকলেই সবিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। স্বরূপ ভাবিতেছেন, কেন আমি এই গানটি গাহিলাম? কেন আমার এমন কুবুদ্ধি হইল?—এই ভাবে কিছুক্ষণ গেল। তখন তাঁহারা সেই গভীর রাত্রিতে সকলে মিলিয়া উচ্চ করিয়া নামসঙ্কীর্তন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ মহাপ্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। তখন রামরায় স্বরূপ গোসাঞিকে চুপি চুপি কানে কানে কি বলিলেন। স্বরূপ গান ধরিলেন।

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥

গম্ভীরার মন্দির ভেদ করিয়া স্বরূপের কণ্ঠস্বর নিশীথ রাত্রিতে আকাশ ভেদ করিল। জগত নিস্তব্ধ,—গগন নিস্তব্ধ,—জীবগণ নীরব,—কেবল মাত্র স্বরূপের মধুর কণ্ঠের মধুর ধ্বনি সেই গভীর নীরবতা,—সেই নিশীথ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শ্রুত হইতেছে। মহাপ্রভুর হৃদয়ের অন্তস্তলে সে ধ্বনি প্রবেশ করিল,—তিনি শুনিলেন—আশার বাণী,—"বহুদিন পরে বঁধুয়া আসিয়াছে" অমনি তাঁহার চেতনা হইল,—তাঁহার এলায়িত শ্রীঅঙ্গের অবশতা দূর হইল,—তাঁহার শিথিল দেহযষ্টিখানি সবল হইল,—তিনি শ্রীঅঙ্গ মোড়া দিয়া রামরায়ের ক্রোড়ে শ্রীবদন লুকাইলেন। স্বরূপ বুঝিলেন মহাপ্রভুর অকথন ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ পড়িয়াছে,—তিনি প্রভুর এই কৃষ্ণ বিরহ ব্যাধির জন্য, বৈদ্যরাজ রামানন্দ রায়ের পরামর্শ মতে যে ঔষধের [illegible] বিয়াছেন, তাঁহাতে সুফল ফলিয়াছে, অতএব এই [illegible] প্রয়োজন। তাই তিনি পু[illegible] [illegible] গানের একটা চরণ মাত্র গাহিয়াছিলেন [illegible] শেষটুকু গাহিলেন।

এ[illegible]ক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
সে সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইনু ফিরে ॥
কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা আসিয়া ধরুক তান।

মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগণে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥

সমুদয় গানটি শুনিয়া মহাপ্রভু শ্রীবদন ফিরাইয়া নয়ন মেলিলেন,—তিনি তখনও রামানন্দ রায়ের ক্রোড়ে শায়িত — নয়ন মেলিতেই স্বরূপের সঙ্গে চোখো চোখি হইল। কারণ স্বরূপ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া গান করিতেছিলেন। মহাপ্রভু এক দৃষ্টে সতৃষ্ণ নয়নে স্বরূপের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এখনও তাঁহার কথা বলিবার শক্তি হয় নাই, কি যেন বলি বলি করিতেছেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মনের মধ্যে যেন কি উমুড়ি ঝুমুড়ি করিতেছে। সুচতুর স্বরূপ মহাপ্রভুর মনের ভাব বুঝিলেন। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি দেখিয়াই বুঝিলেন, তিনি যেন তাঁহার হারানিধি কৃষ্ণকে খুঁজিতেছেন,—একবার নয়ন ভরিয়া দেখিবেন, মহাপ্রভুর সেই আকর্ণবিশ্রান্ত কনককেতকী-সদৃশ নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু-ধারা অবিরল ঝরিতেছে,—শ্রীবদনমণ্ডল প্রফুল্ল বোধ হইতেছে।

স্বরূপ পুনরায় গান ধরিলেন,—

এস এস বন্ধু এস, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
সফল করিল বিধি॥

মহাপ্রভুর তখন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল,—তিনি অতিশয় লজ্জিতভাবে, প্রেমবিস্ফারিত লোচনে, গদগদকণ্ঠে রামরায়ের কণ্ঠদেশ দুই করে জড়াইয়া ধরিয়া স্বরূপের প্রতি সজল-নয়নে চাহিয়া কহিলেন "কই, আমার হারানিধি কৃষ্ণ কোথায়? সখি! একবার আমাকে দেখাও।" এই বলিয়া তিনি জোর করিয়া উঠিয়া বসিলেন। স্বরূপদামোদর ও রামরায় তাঁহাকে দুইদিক হইতে ধরিয়া বসিলেন। রাম-রায় তখন সস্নেহে মহাপ্রভুর চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিয়া কহিলেন "প্রভু হে! তোমার অন্তরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন,—তোমার হৃদয়ে বসিয়া তিনি তোমাকে প্রেমানন্দ দিতেছেন,—তোমার হৃদয়কুঞ্জে তিনি নিত্য নিরন্তর কেলি করিতেছেন,—কৃষ্ণ কি তোমা ছাড়া? তুমি কৃষ্ণের,—কৃষ্ণ তোমার,—তোমাদের সুখেই আমাদের সুখ"। মহাপ্রভু স্থিরভাবে রামরায়ের সারবান্ কথা কয়টি মন দিয়া শুনিলেন,—কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। এখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে,—তিনি সকলি বুঝিতে পারিতেছেন। রামরায় যে তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতেছেন, মহাপ্রভু তাহা বুঝিয়াই আর কোন উত্তর করিলেন না।

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। মহাপ্রভুকে এ অবস্থায় রাখিয়া গৃহে যাওয়া উচিত কি না, রামরায় স্বরূপ গোসাঞিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বরূপ বলিলেন "আমি যখন আছি, রায় মহাশয়! আপনি যাইতে পারেন।" মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া রামানন্দ রায় সেই রাত্রিতে গৃহে গমন করিলেন। ভক্তগণ যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিজ নিজ বাসায় গিয়াছেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ কেবল মহাপ্রভুর নিকটে রহিলেন। শঙ্কর পণ্ডিত অবশ্যই আছেন। স্বরূপ মহাপ্রভুকে শয়ন করাইয়া শঙ্করকে চুপি চুপি বলিলেন 'শঙ্কর পণ্ডিত! আজ একটু সাবধানে থাকিবেন। আজ মহাপ্রভুর মনের অবস্থা ভাল নাই"। গোবিন্দ ও স্বরূপ গম্ভীরার দ্বারদেশে শয়ন করিলেন। আজ কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই। গম্ভীরার প্রাচীরের ভিতে মহাপ্রভুর শ্রীমুখাব্জ ঘর্ষণ-লীলারঙ্গ হইতে গোবিন্দ বিশেষ সাবধান হইয়াছেন—শঙ্কর পণ্ডিতও সাবধান হইয়াছেন রাত্রিতে তাঁহারা আর নিদ্রা যান না—

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার॥
এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও লিখিত আছে—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

পূজ্য কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার প্রিয় পাঠকগণকে অতি সাবধান বাক্যে বুঝাইতেছেন,—

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥
ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমরগীতাতে॥ (১)

(১) শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমর-গীতার দশম স্কন্ধ ৪৭ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকগণ তাহা এইসঙ্গে পাঠ করিলে রস-পুষ্টি হইবে এই জন্য নিম্নে শ্রীরাধার এই প্রলাপ বর্ণনটি উদ্ধৃত হইল।

মধুপ কিতব বন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিত মালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥১॥
সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎ পাদপদ্মং নু পদ্মা
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃ শ্লোক জল্পৈঃ॥২॥
কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতি গৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।
বিজয়সখ সখীনাং গীয়তাং তৎ প্রসঙ্গঃ
ক্ষপিত কুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্ট মিষ্ঠাঃ॥৩॥
দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপট রুচির হাস ভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপিচ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃ শ্লোক শব্দঃ॥৪॥
বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয় বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিংনু সন্ধেয়মস্মিন্॥৫॥
মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাং।
বলিমপি বলিমত্ত্বা বেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ॥৬॥
যদনুচরিতলীলা কর্ণ-পীয়ূষ বিপ্রুট্
সকৃদদন বিধূত দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।

সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি॥৭॥
বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিক রুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শ-তীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তা॥৮॥
প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজ দ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীবধূঃ সাকমাস্তে॥৯॥
অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥১০॥

মহিষীর গীত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৯০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তাহারও দুইটী মাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ় নির্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন॥১॥
নেত্রে ন মীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধু-
দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুত পাদজুষ্টাং
কিম্বা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢ়ুং॥২॥

মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিত না বুঝে তার অর্থ বিশেষে॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস॥
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা শুনিতে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখ।

একমাত্র গৌরভক্ত রসিকভক্তজনই এই ব্রজরসতত্ত্ব-সারের মর্ম্মার্থ অনুভব করিবার অধিকারী—অন্যের পক্ষে তাহার ক্ষীণ চেষ্টাও অহিতকর। তাই পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন মহাপ্রভুর এই সকল অলৌকিক লীলা-রঙ্গে একমাত্র গৌরনিত্যানন্দদাসানুদাসের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও

আস্বাদনে প্রকৃত স্বধর্ম্ম ও স্বরূপগত অধিকার। গৌরভক্ত-কৃপাবলে এই বিশ্বাস ও অধিকার অর্জ্জনীয়।

কৃষ্ণবিরহ-মূর্চ্ছিত মহাপ্রভু গম্ভীরামন্দিরে বসিয়া ইহার পর রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর গোস্বামীর সহিত তাঁহার স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের শ্লোক আস্বাদন করিয়াছিলেন। সে সকল লীলা-তত্ত্ব-কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

এক্ষণে কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুর মনে সর্ব্বদা নানা প্রকার ভাবের উদয় হইতেছে,—তাঁহার হৃদয় যদ্যপি কোটি সমুদ্র হইতেও গম্ভীর,—তথাপি ভাবরূপ চন্দ্রোদয়ে তাঁহার ভাবগম্ভীর হৃদয়সমুদ্র সময় সময় অস্থির হইয়া পড়িতেছে; এক্ষণে তিনি—

যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠনে।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদনে॥ চৈঃ চঃ

সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকালব্যাপী এই কৃষ্ণবিরহরূপ অকথন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মহাপ্রভুর শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর গোসাঞি—তাঁহার পূর্ব্বলীলার দুই সখি বিশাখা ও ললিতা—ইঁহাদিগের সহিত মহাপ্রভু এই দ্বাদশ বর্ষ কাল দিবারাত্রি কৃষ্ণলীলারসাস্বাদন করিয়া কোন গতিকে তাঁহার ভক্তজীবনসর্ব্বস্ব প্রাণটি রক্ষা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥
সেই রস-লীলা সব আপনে অনন্ত॥
সহস্রবদনে বর্ণে নাহি পায় অন্ত॥
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে॥

শুধু আত্মশোধনের জন্য এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাজনগণের উচ্ছিষ্ট ভোজী জীবাধম ক্ষুদ্রবুদ্ধি গ্রন্থকার কোন গতিকে—

"সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে"।

ইহাও পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামীর বাক্য। তাঁহার চরণকমলে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া তাঁহারই ভাষায় তাঁহারই সুরে সুর মিলাইয়া কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাগণের নিকট গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি—

যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন॥
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্য-চরিত্র বর্ণন কৈল সমাপন॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবত বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীগ্রন্থে তিনি গৌরলীলাকথা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তিঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারিশেষামৃত কিছু মোকে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পাণি॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্ত জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥

পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী অতি বৃদ্ধবয়সে শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী সাধু বৈষ্ণববৃন্দের আদেশে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি শ্রীগ্রন্থশেষে অতি দীনভাবে যে অপূর্ব্ব আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি জীবাধম গ্রন্থকারের নাই। কৃপানিধি গৌর-

ভক্ত পাঠকবৃন্দ ইহার মর্ম্ম বুঝুন,এবং সকলকে বুঝান—ইহাই তাহার প্রার্থনা। ভক্ত ও ভগবত-কৃপাশক্তি দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়—পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে—অন্ধ চক্ষুষ্মাণ হয়—বৃদ্ধ যুবার মত কর্ম্মক্ষম হয়। কৃপাসিদ্ধ ভক্ত মহাজন-গণের দ্বারাই অনন্ত ভগবল্লীলা বর্ণন কথঞ্চিৎ সম্ভব। পূজ্য-পাদ কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন,—

আমি লিখি ইহ মিথ্যা করি অনুমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ-পুত্তলী সমান।।
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।।
নানা রোগগ্রস্থ চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি।।
পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখি যে শুন ইহার কারণ।
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ।।
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ।
ইহা সবার চরণ কৃপায় লিখায় আমারে।

ইহার পর কবিরাজগোস্বামী আর একটি পরম গুহ্য কথা লিখিয়াছেন—এই গুহ্যকথার মধ্যে নিগূঢ় ভজনরহস্য নিহিত আছে—সে রহস্য ভেদ করিবার অধিকার বা ক্ষমতা কাহারও নাই,—না থাকিবারই কথা। যিনি ভজনরস-ভুক্তভোগী এবং ভজনবিজ্ঞ তিনিই ইহার মর্ম্ম কথঞ্চিৎ বুঝিবেন—অপরে ইহা বুঝিয়াও বুঝিবেন না—বুঝাইলেও বুঝিবে না। সুতরাং তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। জীবাধম গ্রন্থকারের নিবেদন পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর বাক্যগুলি ভ্রমপ্রমাদশূন্য ও ধ্রুব সত্য জ্ঞানে কৃপানিধি পাঠক-বৃন্দ শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করুন এবং মনে মনে শ্রীগৌরাঙ্গচরণে অকপটে প্রার্থনা করুন,—যেন তাহা বিশ্বাস করিবার ও বুঝিবার শক্তি তিনি কৃপা করিয়া দান করেন। কবিরাজ গোস্বামী কি লিখিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—

"আর এক হয়, তিহোঁ অতি কৃপা করে।
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না যুয়ায় তবু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ॥
তোমা সবার চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন॥"

এই যে সরল প্রাণের সরল বিশ্বাস,—সরল মনের সরল কথা,—ইহার মূল্য অনেকেই বুঝেন না—অনেকেই জানেন না—ইহার মর্ম্ম অনুভব করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। এ শক্তি ভক্তিবলে অর্জ্জনীয়—এবং সাধনবলে প্রাপ্য। এই যে কবিরাজ গোস্বামীর প্রাণের মর্ম্মবাণী—

"কহিতে না যুয়ায় তবু রহিতে না পারি।"

আর—"না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ"

ইহার ভাব ও মর্ম্ম বুঝাইতে হইলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। সে সাধ্য জীবাধম গ্রন্থকারের নাই,—সে চেষ্টা যোগ্যতর ব্যক্তি করিলে সুখী হইব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থশেষে পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী আর একটী বড় সুন্দর কথা লিখিয়াছেন। শ্রীগুরু-কৃপা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। সর্ব্বকাল সর্ব্বভাবে শ্রীগুরু শিষ্যের পরম শুভানুধ্যায়ী। শিষ্যের এই বৃদ্ধবয়সে গুরুতর পরিশ্রম দেখিয়া তাঁহার গুরুদেব কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীগ্রন্থ-লিখন-কার্য্য-রূপ তাঁহার আদেশবাণী স্থগিদ করিলেন—শ্রীগুরুর আদেশবাণীরূপ নৃত্যের সহিত গ্রন্থকারশিষ্যের অনিপুনা ও ক্ষীণা বাণীরূপ নৃত্য ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল—মূল যন্ত্রীর বাণীনৃত্য স্থগিত হইলেই শাখাপ্রশাখার বাণী-নৃত্যের অবসান হয়। শাখাপ্রশাখার বাণী স্বাধীনভাবে নৃত্য করিতে জানে না—শ্রীগুরুর আদেশবাণীর সাহায্যে ও তাহার সঙ্গে এত দিন সে নৃত্যবিলাসরঙ্গে উন্মত্ত ছিল—এখন সে শ্রীগুরুর আদেশে বিশ্রাম করিল। তাই পূজ্যপাদ কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সবার চরণ কৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
ত্যর বাণী শিষ্যে তারে বহুত নাচাই॥

শিষ্যের শ্রম দেখি গুরু নাচান রাখিল।
কৃপা না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিল॥
অনিপুনা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল নাচি করিল বিশ্রামে॥

সর্ব্বশেষে মহা দৈন্যাবতার পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী বৈষ্ণবীয় দৈন্যের পরাকাষ্ঠা ও অবধি দেখাইয়া লিখিয়াছেন—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সবার চরণকৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করো মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু কর মস্তক ভূষণ।
তোমরা এই অমৃত পিলে সফল হইবে শ্রম॥

কৃপানিধি পাঠকবৃন্দ। কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রোতৃবর্গের কিরূপ সম্মান করিলেন, তাহা দেখিলেন ত? কিভাবে তাঁহাদিগকে ভক্তিজগতে কিরূপ উচ্চাসন প্রদান করিলেন, তাহা প্রত্যেক গৌরভক্ত নরনারীর নিগূঢ় চিন্তার বিষয়ীভূত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য গাঢ় অনুভবের বস্তু রূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে বিধিবদ্ধ ভাবে চিরদিনের মত অঙ্কিত হওয়া উচিত। এই যে শ্রোতাগণ,—ইহারা ভক্তা-ভক্ত-ভেদাভেদশূন্য—উচ্চনীচ জাতিভেদশূন্য—পণ্ডিতমূর্খ জ্ঞান-বিবর্জ্জিত। সার্ব্বজনীন পরমোদারভাবাপন্ন গৌরাঙ্গৈক-নিষ্ঠ পরম দৈন্যাবতার পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সর্ব্ববিধ শ্রোতাবর্গের শুধু চরণবন্দনা করিয়া তৃপ্ত না হইয়া আরও কি বলিলেন, তাহা আর একবার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করুন—

"চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করো মুঞি পানে॥

"শ্রোতাগণের" চরণ বন্দনা করিয়া তিনি এই অত্যুত্তম পয়ার-শ্লোকটি লিখিয়া বৈষ্ণবীয় দৈন্যের সীমা দেখাইলেন। "যেইজন শুনে"—ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কিছু করিয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-মধুপ সাধুবৈষ্ণব শ্রোতৃবর্গের কথা স্বতন্ত্র—তাঁহারা ত জগতপূজ্য—সর্ব্বারাধ্য। "যেই জন শুনে"—এই বাক্যের অর্থসঙ্গতি করিতে হইলে বুঝিতে হইবে—যে কোন লোক—তিনি হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন—ভক্তই হউন, আর অভক্তই হউন,—পাষণ্ডীই হউন আর সজ্জনই হউন,—শ্রীগৌরাঙ্গলীলা শ্রবণ করিতে যিনি উপস্থিত হইয়াছেন—'শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা'—তিনিই পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর মতে পূজ্য—তিনি দৃঢ়ভাবে পরম দৈন্যবাক্যে বলিতেছেন "তাহার চরণ ধুঞা করো মুঞি পান"। ইহা বৈষ্ণবীয় দৈন্যের অবধি—ইহা পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামীর পরমোদার সাধু বৈষ্ণবচরিত্রের পরমোজ্জ্বল ও পরম পবিত্র আদর্শ-রূপে ভক্তিজগতে চিরদিন পূজিত ও সম্মানিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্বশেষে একটী সংস্কৃত শ্লোক আছে,—যাহা কবিরাজগোস্বামীর রচিত—তাহাতেও তিনি বৈষ্ণবীয় দৈন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। উপসংহারের সে শ্লোকটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীল চৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশী শ্রদ্ধয়া স্বাদয়েদ্ যঃ।
তদমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেম মাধ্বীকপূরম্॥

অর্থ। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবিষ্ণুর অমৃত সদৃশ শুভদ এবং অশুভনাশী চরিত্র আস্বাদন করেন, এই লেখক তাঁহার অমল পাদপদ্মের ভৃঙ্গ হইয়া প্রেমমাধ্বীকপূর্ণ এই রস উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন।

উক্ত শ্লোকে পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামীর দৈন্যোক্তি শাস্ত্রশাসনগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তিনি এবার লিখিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত "শ্রদ্ধয়া স্বাদয়েৎ যঃ" অর্থাৎ "অপ্রাকৃত বিশ্বাসেন আস্বাদয়েৎ যঃ" এই বাক্যে "শ্রদ্ধা" ও "আস্বাদন" শব্দদ্বয় শাস্ত্রানুশাসন-সম্ভূত। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ শাস্ত্র বাক্যে, গুরুবাক্যে ও সাধু মহাজনবাক্যে বিশ্বাস,—আর আস্বাদন শব্দের অর্থ লীলা-রসজ্ঞানের অনুভূতি। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাকথার শ্রোতৃবর্গ যাহারা গৌরভক্ত এবং এই দ্বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন—তাঁহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়াই পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্ব পয়ার শ্লোকার্থ যে ইহা হইতে উচ্চাঙ্গের ও উচ্চ ভাবের, তাহা বলাই বাহুল্য। কবিরাজ গোস্বামীর

ভুবনপাবন লেখনী অমূল্য রত্নপ্রসবিনী এবং তাঁহার অক্ষর নিগূঢ় রসতত্ত্ব-বোধক। তিনি গৌরভক্তাভক্ত উভয় শ্রেণীর শোতৃবর্গের সম্মান করিলেন,—তিনি পূজ্যপাদ শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের মহাবাক্য—

"কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস"

এই উত্তম শ্লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। পণ্ডিত জগদানন্দের বাণী—

"সকলে গৌরাঙ্গদাস এ কথাটি মান"

তাহার পূর্ণ সার্থকতা করিলেন।

জীবাধম গ্রন্থকার বৃদ্ধ —তাহার বয়ঃক্রম ষাটবৎসর পূর্ণ হইয়াছে, —নানা রোগে তাহার দেহ ভঙ্গ হইয়াছে—৩৪ বৎসর কাল,—তাহার জীবনের উৎকৃষ্টাংশ,—অতি নীচ কার্য্যে রাজসেবায় অতিবাহিত হইয়াছে—ভারতের নানাস্থানে রাজকার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে বহিরঙ্গ লোকের সঙ্গে বাস করিতে হইয়াছে। ভজনযোগ্য মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া তাহার ভজন সাধন কিছুই হয় নাই—আর এক্ষেত্রে হইতেও পারে না। শ্রীনিত্যানন্দপরিকর ও তাঁহার মন্ত্রশিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের পরম পবিত্র বংশের কুলাঙ্গার জীবাধম গ্রন্থকার। সংসারের কীট—বিষয়বিষে জর্জ্জরিত ভজনসাধনহীন এই নর-পশুর কেশে ধরিয়া গৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যে এই শ্রীগ্রন্থ লিখাইয়াছেন,—তাহা পরম অযোগ্য এবং সর্ব্বভাবে এই গুরুতর কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত গ্রন্থকার মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিতের মুখবন্ধের প্রার্থনায় চৌদ্দবৎসর পূর্ব্বে জীবাধম গ্রন্থকার গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিল,—

আজ্ঞা বলবান তব না পারি ঠেলিতে।
লিখিব লিখাবে যাহা বসি মোর চিতে॥

একথা পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামীর ভাষায় পুনরুক্তি মাত্র,—

শ্রীমদন গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না যুয়ায় তবু রহিতে না পারি।
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ॥

একথা বলিবার নয়,—তবু না বলিলে নয়,—না বলিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কৃপাদেশে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম,—তাঁহারই কৃপাবলে এবং প্রেরণায় "যেন তেন প্রকারেন" এই শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারত সম্পূর্ণ হইল,—একথা স্বীকার না করিলে,—একথা প্রকাশ না করিলে কৃতঘ্নতা দোষ আসে,—তাই একথা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিলাম। সুধু আত্মশোধনের জন্য প্রিয়াজির কৃপাদেশে এই অগাধ-গৌরাঙ্গ-লীলা-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া লীলাসমুদ্র-সলিলকণা স্পর্শানুভবের নিত্যসুখ ও নিত্যানন্দলাভ জীবাধম গ্রন্থকারের দগ্ধভাগ্যে ঘটিল কিনা,—তাহাও কিছু বুঝিতে পারিলাম না,—আর বুঝিবার প্রয়োজনও দেখি না। প্রয়োজন প্রভু ও প্রিয়াজির চরণসেবা লাভ,—এই লাভে যেন বঞ্চিত না হই, জীবাধম গ্রন্থকারের শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল-সেবানন্দে যেন কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন না আসে,—তাহার চির-জীবনের ব্রত,—শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াসেবা প্রকাশ ও প্রচারকার্য্য স্বচ্ছন্দে যেন উদ্‌যাপন হয়,—ইহাই তাহার প্রাণের প্রার্থনা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগলভজননিষ্ঠ সাধুবৈষ্ণবগণের চরণে,—আর সর্ব্বগৌরভক্তগণের চরণকমলে ইহাই তাহার আন্তরিক নিবেদন। বল প্রেমানন্দে "জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ"!

শ্রীগৌরাঙ্গলীলাসিন্ধুর তীরে লীলালুব্ধচিত্তে বহুদিন দাঁড়াইয়াছিলাম বটে—কিন্তু সেই অনন্ত লীলাসিন্ধুর একবিন্দুও স্পর্শ করিতে পারিলাম না,—জীবাধম গ্রন্থকার যে সর্ব্বভাবে এই কার্য্যে অযোগ্য,—সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত,—তাহা তাহার অজানিত নাই,—তবে—

আত্ম শোধিবার তরে দুঃসাহস কৈনু।
লীলাসিন্ধুর একবিন্দু স্পর্শিতে নারিনু॥"

আত্মশোধন হইল কিনা তাহাও ত বুঝিলাম না—আর তাহা বুঝিবার প্রয়োজনই বা কি? প্রেমানন্দে সকলে বল—

জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি॥

গৌরহরি বোল! গৌরহরি বোল!! গৌরহরি বোল!!!

একষষ্টিতম অধ্যায়।

—:০:—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক।

—:০:—

প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥ চৈঃ চঃ

—:০:—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং যে শ্লোকাষ্টক রচনা করিয়া ভক্তিধর্ম্মের সার মর্ম্ম সংক্ষেপে বুঝাইয়াছিলেন,—তাহার নাম শিক্ষাষ্টক। এই শ্লোক কয়টি কোন্ সময়ে মহাপ্রভু রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ গ্রন্থে পাই না। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত এই সকল শ্লোক পাঠ, ব্যাখ্যা এবং তাহার রসাস্বাদন গম্ভীরামন্দিরে রাত্রিকালে তাঁহার দুইজন অতি মর্ম্মী ভক্তের সঙ্গে তিনি স্বয়ং করিতেন। এই দুই জনের নাম স্বরূপগোস্বামী ও রামানন্দ রায়। (১)। কোন দিন শ্লোক লইয়া রসাস্বাদন করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইয়া যাইত। মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত এই সকল অমূল্য রত্নগুলি স্বরূপদামোদরও রামরায়ের কণ্ঠে শোভা পাইত। পরে তাঁহারা কৃপা করিয়া এই শ্লোকরত্নগুলি ভক্তবৃন্দের চিত্ত-বিনোদার্থ এবং জগতের মঙ্গলের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের কৃপায় আমরা এই শ্লোকরত্নগুলি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছি। এই অপূর্ব্ব শ্লোক-মালায় ভক্তিদেবীর অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। এই শ্লোকা-ষ্টকে নিগূঢ় বৈষ্ণবভজনতত্ত্ব সকলি বর্ণিত হইয়াছে। জগন্মঙ্গল হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য এই শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মহাপ্রভুর এখন কৃষ্ণবিরহোন্মাদ দশা। তিনি কৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদ হইয়াছেন; ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তন হয়। কখন তিনি হর্ষভরে উৎফুল্ল,—কখন শোকে অধীর,—কখন দৈন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন,—কখন উদ্বেগভরে অস্থির হইতেছেন,—কখন আর্ত্তির চরম সীমা দেখাইতেছেন, কখন উৎকণ্ঠায় ছট্ ফট্ করিতেছেন,—কখন বা প্রেমানন্দে অধীর হইয়া পরানন্দস্বরূপ হইতেছেন। এই শেষোক্ত ভাবভরে একদিন রাত্রিতে পরানন্দময় মহাপ্রভু স্বরূপ ও রামরায়কে হর্ষভরে কহিলেন—

> হর্ষে প্রভু কহে "শুন স্বরূপ রামরায়।
> নাম সংকীর্ত্তনঃ কলৌ পরম উপায়॥
> সংকীর্ত্তনযজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
> সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥" (১) চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর মন প্রফুল্ল,—হৃদয় শান্ত,—প্রাণে আনন্দ ভরপূর। তিনি পুনরায় বলিলেন—

> নাম সংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
> সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥

এই বলিয়া তিনি স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটি পরম প্রেমভরে আবৃত্তি করিলেন ;—যথা—

> চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
> শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং॥
> আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
> সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥

ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণকে অনায়াসে মার্জ্জনা করেন, এবং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া থাকেন,—শ্রেয়ঃরূপ কুমুদে চন্দ্রিকা বিতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন বিদ্যারূপ বধূর জীবন,—আনন্দসমুদ্র বর্দ্ধনকারী,—ইহাতে পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন লাভ হয়,—ইহা সর্ব্বাত্মার তৃপ্তিকারী, অতএব এই পরমমঙ্গল নামসংকীর্ত্তনের জয় হউক।

মহাপ্রভু সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনের জয় ঘোষণা করিলেন। ইহা দ্বারা অভিধেয় তত্ত্বের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ

---

(১) নানা ভাবে উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্য উদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোক অর্থ আস্বাদয় দুই বন্ধু লইয়া॥ চৈঃ চঃ

(১) কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ। শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রেমলাভের একটি সুখসাধ্য সহজ ও সুলভ উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। সত্যযুগে ধ্যান-ধারণা—ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, জপ তপ, দ্বাপরযুগে সেবা পূজার্চ্চনাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ফললাভ হয়,—কলিযুগে কেবল শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সেই সকল ফললাভ হয়। সুতরাং নামসঙ্কীর্ত্তনই যে কলিহত জীবের ভবসংসার পারের একমাত্র উপায়, তাহা শাস্ত্রে দৃঢ়ভাবে লিখিত হইয়াছে। যথা পদ্মপুরাণে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

মহাপ্রভু দয়ার অবতার। তিনি কলিহত জীবের প্রতি করুণা করিয়া হরিনাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই শ্লোকে তিনি হরিনামসঙ্কীর্ত্তনের পরমোৎকর্ষতা বুঝাইলেন। তিনি স্বকৃত শ্লোকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা স্বয়ং করিতেছেন। কবিরাজগোস্বামী দুইটি শ্লোকে মহাপ্রভুর এই শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা এই,—

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥

এখন মহাপ্রভুর বিস্তারিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম গ্রহণ করুন তিনি প্রথমেই বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়"। চিত্তরূপদর্পণ কাম, ক্রোধ, মোহ মদ, মাৎসর্য্যাদি কলুষ দ্বারা কলুষিত এবং মলিন হইলে তাহাতে শ্রীভগবতপ্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় না। একমাত্র হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই চিত্তদর্পণের মলিনতা দূর হয়, এবং তখন সেই চিত্তে বিশুদ্ধ সত্বগুণের বিকাশ হয়,—তবে তাহাতে শ্রীভগবান্ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। অতএব চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায়,—হরিনামকীর্ত্তন। নামসঙ্কীর্ত্তন যুগধর্ম্ম। কলিপাবনাবতার পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কলিহত জীবের কলুষিত চিত্ত নির্ম্মল করিবার জন্য শাস্ত্রসম্মত এই জগন্মঙ্গল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে তাহার জয় ঘোষণা করিলেন।

দ্বিতীয় কথা মহাপ্রভু বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা জীবের ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়"। জীবের ভব-দাবানল কি? কর্ম্মবন্ধন,—সংসার-যাতনা,—বিষয়-বিষ,—ইহাই জীবের ভব-দাবানল। কর্ম্মযোগাদি অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মবন্ধন নাশ হইলেও, উহা দ্বারা আর একটি অভিনব কর্ম্মের অঙ্কুর উৎপাদন করে,—সুতরাং কর্ম্মযোগাদি দ্বারা জীবের ভব-দাবানল নির্ব্বাপিত হয় না, সংসার-যন্ত্রণার অবসান হয় না। বরং ইহা দ্বারা কর্ম্মবন্ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ দ্বারা জীবের নিখিল কর্ম্মপাশ ছিন্ন হয়, কর্ম্মবন্ধনজনিত সংসার-যন্ত্রণা,—যাহাকে ভব-দাবানল বলে,—তাহাতে আর তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না। নামসঙ্কীর্ত্তনের ফলে জীবের হৃদয়ে এক অভিনব আনন্দের প্রবাহ উদয় হয়, এই আনন্দপ্রবাহই ত্রিতাপদগ্ধ জীবের মনে চিরশান্তি দান করে। মনে শান্তিলাভ করিবার এমন সহজ ও সুলভ উপায় আর নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,—

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুদ্ধত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈস্তদুত্তমঃশ্লোক-গুণোপলম্ভকং ॥

অর্থাৎ পাপী জীব হরিনামসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যেরূপ সহজে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, এবং বিশুদ্ধ হয়,—ব্রহ্মবাদী মন্বাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক ব্যবস্থিত ব্রত নিয়মাচরণ ও কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠান দ্বারা সেরূপ শুদ্ধ হয় না। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জীবের পাপ নাশ হইয়া থাকে বটে,—কিন্তু শ্রীভগবানের অসীম গুণাবলী জীবের মনে তাহার দ্বারা প্রকাশ হয় না। হরিনামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীহরির অনন্ত গুণাবলী চিত্তে প্রকাশ হয়,—তাঁহার মহিমা হৃদয়ে অনুভূত হয়; সুতরাং এই হরিনামসঙ্কীর্ত্তনের শক্তি অসীম। ইহাতে জীবের ভবদাবানল চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হয়, এবং ইহা দ্বারা জীবকে শ্রীভগবানসান্নিধ্যে আনয়ন করে। শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ নামসঙ্কীর্ত্তন। নাম ও নামী অভেদ—শ্রীহরির নামের সঙ্গে শ্রীহরি বর্ত্তমান থাকেন—তাঁহার নাম কীর্ত্তন যেখানে হয়,—সেখানে শ্রীহরির আবির্ভাব হয়,—তাঁহার আবির্ভাবে

জীবের সকল দুঃখ দূর হয়। শ্রীকৃষ্ণভগবান স্বমুখে বলিয়াছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

হে নারদ। আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না,—যোগীগণের হৃদয়েও অধিষ্ঠান করি না,—আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নামসঙ্কীর্ত্তন করেন,—সেখানেই আমি থাকি।

অতএব যেখানে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান হয়,—যে হৃদয়ে শ্রীভগবানের জগন্মঙ্গল নাম প্রবেশ করে,—সেখানে কি ভবদাবাগ্নি থাকিতে পারে?

তৃতীয় কথা মহাপ্রভু বলিলেন "এই যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন, ইহা শ্রেয়রূপ কুমুদে চন্দ্রিকা বিতরণ করে"। এই কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। চন্দ্রোদয়ে যেমন জ্যোৎস্নাস্পর্শে কুমুদফুল প্রফুল্লিত হয়—সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে তাঁহার অতুলনীয় মহিমারূপ কিরণস্পর্শে শ্রেয় অর্থাৎ ভক্তিদেবী প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ভক্তিই জীবের পরম শ্রেয়ঃ,—ভক্তিই জীবের সকল মঙ্গলের নিদান (১)। জীবের হৃদয়ে ভক্তির উদয় না হইলে হৃদয় নির্ম্মল হয় না,—হৃদয় নির্ম্মল না হইলে তাহা শ্রীভগবানের আসনের উপযুক্ত হয় না। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে শ্রেয়ঃ বলিয়া গিয়াছেন,—দর্শন শাস্ত্রকারগণ মুক্তিই জীবের শ্রেয়ঃ বলিয়াছেন,—কিন্তু শ্রীভগবানের ভক্ত, ধর্ম্মার্থ কাম ও মোক্ষকে তৃণবৎ হেয়জ্ঞান করেন,—এমন কি সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভকেও অতি তুচ্ছ বস্তু মনে করেন। ইহা ভগবদ্বাক্য, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

মৎসেবয়া প্রীতিতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতং ॥

অতএব শ্রীভগবানের সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা যে ভক্তিলাভ হয় তাহাপেক্ষা প্রার্থনীয় বস্তু জীবের আর কিছুই নাই। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু জীবের পরম কল্যাণের জন্য উপদেশ দিলেন হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে জীবের হৃদয়-সরোবরে সর্ব্বমঙ্গল নিদান স্বরূপ যে ভক্তিকুসুম তাহাই বিকশিত হইয়া অপার আনন্দ দান করে।

মহাপ্রভুর চতুর্থ কথাটি বড়ই সুন্দর। তিনি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকে "বিদ্যাবধূজীবন" বলিলেন। অর্থাৎ ইহা বিদ্যারূপ বধূর জীবন। এখন এই বিদ্যার প্রকৃত অর্থ কি বুঝিতে হইবে। "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া", যাহার দ্বারা শ্রীভগবানের চরণে মতিগতি হয়, তাহার নামই বিদ্যা। অন্য কথায় ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের নামই বিদ্যা। ভগবৎ-শক্তির দুইটি বৃত্তি আছে, একের নাম বিদ্যা অপরের নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যার নাম মায়া এবং ইহাই জীবের সংসার বন্ধনের হেতু। এই অবিদ্যার দ্বারা জীবের অমঙ্গল সাধন হয়। আর বিদ্যা—যিনি শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপা, তাঁহার দ্বারা জীবের পরম মঙ্গল সংসাধিত হয়। এই যে বিদ্যাবধূ—ইহার জীবন ভগবৎনাম-সঙ্কীর্ত্তন। স্বামীবিরহবিধুরা বধূ যেমন তাঁহার স্বামীর দর্শনলাভে নবজীবন লাভ করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে বিদ্যাবধূও স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নবজীবন লাভ করেন। নাম ও নামী অভেদ এইজন্য নামের সঙ্গে সঙ্গে নামী আসিয়া হৃদিকন্দরে অধিষ্ঠান করেন। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে জীবের হৃদয় হইতে অবিদ্যার অন্তর্ধান হয় এবং তথায় বিদ্যার অভ্যুদয় হয়। অন্য কথায় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা জীবের মায়া বন্ধন ছিন্ন হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে ভগবল্লীলা হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্ত্তি হয়, এবং সেই লীলারসাস্বাদনে পরমানন্দ লাভ হয়। জীব তখন আনন্দস্বরূপ হয়।

প্রভুর পঞ্চম কথাটিতে জীবের এই আনন্দের উল্লেখ

(১) শ্রেয়স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থ। হে বিভো! সকল মঙ্গলের আশ্রয়স্বরূপা ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তণ্ডুল লাভার্থ স্থূল তুষাবঘাতীর ন্যায় তাঁহাদের ক্লেশ মাত্রই অবশেষ থাকে, তাঁহারা কোন সার পদার্থ প্রাপ্ত হন না।

করিয়াছেন। তিনি বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনকারী" সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান পূর্ণানন্দস্বরূপ, তিনি আনন্দময়। জীব আনন্দের অংশ, সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবানের দাস। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অগ্নির সহিত যে সম্বন্ধ, জীবের সহিত শ্রীভগবানের সেই সম্বন্ধ। ভগবান অগ্নি, জীব তাঁহার স্ফুলিঙ্গকণা; সুতরাং ভগবান আনন্দময়, আনন্দ স্বরূপ, জীব তাঁহার সেই আনন্দের অংশ। আনন্দ হইতেই জীবের উৎপত্তি, আনন্দে তাঁহারা জীবিত আছে, এবং তাহারা আনন্দেই বিলীন হইবে,—ইহা শাস্ত্রবাক্য। শ্রুতি বলিয়াছেন "আনন্দাৎ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন হি ইমানি ভূতানি জীবন্তি, আনন্দং হি প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি"। জীবের স্বরূপ আনন্দময়, জন্যই জীব সর্ব্বদা সুখ বা আনন্দের জন্য লালায়িত। দুঃখ জীবের স্বরূপ নহে, সেই জন্য জীব তাহা চায় না। অবিদ্যা অর্থাৎ মায়াজালে জড়িত হইয়া কর্ম্মবন্ধনে যখন জীব বদ্ধ হয়, তখন সে তাহার আনন্দময় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং অবিদ্যার প্রভাবে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়। হরিনামসঙ্কীর্ত্তন জীবের সেই দুঃখ দূর করেন এবং তাহাদের হৃদয়ে পূর্ণানন্দ দান করিয়া আনন্দময় আত্মস্বরূপ উদ্বোধিত করেন। এই জন্যই মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনকারী।

এই উত্তম শ্লোকোক্ত প্রভুর স্পষ্ট কথাটী আরও মধুর। তিনি বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন হয়।" হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা ও মাধুরিমা অপার ও অনন্ত। নাম-সঙ্কীর্ত্তন-সুধা পান করিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবৃত্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে থাকে। পিপাসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নামসুধা-পানেচ্ছাও ক্রমশঃ বলবতী হয়। ইহা যতই পান করা যায়, ততই পান করিতে ইচ্ছা হয় হরিনাম-গানের লালসার নিবৃত্তি নাই,—নামসুধা পানের পিপাসারও নিবৃত্তি নাই। অমৃতে অরুচি সম্ভব, কিন্তু জগৎমঙ্গল হরিনামামৃত পানে জীবের অরুচি হয় না। ভোজনকারী ব্যক্তির প্রতি গ্রাসে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, হরিভজনানন্দ ভক্তের প্রত্যেক বার নাম-কীর্ত্তনে প্রেমের অভিব্যক্তি, প্রেমাস্পদ শ্রীভগবতরূপের স্ফূর্ত্তি এবং সংসারে বিরক্তি এই তিন একই সময়ে সমুপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্যই পরম দয়াল মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা জীবের প্রতি পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন হয়।

মহাপ্রভুর শেষ কথাটির মর্ম্ম মনোযোগ দিয়া শুনুন। তিনি বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বাত্মার তৃপ্তিকারী" এস্থলে সর্ব্বাত্মার অর্থ দুই প্রকার। প্রথম, স্থাবরজঙ্গমাদি নিখিল জীবের আত্মা,—দ্বিতীয় দেহ, আত্মা, প্রাণমন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বাত্মা বলা যাইতেও পারে। মহাপ্রভু এই দুই অর্থেই সর্ব্বাত্মা শব্দ শ্লোকে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাদি নিখিল জীবগণের প্রাণ মন ও আত্মার তৃপ্তিলাভ হয়। স্থাবরজঙ্গমাদির শ্রীকৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা নাই বটে, কিন্তু তাহারা প্রতিধ্বনিচ্ছলে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। হরিদাসঠাকুরমহাপ্রভুকে একথা বলিয়াছিলেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

> শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসারের ক্ষয়।
> স্থাবরে শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয়॥
> প্রতিধ্বনি নহে সে করয়ে কীর্ত্তন।
> তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥

অতএব হরিনামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব জীবের, এবং স্থাবর জঙ্গমাদিরও মনপ্রাণ তৃপ্তকর। মনপ্রাণ তৃপ্ত হইলেই হৃদয়ে শান্তি বিরাজ করে। শান্তিতেই পরমানন্দ লাভ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গল শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকটি এই—

> নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
> স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
> এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
> দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ। ২॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান হইয়াও ভক্তাবতার। তিনি ভক্তভাব গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং আচরণ করিয়া ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যুগানুবর্ত্তী প্রকৃত ভজনতত্ত্ব সহজে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এই দৈন্যপূর্ণ শ্লোকে নিজ

ভজন-রহস্য প্রকাশ করিলেন। ইহা শ্রীভগবানের নিকট ভক্তিভাবে ভক্তাবতার মহাপ্রভুর আত্মনিবেদন। দীনতাই ভক্তের প্রধান লক্ষণ। অতিশয় দীনতা সহকারে তিনি বলিতেছেন—

'হে ভগবন! তুমি সর্ব্বশক্তিমান, তুমি কৃপা করিয়া প্রত্যেক লোকের নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে জগতে আপনার বহু নাম প্রচার করিয়াছ। তোমার অনন্ত নামের অনন্ত শক্তি। প্রত্যেক নামেই তুমি তোমার নিজের অনন্ত শক্তি নিহিত করিয়াছ। তুমি জীবের প্রতি দয়া করিয়া তোমার এই অনন্তশক্তিসম্পন্ন নাম স্মরণের সময় অসময় নির্দ্ধারণ কর নাই। জীব সকল অবস্থায় সকল সময়েই তোমার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া পবিত্র হইতে পারে। হে দয়াময়! তোমার এত কৃপা সত্ত্বেও আমার বড় দুর্ভাগ্য যে, তোমার এই ভুবনমঙ্গল নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।"

ইহা অপেক্ষা পরমোদার ও উচ্চভাবাপন্ন আত্মনিবেদন ভক্তি-জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মহাপ্রভু দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। প্রথমে তিনি বলিলেন শ্রীভগবান বহু নাম প্রচার করিয়াছেন। এই সকল নাম কি? হরি, কৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ, গোবিন্দ, গোপাল, মধুসূদন, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি তাঁহার অনন্ত নাম। তাঁহার শক্তির নামও অনন্ত যথা, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী সীতা, রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি; প্রত্যেক নামের সহিত নামীর অভিন্ন সম্বন্ধ। নাম ও নামী অভেদতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত— নামই তাঁহার আনন্দ রসময় মূর্ত্তি,—নাম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, মায়াগন্ধ শূন্য, নাম নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ (১)। শাস্ত্রে নামী অপেক্ষা নামের শক্তি গরীয়সী বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। সত্যভামার ব্রতোপলক্ষে তুলাদণ্ডে একদিকে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছিলেন,—অপর দিকে তুলসী পত্রে শ্রীকৃষ্ণ নাম লিখিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-নামের গুরুত্বই দৃষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য মহাপ্রভু বলিলেন,- শ্রীভগবান নিজ নামে তাঁহার সর্ব্ব শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর বলিলেন শ্রীহরির নাম স্মরণে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নাই, কালাকাল নাই। এমন কি শ্রীভগবানের নাম শুদ্ধভাবে বা অশুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত হইলেও, তাহা উচ্চারণকারীর পরিত্রাণকারী। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

নামৈকং যদাবাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের একটি মাত্র নাম যাঁহার বাক্যে প্রকাশ পান, কি স্মরণ পথে উদিত হন,—কিম্বা শ্রবণমূলে প্রবেশ করেন, অথবা শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণ হউন,—কি ব্যবহিতরহিত হউন,—উহা নিশ্চয়ই তাঁহাকে পরিত্রাণ করেন। সঙ্কেত, পরিহাস, অগৌরব বা হেলা করিয়াও শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলেও তাহাতে অশেষ পাপ হরণ হয়। ইহাও শাস্ত্র বাক্য—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

অনিচ্ছাপূর্ব্বক তুলা রাশিতে অগ্নি যোগ করিলে যেমন তুলারাশি ভস্মীভূত হয়,—সেই প্রকার শ্রীভগবানের পবিত্র নামও যে কোন ভাবে গ্রহণ করিলেই জীবের পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। নামের শক্তি সদাচার ও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না। শূকরদষ্ট হইয়া মৃত্যুকালে "হা রাম" বলিয়া কোন যবন মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; অজামীল মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রের নাম করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এ সকল পৌরাণিক কাহিণী,—ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এবং সদাচারনিষ্ঠ হইয়া যদি শ্রীহরির নাম গ্রহণ করা যায় তাহাতে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ফললাভ হইবে,—তাহা শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ হরিদাস ঠাকুর স্বয়ং আচরণ করিয়া নামমাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রীহরিনাম গ্রহণের ফল যে কেবল পাপ নাশ ও মোক্ষলাভ,—তাহা নহে। ইহা অপেক্ষাও

(১) নাম চিন্তামণি কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ হঃ বিঃ

উচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ ফল ইহাতে লাভ হয়। তাহা কি শুনুন—

"নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে"

শ্রীভগবানের চরণ কমলের রেণু পাইবার জন্য জীবের যে প্রীতি ও প্রেমলাভ, তাহা অপেক্ষা উত্তম ফল আর কি হইতে পারে? জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম ও প্রীতির অঙ্কুর জন্মিলেই তাহার ফলে সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভ হয়। অতএব পাপনাশ এবং মুক্তি মোক্ষলাভ নাম গ্রহণের আনুসঙ্গিক ফলমাত্র।—মুখ্যফল প্রেম লাভ।

মহাপ্রভু বলিলেন নামে অনন্তশক্তি নিহিত আছে। এই অনন্তশক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত পঞ্চদশ শক্তি (১) প্রধান, ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং ইহার প্রত্যেকের শাস্ত্র প্রমাণ আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সে সকল এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীগৌরভগবান কলিপাবনাবতার। দুর্ব্বল কলিহত জীবের জন্য তিনি ভক্তিমার্গের অতি সহজ ও সুলভ ভজনপন্থা আবিষ্কার করিয়া পরমমঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন এই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন হরিনামের স্মরণে ও কীর্ত্তনে স্থান কালাদির কোন নিয়ম নাই। কর্ম্ম-যোগাদি অনুষ্ঠানের যেমন দেশকালাদির শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার ও অপেক্ষা আছে, ভক্তিযোগে ভগবন্নামগ্রহণ বিষয়ে সেরূপ কোন বিচার নাই। ইহারও শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। যথা—

> ন দেশ নিয়মস্তস্মিন ন কাল নিয়মস্তথা।
> নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নিলুব্ধক॥

হে লুব্ধক! শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তন বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই,—এমন কি উচ্ছিষ্ট-মুখে নাম গ্রহণেরও নিষেধ নাই।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

> খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
> দেশকাল নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শ্রীভগবানের নামে একবার রুচি হইলে, আর তাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না। কিন্তু নামে রুচি হওয়া বহু ভাগ্যের কথা। গৌরভক্তসঙ্গ না হইলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নামে রুচি জন্মায় না। রুচি না হইলে হৃদয়ে অনুরাগ ও প্রেমের অঙ্কুর উদ্গম হয় না।

মহাপ্রভু নিজকৃত উক্ত শ্লোকদ্বয় স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়া স্বরূপগোসাঞি ও রামানন্দ রায়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

> যেরূপে লইলে নামে প্রেম উপজয়।
> তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়॥

এই বলিয়া তিনি তাঁহার শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। সেই শ্লোকরত্নটি এই—

> তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
> অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩॥

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই উত্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

> উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
> দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥
> বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
> শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
> যেই সে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
> ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ॥
> উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
> জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
> এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
> শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥

শ্রীহরির নাম-সাধকের পক্ষে কিরূপ বৈষ্ণবীয় দীনতার

---

(১) ভুবনপাবনী শক্তি,—সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী শক্তি—সর্ব্বদুঃখহারিণী শক্তি,—কলিকালভুজঙ্গভয়নাশিনী শক্তি,—নরকোদ্ধারিণী শক্তি,—প্রারব্ধবিনাশিনী শক্তি,—সর্ব্বাপরাধভঞ্জিনী শক্তি,—কর্ম্মসংপূর্ত্তিকারিণী শক্তি,—সর্ব্ববেদতীর্থাধিক ফলদায়িনী শক্তি,—সর্ব্বার্থদায়িনী শক্তি,—জগদানন্দদায়িনী শক্তি,—অগতির গতিদায়িনী শক্তি,—মুক্তিপ্রদায়িনী শক্তি,—বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপনী শক্তি ও শ্রীভগবৎপ্রীতিদায়িনী শক্তি।

প্রয়োজন, কিরূপ সহিষ্ণুতার আবশ্যক, তাঁহাকে কিরূপ অভিমানবর্জ্জিত হইয়া নাম লইতে হয়, তাহাই মহাপ্রভু উপমার দ্বারা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিলেন নামসাধককে তৃণ অপেক্ষাও নীচ হইতে হইবে। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য আছে। তৃণের এক প্রান্ত কেহ পদদলিত করিলে, অপর প্রান্ত উন্নত হইবার সম্ভব। নাম সাধকের পক্ষে সেই জন্য মহাপ্রভু বিধান করিলেন তৃণ অপেক্ষাও নীচ হইতে হইবে। ধন, মান, কুল, জাতি ও বিদ্যাভিমান প্রভৃতি সকল অভিমান বর্জ্জিত হইয়া অতিশয় দীনাতিদীনভাবে নাম গ্রহণ করিতে হইবে। দেবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সময় সাষ্টাঙ্গ ভূমাবলুণ্ঠিত করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হইবে। নামসঙ্কীর্ত্তন স্থলে সাষ্টাঙ্গ ভক্ত-পদরজে লুটাইয়া দিয়া নামকীর্ত্তন করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন শ্রীভগবানের চরণে দৃঢ় ভক্তি লাভের আর কোন সহজ উপায় নাই। ভক্তবর উদ্ধব—যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম সুহৃদ এবং ভক্ত,—তিনি বলিয়াছিলেন "আমার একান্ত প্রার্থনা, আমি যেন শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজগোপিকাবৃন্দের চরণরেণুসেবী কোন গুল্মলতাদি বা তৃণ হইয়া যেন ব্রজে জন্মগ্রহণ করি। তাহা হইলে তাঁহাদিগের পবিত্র চরণধূলির দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইবে, তাহা হইলে আমার সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইবে" (১)। জীবের একমাত্র অভিমান থাকিবে যে আমি শ্রীভগবানের দাস,—আমি তাঁহার সৃষ্ট জীবের দাস, কারণ সৃষ্ট জীবের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে। এই কৃষ্ণদাস্যাভিমানই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়। জীবের স্বরূপ "নিত্যকৃষ্ণদাস"। জীব স্বস্বরূপ ভুলিয়া যখন আপনাকে কর্ত্তা বা প্রভু মনে করে,—তখনই তাহার পতন হয়। জাতি, কুল, বিদ্যাগৌরব, ধনজনের অভিমান অতি তুচ্ছ পদার্থ,—কারণ ইহার নাশ অবশ্যম্ভাবী, ভগবদ্দাসাভিমানের নাশ নাই,—ও ভগবদ্দাসের পতন নাই। তুমি প্রভু, আমি দাস, শ্রীভগবানের সহিত এই নিত্য সম্বন্ধই 'জীবের' পরম মঙ্গলকর, এবং ভগবানপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। কৃষ্ণদাস্যভাবের আনন্দ অতুলনীয় ও অপরিসীম,—ভগদ্দাসাভিমানী ভগবদ্ভক্তের ভাগ্য শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত।

এই উত্তম শ্লোকোক্ত দ্বিতীয় কথাটির অর্থ—পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিলেন ভগবদ্দাসের পক্ষে তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা গুণের প্রয়োজন। তরুর সহিষ্ণুতা কিরূপ, তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। তরু নিজ মস্তকে প্রখর আতপতাপ শিলাবৃষ্টি, ঝটিকা প্রভৃতির উপদ্রব সহ্য করিয়া আশ্রিত জনকে তাহার তলে আশ্রয়দান করিয়া থাকে,—সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত নিজ মস্তকে সমূহ বিপদ ও দুর্দ্দৈব বহন করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য সতত চেষ্টা করিবেন, সর্ব্ববিষয়ে তিনি সর্ব্বজীবের মঙ্গল কামনা করিবেন, সর্ব্বপ্রকারে তিনি জীবের পরমোপকার, সাহায্য ও সেবা করিবেন। ইহাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। তিনি যেমন শ্রীভগবানের দাস,—তেমনি তিনি শ্রীভগবানের সৃষ্ট জীবেরও দাস। ইহা প্রত্যেক ভক্তের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

বৃক্ষের অপর গুণ উহাকে ছেদন করিলেও কাহাকে কিছু বলে না, এবং ছেদনকারী ব্যক্তিকে ছায়া ও ফল দানে বঞ্চিত করে না। হরিনাম সাধকের পক্ষেও এই নিয়ম। বৃক্ষকে আঘাত করিলে সে যেমন তাহার অঙ্গে আঘাতকারী ব্যক্তিকে কিছু বলে না,—কোনরূপ অনুযোগ করে না,—সেইরূপ ভগবদ্ভক্তের অঙ্গে কেহ প্রহার করিলে, বা মনে কোনরূপ বেদনা দিলে, তিনি তাঁহার প্রহারকারী বা মনবেদনাদাতা দুর্জ্জনকে কোনরূপ দণ্ড বা অভিশাপ প্রদান করিবেন না। কেবলমাত্র শ্রীভগবানের চরণে সেই দুর্জ্জন ব্যক্তির দুষ্কৃতির জন্য তাহার হইয়া নিজে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, এবং যাহাতে তাহার এরূপ দুর্ম্মতি আর না হয়,—তাহার জন্য শ্রীভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিবেন। নাম-মাহাত্ম্য প্রচারক হরিদাস ঠাকুরকে যখন যবনরাজের আজ্ঞায় দুষ্টগণ বিনা অপরাধে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছিল, তখন তিনি

---

(১) আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

কাতরকণ্ঠে সেই সকল দুর্জ্জনের দুষ্কৃতি নাশের জন্য শ্রীভগবচ্চরণে করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

"এসব জীবের প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহ এ সবার অপরাধ"॥

ইহাই ভক্তভাব,—ইহা অপেক্ষা উচ্চভাবের ধর্ম্ম জগতে আর নাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মস্তকে যখন মাধাই কলসীর কানা ফেলিয়া মারিয়াছিল, এবং যখন সেই আঘাতে তাঁহার শ্রীবদনমণ্ডল রক্তাক্ত হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন—

মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস্ মেরেছিস্ তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥

দুর্জ্জন ও পাষণ্ড কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলেও, নাম-সাধক ভক্ত নির্য্যাতন সহ্য করিবেন, এবং তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া আঘাতকারীকে শ্রীনামরূপ ফল দান করিবেন। পরমদয়াল শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যাহা করিলেন,—তাহাই প্রত্যেক ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নামসাধকের প্রতি আর একটি বড় উত্তম উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন স্বয়ং অমানী হইয়া অপরকে সম্মান প্রদান করিবে। ইহার অর্থ—ভগবদ্ভক্ত আপনাকে অধম জ্ঞান করিবেন,—আমি ভক্তিমান,—আমি ভক্ত,—আমি বড়, একথা ভগবদ্ভক্তের মুখে কখনও শোভা পায় না। ভক্তাভিমানও অভিমানের মধ্যে গণ্য। ভগবদ্ভক্তকে এইরূপে সর্ব্বভাবে অভিমান বর্জ্জিত হইতে হইবে। আমি জীবাধম,—আমি কিছুই নহি, বৃথায় আমি দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়াছিলাম,—এইরূপ দৈন্য ও আর্ত্তিপূর্ণ ভাব লইয়া একান্তভাবে নিরভিমান হইয়া সর্ব্বজীবের হৃদয়ে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান জানিয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিতে হইবে।

উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥ চৈঃ চঃ

ইহাই হইল প্রকৃত নাম সাধক বৈষ্ণবের লক্ষণ, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের ভাব।

এইরূপ দীনাতিদীন হইয়া যিনি শ্রীভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার শ্রীভগবচ্চরণে প্রেম উপজাত হয়। প্রেমের ফলে শুদ্ধা ভক্তিলাভ হয়।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে করিতে মহাপ্রভুর মন দৈন্যভাবে বিভাবিত হইল। তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ভক্তিতত্ত্বের এই অপূর্ব্ব ও মধুর ভাবটি যেরূপ ভাবে তাঁহার ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, একরূপ ভাবে পূর্ব্বে কেহ কখন জীবকে ইহা শিক্ষা দেন নাই। এই উচ্চভাবটি এতাবৎ-কাল শাস্ত্রমেরুর শ্লোকগহ্বরের মধ্যেই নিহিত ছিল। বৈষ্ণবীয় দৈন্যভাব হৃদয়ে আসিলেই শ্রীভগবানের নিকট শুদ্ধা ভক্তিলাভের প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কাম্য প্রার্থনা মনে স্থান পাইতে পারে না। তাই মহাপ্রভু তাঁহার স্বকৃত শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে ভক্তভাবে শ্রীভগবানের নিকট অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন যথা—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪।

অর্থাৎ মহাপ্রভু বলিতেছেন "হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী বা কবিতা কিছুই চাহি না, তোমার চরণকমলে, আমার জন্ম জন্ম যেন অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি থাকে।—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা"।

শ্রীভগবানের নিকট ভগবদ্দাস বা ভক্ত কিরূপ ভাবে আত্মনিবেদন করিবেন—কি প্রার্থনা করিবেন,—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া তাহার অতি সুন্দর নমুনা দেখাইলেন।" "ধনং দেহি পুত্রং দেহি, ভার্য্যাং দেহি, যশোদেহি, প্রভৃতি দেহি দেহি শব্দে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা সকাম ধর্ম্ম। শ্রীভগবান পরম দয়াল, জীবের সকল কামনাই তিনি পূর্ণ করেন,—যে যাহা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে—তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন, সকাম ধর্ম্ম জীবের সংসারবন্ধনের কারণ,—আর নিষ্কামধর্ম্ম বন্ধনমুক্তির উপায়।

নিষ্কামভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলে অহৈতুকী ভক্তিপ্রার্থী, এবং সকামভক্ত ঐশ্বর্য্যসুখসম্পদপ্রার্থী। নিষ্কাম ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যথা—

নাথ, যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।

তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তি রচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥ বিষ্ণুপুরাণ

"হে নাথ! হে জগদীশ! আমি যে যে যোনিসহস্রে জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই যোনিতেই তোমার চরণে আমার যেন সর্ব্বদা অচলা ভক্তি থাকে। মহর্ষি নারদও শ্রীভগবানের নিকটে এই প্রার্থনাই করিয়াছিলেন। যথা—

জনির্ভবতু মে ব্রহ্মণ! যাসু যাসু যোনিষু চ।

ন জহাতু হরেভক্তি ম ামেবং দেহি মে বরম্॥ ব্রঃ বৈঃ পুরাণ

হে ভগবান! আমাকে আপনি এই বর দান করুন,—যে আমার যে যে যোনিতেই জন্ম হউক না কেন, যেন আমার হরিভক্তি নষ্ট না হয়।

মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্তাবতার। তাই তিনি ভক্তভাবে শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের উপযুক্ত প্রার্থনাই করিলেন। ইহাতে তিনি ভক্তির চরমোৎকর্ষতা দেখাইলেন এবং ভক্তের সর্ব্বসম্পদতুচ্ছকারী উত্তমা মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন।

তিনি প্রথমেই বলিলেন "আমি ধন ও জন চাই না" অর্থ যে সকল অনর্থের মূল, তাহা মহাজনগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ধনমদে মত্ত জীবের হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার হইতে পারে না। এইজন্য মহাজনগণ ধনকে ভগবত-সাধনার অন্তরায় বলিয়া গিয়াছেন। জন অর্থে স্বজন, অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি। ইহারা যদি পরমার্থের লাভ, অর্থাৎ ভগবচ্চরণে ভক্তিলাভের অনুকূল হন, তাহা হইলে ইহাদিগের সঙ্গ তত দোষাবহ নহে,—কিন্তু যদি ইহাঁরা ভক্তিলাভের প্রতিকূল হন,—ভক্তিশাস্ত্রানুসারে তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বথা ত্যজ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাদিগকে "স্বজনাখ্য দস্যু" বলিয়া গিয়াছেন। অপর কথা স্বজনসঙ্গে জীবকে মায়া মমতাপাশে বদ্ধ করে। মায়ার বন্ধন দুশ্ছেদ্য। পুত্র কন্যা কলত্রাদির মোহিনী মায়ার প্রভাবে জীব ভগবদ্বিমুখ হয় এবং মধুর ভগবতকথা এবং শ্রীভগবানের ভুবনপাবনী লীলাকথা তাহাদের চিত্তে স্থান পায় না। স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সর্ব্বদা প্রেমালাপে তাহাদের চিত্তে প্রাকৃত রসের সৃষ্টি হয়, ভগবতকথামৃতরূপ অপ্রাকৃত রসের সন্ধান লইতে তাহারা একেবারে অবসর পায় না। এইজন্য মহাপ্রভু বলিলেন "আমি স্বজনও চাই না"। তাহার পরে তিনি বলিলেন "আমি সুন্দরী স্ত্রীও চাই না, কবি পদবীও কামনা করি না"।

"কামিনী কাঞ্চন" যে জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায়, তাহা শাস্ত্রকারগণ এবং মহাজনগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। নারীরূপা শ্রীভগবানের মায়া সর্ব্বজনের মোহকারিণী,—এমন কি মুনিঋষিগণও ইহাদিগের প্রভাবের বহির্ভূত নহেন। ইহা ভগবদ্বাক্য যথা—

যোষিদ্রূপা চ মে মায়া সর্ব্বেষাং মোহকারিণী।

লীলয়া কুরুতে মোহং স্বাত্মারামস্ত সম্ভতং॥

সংসারবন্ধনের হেতুই নারী। এইজন্যই শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বলিলেন "আমি সুন্দরী স্ত্রী কামনা করি না।"

সর্ব্বশেষে তিনি বলিলেন আমি "কবি পদবী লাভ করিতে চাহি না। আমি বিদ্বান্, আমি কবি, আমি পণ্ডিত এইরূপ প্রতিষ্ঠাব্যঞ্জক পদবীতে মনে অভিমানের উদয় হয়। অভিমান বা গর্ব্বপর্ব্বত, হৃদয়ে উদিত হইলে, সে হৃদয় শ্রীভগবানের আসনের উপযুক্ত হয় না অতএব এরূপ বিদ্যা, পদবী ভক্তের ভক্তিসাধনের পক্ষে বিষম অন্তরায়। তাই ভক্তাবতার মহাপ্রভু বলিলেন "আমাকে সেই বিদ্যা দান কর,—যাহাতে তোমার চরণে আমার রতিমতি হয়"। এই শ্লোকে মহাপ্রভু সংসারের ভোগ, ঐশ্বর্য্য লাভ, মান প্রতিষ্ঠা, সকলি তুচ্ছ করিলেন,—এবং জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের নিকট এই সকল তুচ্ছ ও নশ্বর বিষয় প্রার্থনা করার অসারতা বুঝাইলেন। তিনি এই সঙ্গে নিষ্কাম ধর্ম্মের পরমোৎকর্ষতাও বুঝাইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে বৈষ্ণবধর্ম্মের সারতত্ত্ব সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে কলিহত জীবের সাধনপথের

ক্রম নির্ণীত হইয়াছে। কিভাবে তাহারা সাধনপথে অগ্রসর হইবে, তাহা অতি সুন্দরভাবে এই ভুবনমঙ্গল অষ্টশ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। যুগধর্ম্ম যে হরিসঙ্কীর্ত্তন,—এবং এই নাম সঙ্কীর্ত্তনই যে কলিহত জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন,—তাহা পরম দয়াল মহাপ্রভু প্রথম শ্লোকে উপদেশ করিলেন। এই সঙ্গে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের উৎকর্ষতাও বুঝাইলেন। দ্বিতীয় শ্লোকে তিনি নাম ও নামী যে একবস্তু, তাহা বুঝাইয়া নাম-সাধন যে সহজসাধ্য, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে উপদেশ দিলেন। তৃতীয় শ্লোকে তিনি নামসাধনের প্রকৃত অধিকারী কে, তাহার পরিচয় দিলেন। চতুর্থ শ্লোকে সংসারের যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর অনিত্যতা ও অসারতা বুঝাইয়া দিয়া সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদ শ্রীভগবচ্চরণে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। দাস্যভাবে ভগবদুপাসনা যে কত মধুর এবং ভগবদ্দাসাভিমান যে কত উচ্চ বস্তু,—তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি ভক্তভাবে পঞ্চম শ্লোকে এক্ষণে শ্রীভগবানের চরণে দাস্যভাব প্রার্থনা করিতেছেন। সেই শ্লোকটি এই—

> অয়ি নন্দ-তনুজ কিঙ্করং
> পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
> কৃপয়া তব পাদ-পঙ্কজ-
> স্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫॥

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

> তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
> পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া॥
> কৃপা করি কর তুমি পদধূলি সম।
> তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

অর্থাৎ "হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমার নিত্যদাস। আমি এই কথা ভুলিয়া গিয়া মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া ভবার্ণবে পতিত হইয়াছি। হে কৃপাময়! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ পদে পদাশ্রিত রেণু তুল্য করিয়া রাখ।" এই প্রার্থনাতে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। দাস্যভাব ব্রজের ভাব, তাই মহাপ্রভু নন্দতনুজ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন। এই ভীষণ ভব সমুদ্র পারের একমাত্র তরণী শ্রীভগবানের চরণ-তরি আশ্রয় করিয়া সাধুমহাজনগণ এই ভীষণ সংসারসমুদ্রকে গোষ্পদের ন্যায় মনে করেন। শ্রীভগবানের সেই চরণ-তরির ভরসা করিয়া জীব সংসার-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করে। শ্রীভগবান তাঁহার চরণ-তরিতে অমনি তাহাকে স্থান দান করেন। মহাপ্রভু বলিলেন "হে কৃষ্ণ। তুমি আমাকে তোমার পাদপদ্মের ধূলিকণা করিয়া রাখ" ইহার ভাবার্থ ধূলিকে পদদ্বারা পেষণ করিলে, যেমন সেই পদেই লগ্ন থাকে, অথবা ধূলিকণাকে পদতল হইতে ঝাড়িয়া ফেলিলেও যেমন উড়িয়া পুনরায় সেই পদেই সংলগ্ন হয়, জীব এই সংসার-দাবানলে দগ্ধ হইয়া এবং সংসার-সাগরে ডুবিয়া মহাকষ্ট পাইলেও শ্রীভগবানের কৃপাভিখারী হইয়া তাঁহার পাদপদ্মই কেবল আশ্রয় করে; যতই জীব সংসার-আহবে নিষ্পেষিত হয়, ততই তাহার শ্রীভগবানের অভয় চরণ মনে পড়ে,—যতই দুঃখ পায়, ততই তাহারা ভগবচ্চরণে আকৃষ্ট হয়।

মহাপ্রভু এই যে দাস্যভক্তির কথা বলিলেন, ইহাতেই জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধিলাভ হয়,—মোহান্ধ জীবের ভগবচ্চরণে ভক্তিলাভের এই দাস্যভাবই সর্ব্বোত্তম। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, শ্রীভগবানের দাসত্বই তাহার স্বধর্ম্ম। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিলেন—

> "তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন"।

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর বলিলেন,—

> "চৈতন্যদাসত্ব বই বড় নাহি আর"।

জীবের স্বরূপ আনন্দাংশ,—জীবের স্বধর্ম্ম ভগবতসেবা। স্বরূপ এবং স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া জীব নিরানন্দ এবং বহির্ম্মুখ। জীবের নিরানন্দজনিত হাহাকার দূরীকরণের জন্য এবং তাহার ভগবতসেবা বিমুখতাজনিত অধোগতি নিবারণের জন্য মহাপ্রভু এই মহামূল্য উপদেশ দান করিলেন।

রামানন্দরায় এবং স্বরূপদামোদর গোস্বামীকে মহাপ্রভু শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনাইতেছেন। স্বয়ংভগবান মহাপ্রভু বক্তা, তাঁহারা শ্রোতা। পঞ্চম শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে করিতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইল—হৃদয়ে মহা দৈন্য-ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইল। প্রেমের সহিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন

করিলে কি ভাব হয় তাহার পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার স্বরচিত ষষ্ঠ শ্লোকটি প্রেমগদগদস্বরে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নয়নযুগলে প্রেমনদী প্রবাহিত হইল, কণ্ঠস্বর গদগদ এবং সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলীর উদ্গম হইল। সেই শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

অর্থ। হে প্রেমময় কৃষ্ণ। হে দয়ানিধে! তোমার প্রেমমাখা মধুর নাম গ্রহণ করিতে,—তোমাকে নাম করিয়া ডাকিতে, কবে আমার এই পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নে অশ্রুধারা বহিবে, —মধুর নামানন্দে মুখে বাক্যস্ফুরণ হইবে না,—ভাষা গদগদ হইবে,—পুলকে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইবে,—এখন সৌভাগ্যের দিন আমার কবে আসিবে?”

ঠাকুর নরোত্তম এইভাবে লিখিয়াছেন—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর ॥

শ্রীভগবানের নাম লইবামাত্র জীবের এইরূপ অবস্থা হয়। ইহা স্বয়ংভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

মদ্গুণ শ্রুতিমাত্রেণ সানন্দ পুলকান্বিতঃ।
সগদগদঃ সাশ্রুনেত্রঃ স্বাত্মবিস্মৃত এব চ ॥ দেঃ ভাঃ

অর্থাৎ আমার ভক্তগণ আমার নাম, রূপ ও গুণ শ্রবণ মাত্র, আনন্দে পরিপূর্ণ, পুলকাঞ্চিত, গদগদভাষী, সাশ্রুনেত্র ও আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকেন। অপরাধশূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিলে এইরূপ অবস্থা হয়। নামাপরাধ নামের দ্বারাই ক্ষয় হয়। নামাপরাধ বহু,—তাহা বৈষ্ণবমাত্রেই জানেন। যে পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের নামে নয়নে প্রেমাশ্রুধারা না ঝরিবে,—অঙ্গে পুলকাবলীর উদ্গম না হইবে,—সে পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে নানাবিধ অপরাধ সঞ্চিত রহিয়াছে। অপরাধ ক্ষয় হইলে শ্রীনামের পরমাশ্চর্য্যা গরীয়সী শক্তিবলে সাত্ত্বিক ভাব সকলের উদ্গম হয়, এবং এই সকল ভাবই প্রেমের প্রথমাবস্থা। শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমোদয় নামের মুখ্য ফল, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহাপ্রভু তাই অতি দীনভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ চৈঃ চঃ

এই প্রেমধন অর্জ্জনের উপায় নামগান,—শ্রীভগবানের নামগানে জীবের হৃদয়ে, মনে ও শরীরে নানারূপ ভাবোদ্গম হয়,—এই সকল ভাবই প্রেমের সাধারণ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। ইহা যে বিশেষ লক্ষণ নহে, তাহা পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ তাঁহার উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে বিচার করিয়াছেন।

শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুরভাবে বিভাবিত হইয়া গুর্ব্বিসহ কৃষ্ণবিরহ-ব্যাথা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণভজনের নানা পন্থা আছে, তন্মধ্যে মধুরভাবে ভজন-পন্থাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই ব্রজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনরহস্যের এস্থলে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছেন। রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু সখি বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করিতেছেন—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে ॥৭॥

অর্থ “হে সখি বিশাখে! কৃষ্ণবিরহে আমার নিমেষ কাল শতযুগ বলিয়া বোধ হইতেছে, আমার নয়নযুগল হইতে বরিষার ধারার ন্যায় দিবানিশি অশ্রু পতন হইতেছে,—সর্ব্ব জগত শূন্যবোধ হইতেছে। আমার চিত্তচোর প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে একবার দেখাইয়া প্রাণ রাখ।”

ভগবদ্ভক্তের কোন দুঃখই নাই—তাঁহার একমাত্র দুঃখ ভগবদ্বিরহ। এই ভগবদ্বিরহ যে কি বস্তু এবং কিরূপ তীব্র, তাহাই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইতেছেন। সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ গমনকালে বলিয়াছিলেন—

শিরে বজ্র পড়ি যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ চৈঃ চঃ

কবিরাজগোস্বামী শিক্ষাষ্টকের এ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ যুগ সম।
বর্ষামেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন ॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥

ভগবদ্বিরহে ভক্তের মনে এইরূপ ভাব উদয় হয়। ইহা শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ। ভগবদ্বিরহদুঃখই শ্রীভগবানপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভক্তাবতার মহাপ্রভু তাহাই বুঝাইলেন।

শিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজভাবের ভজনতত্ত্বের শেষ চরম শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাই ব্রজভাবের অবধি, এবং পরম ও চরমতত্ত্ব। এই উপদেশের মর্ম্ম বুঝিবার অধিকারী অতি বিরল। মহাপ্রভু যখন পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত-ভাবে বিভাবিত, এবং কৃষ্ণবিরহজ্বালায় তুষানলে জ্বলিতে-ছেন, তখন সখিগণ মিলিয়া সকলে পরামর্শ করিলেন—কৃষ্ণ যখন শ্রীমতির প্রতি উদাসীন, তখন শ্রীমতিরও কৃষ্ণের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত এবং তাঁকে উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহারা কহিলেন "সখি! কৃষ্ণ তোমাকে পরীক্ষা করিতে যেমন তোমার প্রতি তিনি উদাসীন হইয়াছেন, তুমিও তাহাই কর"

কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখি সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥ চৈঃ চঃ

এই কথা শুনিয়া শ্রীমতি নীরব হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল,—তাহাতে নানাভাবের তরঙ্গ উঠিল (১) এবং সেই সকল তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তখন শ্রীমতি সখিদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেইরূপ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া নিজকৃত শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। যথা—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮

অর্থ। "হে সখি। আমি কৃষ্ণের দাসী,—তিনি আমাকে আলিঙ্গনদানে আত্মসাৎই করুন,—পদদলিতই করুন,—মহা দুঃখার্ণবেই নিপতিত করুন,—অদর্শনে মর্ম্মাহতই করুন—আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য রমণীতে আসক্তই হউন,—তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন"।

পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন, এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ পরম নিগূঢ় রসপূর্ণ এবং ইহার ব্যাখ্যা মানুষের দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না। তিনি সেইজন্য সংক্ষেপ সূত্ররূপে এই উত্তম শ্লোকের ব্যাখ্যার কিছু আভাস দিয়াছেন। এই শ্লোকরত্নের তাঁহার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তিঁহো রসসুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন, জারেন আমার তনুমন
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কি বা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়। ধ্রু ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া।
কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করে সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হয় মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য।
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁর রূপে সতৃষ্ণ,
তাঁরে না পাঞা কাহে হয় দুখী।

(১) হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এতভাব এক ঠাঁই করিল উদয় ॥ চৈঃ চঃ

মুঞি তার পায় পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা তারে করোঁ সুখী ॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অলপ সাধনে ॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণমর্ম্ম নাহি জানে
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥
যে গোপী করে মোর দ্বেষ, কৃষ্ণের করে সন্তোষ,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃতপতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা ॥ (১)
কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ আমার প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী অভিমান ॥
কান্তসেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে দাসী অভিমানী ॥

এই যে বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেম,—ইহাতে আত্মসুখের সম্বন্ধই নাই ; শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে সুখ,—তাহাতেই ব্রজগোপীদিগের আনন্দ। তাঁহারা আত্মসুখ বাঞ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন নাই। এই বিশুদ্ধ ব্রজের প্রেমভাব ভক্তগণকে জানাইবার জন্যই মহাপ্রভু এই শ্লোকটি রচনা করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদ্বয়ের নিকট ইহার ব্যাখ্যা করিলেন। এই পুণ্যশ্লোকে ব্রজভাবের ভজনের অবধি দেখান হইয়াছে এবং কৃষ্ণভজনের চরমতত্ত্ব শিক্ষাদান করা হইয়াছে। ইহাই সাধনরাজ্যে সাধ্যাবধি। এই পরম শ্রেষ্ঠ ভজনতত্ত্বরহস্য অধিকারী বুঝিয়া একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এই যে শ্রীমতির আত্মনিবেদন, ও আত্মসুখত্যাগের বাঞ্ছা, যাহা মহাপ্রভু বুঝাইলেন—ইহার তুলনা নাই। শ্রীমতির প্রেম কামগন্ধহীন এবং আত্মসুখ-তাৎপর্য্যশূন্য। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্ম সুখের যাঁহা নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥

এই শ্লোকের ভাবার্থ ও মর্ম্ম বিশ্লেষণ করিবার সামর্থ একমাত্র অধিকারী রসিক ভক্তজনই ধারণ করেন। জীবাধম গ্রন্থকার সম্পূর্ণ অনধিকারী, সুতরাং ইহার মর্ম্ম বুঝাইবার প্রয়াস তাহার পক্ষে দুঃসাহস মাত্র। ইহা হইতে নিবৃত্তি হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

এই শিক্ষাষ্টকে মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মের সকল তত্ত্বই শিক্ষা দিলেন,—মধুর ভজনের চরমতত্ত্বও বলিয়া দিলেন। শিক্ষাষ্টকের এক একটী শ্লোকে, এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে। মহাপ্রভুর চিহ্নিত দাসগণ দ্বারা সে বৃহৎ কার্য্যও সংসাধিত হইবে। যাহা কিছু এস্থলে বর্ণিত হইল, ইহা সূত্রমাত্র জানিবেন কবিরাজগোস্বামী শিক্ষাষ্টকের ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন—

প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥

(১) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

দ্বিষষ্টীতম অধ্যায়

মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলা।

—:০:—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥ চৈতন্য মঙ্গল।

—:০:—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতে বা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত হয় নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কিম্বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই দুঃখরস-পূর্ণ লীলা বর্ণনা করেন নাই। মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের পক্ষে তাঁহার সঙ্গোপনলীলা অত্যন্ত হৃদিবিদারক, সুতরাং এই প্রাণঘাতী দুঃখরসলীলাকাহিনী সকল মহাজনে লিখিতে পারেন নাই। ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলা অতি সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সঙ্গোপন-লীলা দুঃখরস হইলেও এক্ষণে শিক্ষিত সমাজে তাহা জানিতে অনেকের প্রবলবাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ তাঁহার সম্বন্ধে যাবতীয় লীলা কাহিনী শিক্ষিত সম্প্রদায় জানিতে উৎসুক,—আলোচনা ও আস্বাদন করিতে প্রস্তুত। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ংভগবান। তাঁহার লীলাকথার যতই আলোচনা হইবে, যতই বিচার বিশ্লেষণ হইবে,—ততই জীবের পরম মঙ্গল হইবে। তাঁহার সঙ্গোপন লীলা-কথা সম্বন্ধে দুইটি ভিন্ন মতবাদ আছে, তাহা পরে বলিব। এক্ষণে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলবর্ণিত এই লীলাকথার অবতারণা করিব। ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বশেষে মহাপ্রভুর এই শেষ লীলাটি বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহার পর আত্মপরিচয় দিয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বা শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর অপ্রকটের কথা লিপিবদ্ধ না হওয়ার কারণ বোধ হয় এই নিদারুণ শোকসংবাদ গ্রন্থে লিখিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই—না হইবারই কথা। কিন্তু আধুনিক ভক্তবৃন্দের প্রবৃত্তি অন্য প্রকার, তাঁহারা মহাপ্রভুর সকল বিষয় ও লীলারঙ্গ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে চাহেন—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কারণ শ্রীপ্রভু আমার স্বয়ংভগবান-পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, যতই তাঁহার লীলাকথার আলোচনা হইবে ততই জীবের মঙ্গল হইবে—ততই সত্য বস্তুর দিব্যজ্যোতি প্রকাশ হইবে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থখানি নানা ভাবে নানা স্থানে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার শেষ সংস্করণ মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন ৪১৭ গৌরাব্দে মাত্র। গোলোকগত প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামীর সংগৃহীত একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থের হস্তলিপি দেখিয়া তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মহাপ্রভুর অপ্রকট সম্বন্ধে এই মুদ্রিত গ্রন্থে কিছু নূতন কথা আছে,—অন্য গ্রন্থে তাহা নাই। এই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থানুসারেই মহাপ্রভুর এই সঙ্গোপন-লীলা বর্ণিত হইল।

মহাপ্রভুর বয়ঃক্রম এখন আটচল্লিশ বৎসর মাত্র। শচীমাতা বহুদিন অদর্শন হইয়াছেন। আষাঢ় মাস, সপ্তমী তিথি রবিবার, শক ১৪৫৫,—সময় তৃতীয় প্রহর মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের গৃহে নিজ বাসায় বসিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীবৃন্দাবনের কথা কহিতেছেন। তাঁহার অন্তরে দারুণ কৃষ্ণবিরহ-ব্যথা (১)। তাঁহার বদন বিষণ্ণ। তিনি বৃন্দাবন-কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ নীরব হইলেন। পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া জগন্নাথ দর্শনের জন্য প্রস্তুত হই-লেন,—উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সঙ্গে চলিলেন। সে দিনের জগন্নাথ দর্শনের দৃশ্য যেন বড়ই করুণ, কারণ মহাপ্রভুর বদন বিষণ্ণ, মন অপ্রসন্ন,—তিনি কোন কথা কহিতেছেন না। বহুভক্ত সে দিন মহাপ্রভুর সঙ্গে একত্রে জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। ক্রমে তাঁহারা সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নিশ্বাস ছাড়িয়া যে চলিলা মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি হেরি কভু॥

(১) হেন কালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবনকথা কহে ব্যথিত অন্তরে॥ চৈঃ মঃ

সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজজন যত তেমনি চলিল।
সত্বরে মন্দির ভিতরেতে উত্তরিল॥ চৈঃ মঃ

মহাপ্রভু দ্বারে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবদন দর্শন করিতেছেন, কিন্তু যেন ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। এই জন্যই যেন তিনি সেদিন শ্রীমন্দির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবা মাত্র আপনা আপনিই শ্রীমন্দির দ্বার বন্ধ হইয়া গেল (১)। ভক্তগণ বাহিরে,—মহাপ্রভু ভিতরে জগন্নাথের সম্মুখে তিনি কি করিতেছেন, তাহা ভক্তগণ কিছুই জানিতে পারিলেন না,— তাঁহারা সকলেই মহা চিন্তিত, কারণ এরূপ মহাপ্রভু ত কখন করেন নাই,—এই তাঁহার এরূপ প্রথম লীলারঙ্গ। ভক্তগণের মনে নানারূপ সন্দেহ হইতে লাগিল।

গুঞ্জাবাড়ীতে তখন একজন পাণ্ডা উপস্থিত ছিলেন। তিনি গুঞ্জাবাড়ী হইতে মহাপ্রভু ভিতরে কি করিতেছিলেন তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীমন্দির ভিতরে জগন্নাথদেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার শ্রীচরণের প্রতি চাহিয়া সজল নয়নে কাতর হৃদয়ে নিশ্বাস ফেলিয়া কি নিবেদন করিতেছিলেন।

আষাড় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥ চৈঃ মঃ

তিনি জগন্নাথের নিকট কি নিবেদন করিতেছিলেন, তাহাও গ্রন্থে লিখিত আছে যথা,—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥ চৈঃ মঃ

অর্থাৎ "হে জগন্নাথ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের ধর্ম্মই তোমার নাম-কীর্ত্তন। বিশেষতঃ কলিযুগে-নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সার-ধর্ম্ম। হে জগন্নাথ! তুমি পতিতপাবন,—এক্ষণে কলিযুগ আসিয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া কলিহত জীবকে চরণে আশ্রয় দান কর"। পরমদয়াল জীববন্ধু কলিপাবনাবতার মহাপ্রভু তাঁহার লীলা-সঙ্গোপন দিনেও কলিহত জীবের মঙ্গল কামনা করিলেন।

এই বলিয়া মহাপ্রভু কি কাণ্ড করিলেন তাহা শুনুন,—

এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হৃদয়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥ চৈঃ মঃ

গুঞ্জাবাড়ার পাণ্ডাঠাকুর দেখিলেন মহাপ্রভু জগন্নাথকে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন,— এই সঙ্গে সঙ্গে সচল জগন্নাথ অচল শ্রীবিগ্রহে লীন হইয়া একীভূত হইলেন। রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় নীলাচলে এই কাণ্ড হইল। একমাত্র গুঞ্জাবাড়ীর পাণ্ডা ইহা দেখিলেন। ইহা দেখিয়া পাণ্ডা ঠাকুর ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া চীৎকার করিয়া দৌড়িয়া মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথকে দেখিয়া "কি হইল কি হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা সে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন॥ চৈঃ মঃ

তাঁহার চীৎকার শুনিয়া ভক্তগণ দৌড়িয়া দ্বারের নিকটে আসিলেন। পাণ্ডাঠাকুর ভিতর হইতে কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। ভক্তগণ তখন দ্বারে করাঘাত করিয়া তাঁহাকে দ্বার খুলিতে অনুরোধ করিলেন। কারণ তাঁহারা মহাপ্রভুর জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।

বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট-প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥ চৈঃ মঃ

তখন পাণ্ডাঠাকুর তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিলেন। তিনি কান্দিতে কান্দিতে সর্ব্ব সমক্ষে কি কহিলেন শুনুন,—

ভক্ত ইচ্ছা দেখি কহে পড়িছা তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন।

(১) নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেই খানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কবাট।
সত্বরে চলিল প্রভু অন্তরে উচাট॥ চৈঃ মঃ

সাক্ষাতে দেখিনু গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥ চৈঃ মঙ্গল।

পাণ্ডাঠাকুর এখন অতি সুস্পষ্ট ভাষায় মহাপ্রভুর সঙ্গোপনলীলা সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিলাম যে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু জগন্নাথদেবের সহিত মিলিত হইলেন, এবং অদর্শন হইলেন।

এই নিদারুণ প্রাণঘাতী সংবাদ শুনিয়া ভক্তগণের যে কি অবস্থা হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনার অতীত। সে কথা না শুনিলেই ভাল হয়। ঠাকুর লোচনদাস এ সম্বন্ধে একটি পয়ার শ্লোক লিখিয়াছেন তাহা এই—

"এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার।
প্রভুর শ্রীমুখ চন্দ্র না দেখিব আর॥"

মহাপ্রভু আর জগন্নাথদেব যে অভিন্ন তত্ত্ব, তাহা তিনি লীলাদ্বারে তাঁহার ভক্তগণকে বুঝাইয়াছেন,—এক্ষণে সঙ্গোপন লীলায় তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইলেন। তিনি তাঁহার অনুগত ভক্তগণকে বুঝাইলেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহেই তিনি আছেন,—অতএব জগন্নাথই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গধন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গধনই আমাদের জগন্নাথ। মহাপ্রভু যে এখন অপ্রকট তাঁহার ভক্তগণের সে জ্ঞান নাই,—জগন্নাথ দেখিলেই সচল জগন্নাথ মহাপ্রভুকে তাঁহাদের মনে পড়ে,—জগন্নাথের মধ্যে মহাপ্রভুকে তাঁহারা দেখিতে পান তাই তাঁহারা ছুটিয়া প্রত্যহ জগন্নাথ দেখিতে যান। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ,—নবদ্বীপে যে বস্তু নাই,—নীলাচলে তাহা আছে। মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর নবদ্বীপে ছিলেন,—সেখানে তাঁহার বাড়ী-ঘর, জিনিষ-পত্র সকলি ছিল, কিন্তু এখন তাহার কিছুরই কোন একটা নিদর্শন পাওয়া যায় না,—কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে এখনও তাঁহার পাদপদ্মচিহ্ন,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গচিহ্ন বিরাজিত,—এখনও তাঁহার সেই শ্রীগম্ভীরা-মন্দির বিরাজিত,—এখন তাঁহার ব্যবহৃত সেই জীর্ণ ছিন্ন কন্থাখানি সেখানে বিরাজিত। সেই শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ,—যাহাতে মহাপ্রভু প্রবেশ করিয়া অদর্শন হইয়াছিলেন,—এখনও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া সেইভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন,—মহাপ্রভু এই শ্রীবিগ্রহের ভিতরেই বিরাজ করিতেছেন,—তাই বলি নবদ্বীপে যাহা নাই,—শ্রীক্ষেত্রে তাহা আছে,—তাই শ্রীক্ষেত্র আমাদের এত আদরের ধন,—এত প্রিয়তম বস্তু। মহাপ্রভু তাঁহার অনুগত ভক্তগণকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, কলিহত জীবকে তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু অপ্রকট হয়েন নাই,—তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথরূপে নীলাচলে শোভা পাইতেছেন,—ভাগ্যবান্ ভক্তদিগকে দর্শন দিতেছেন,—তাঁহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণের অভাব নাই। তাঁহার ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া তাঁহাদিগের দর্শনসহ গৌর-বিরহ-দুঃখ দূর করেন। সচল জগন্নাথ এখন অচল হইয়া আছেন,—এইমাত্র দুঃখ।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সঙ্গোপনলীলা কাহিনী অলৌকিক এবং অদ্ভুত। এই অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিত আছে তিনি পণ্ডিত গদাধরের শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে প্রবেশ করেন। শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে প্রবেশ করা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। ভক্তিরত্নাকর অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ,—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রাচীন গ্রন্থ, এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অনুমোদিত। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মঙ্গলবর্ণিত কথাই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মহাপ্রভুর প্রকটাপ্রকট লীলারঙ্গ সকলি সমান। শ্রীগৌরভগবানের নিত্যলীলা চিরদিনই নিত্যধামে প্রকট। তাঁহার ভক্তগণ, নিত্যদাস ও পার্ষদগণেরও লীলাও নিত্য। তবে শ্রীভগবান যখন জীবের মঙ্গল কামনায় নরবপু গ্রহণ করিয়া অবতাররূপে ভুবনে প্রকট হন,—তখন তাঁহার লীলা প্রকট নামে খ্যাত হয় মাত্র। শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদগণও তাঁহার অবতারের সঙ্গে সঙ্গে লীলায় সহায়তা করিতে আসেন,—তাঁহাদিগের লীলাও প্রকট বলিয়া অভিহিত।

মহাপ্রভুর সঙ্গোপনলীলায় কিছু পূর্ব্বে তাঁহার কটির ডোর, পরিধানের কৌপীন এবং বসিবার আসন শ্রীবৃন্দাবনে

গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট তাঁহারই আদেশে প্রেরিত হয়। গোপাল ভট্ট গোস্বামী তখন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন,—শ্রীসনাতন গোস্বামী এই সংবাদ মহাপ্রভুকে লোক দ্বারা পাঠাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু এই সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পরম প্রিয়ভক্ত গোপাল ভট্টকে তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ ডোর, কৌপীন ও আসন, এই কয়টি নিজের ব্যবহৃত বস্তু শ্রীবৃন্দাবনে লোক দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে সহস্তে একখানি পত্রও লিখিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী, তাঁহার যাহা কিছু সম্বল ছিল,- তাহাই তাঁহার প্রিয়ভক্ত গোপাল ভট্টকে দিলেন। গোপাল ভট্ট সন্দেশে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন,—তখন মহাপ্রভুর এই আসন, কৌপীন ও ডোর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাই তিনি বলিলেন—

"সবে ডোর আছে মোর বসিতে আসন"।

মহাপ্রভুর এই সন্দেশের প্রসাদই ভাগ্যবান গোপাল ভট্ট পাইয়া ধন্য হইলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে যখন মহাপ্রভুর পত্র,—আর এই ডোর কৌপীন ও আসন পৌছিল,—তখন তিনি লীলা-সম্বরণ করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনেই ছিলেন। এই সকল পরম দুর্লভ বস্তু যখন শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট পৌছিল,—সেখানে শ্রীরূপ গোস্বামীও ছিলেন। উভয়েই মহাপ্রভুর এই সন্দেশ প্রেমোপহার ও তাঁহার প্রেমপত্রী দেখিয়া প্রেমাবেগে মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, মহাপ্রভুর সকল লীলারহস্ট তাঁহাদের বিদিত। তাঁহারা গভীর বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন,—কারণ তাঁহারা অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন মহাপ্রভু তাঁহাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহার পর অনেক যত্নে তাঁহাদিগের মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইলে;—এই সকল প্রভুদত্ত অমূল্য বস্তু লইয়া গোপালভট্টের বাসায় চলিলেন। সনাতন গোস্বামী গোপালভট্ট গোস্বামীকে প্রভুদত্ত ডোর কৌপীন ও আসন দিলেন এবং মহাপ্রভুর পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন ; যথা প্রেমবিলাসে—

দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি।
পত্র পড়ি শুনাইলা প্রেমের মাধুরী॥
পত্রের গৌরব শুনি মূর্চ্ছিত হইলা।
আসন বুকে করি ভট্ট কান্দিতে লাগিলা॥
যত্ন করি শ্রীরূপ করান কিছু স্থির।
সনাতন দেখি ভট্ট হইলেন ধীর॥

গোপালভট্ট গোস্বামী মহাপ্রভুর ব্যবহৃত পরম অমূল্য বস্তু গুলিকে নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর লিখিত পত্রের আদেশ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, যে এই ডোর কৌপীন পরিধান করিয়া আসনে বসিবে, ইহাই মহাপ্রভুর আদেশ। তখন অগত্যা গোপাল ভট্ট তাহা স্বীকার করিলেন—

প্রভু আজ্ঞা বলবতী শ্রীরূপ কাহিনী।
গলে ডোর করি ভট্ট আসনে বসিলা॥ প্রেঃ বিঃ

মহাপ্রভুর শেষ গাদি গোপালভট্ট পাইলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর অপ্রকট-সংবাদে শ্রীবৃন্দাবনে যে ভীষণ ক্রন্দনের রোল উঠিল, তাহা সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। গোপালভট্টও গাদিতে বসিলেন,—এমন সময় শ্রীক্ষেত্র হইতে ভীষণ প্রাণঘাতী সংবাদ আসিল মহাপ্রভু অদর্শন হইয়াছেন। শ্রীরূপ সনাতন ও গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণ যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ভক্তগণের নিকটে শ্রীভগবানের কোন লীলারহস্যই গোপন থাকে না। শ্রীবৃন্দাবনের ভক্তগণ মহাপ্রভুর জন্য প্রাণ ত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু দয়াময় ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু স্বয়ং তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া প্রবোধ দিলেন এবং এই নিদারুণ সংকল্প হইতে সকলকে বিরত করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ভক্তগণ দেহ ত্যাগ করিলেন না মাত্র,—কিন্তু জীবন্মৃত হইয়া কোন প্রকারে দেহ রাখিলেন মাত্র।

নবদ্বীপ এবং নীলাচলের ভক্তবৃন্দের অবস্থা ভাষায় বর্ণনাতীত। ঠাকুর লোচনদাস তাহার কিছু কিছু আভাস দিয়াছেন বটে ; যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

শ্রীবাস পণ্ডিত আর দত্ত যে মুকুন্দ।
গৌরীদাস বাসুদত্ত আর শ্রীগোবিন্দ॥
কাশীমিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
উৎকলের সভে কান্দি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে।
পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তনুজ সহায়।
প্রভু প্রভু বলি ডাকে শুন গৌররায়॥
অনেক রোদন কৈল সব ভক্তগণ।
ইহা কি লিখিব কত মো অধম জন॥

উড়িষ্যার অধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর বিরহে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার গৌর-বিরহ-যাতনা উপশমের জন্য উৎকলবাসী গৌরভক্তবৃন্দের আদেশে কবি-কর্ণপুর গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা নাটকাকারে সংস্কৃতভাষায় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই মূল শ্রীগ্রন্থখানি গৌরভক্তমাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ শেষে লিখিযাছেন—

মিনতি করিয়া বলি শুন সব জন।
দিবানিশি ভজ ভাই গৌরাঙ্গ চরণ॥
নির্ম্মল হইয়া সবে শুন গোরা গুণ।
ভবব্যাধি নাশিবার এই সে কারণ॥
এত শোকে বিলপন করয়ে লোচন।
শেষ খণ্ড সায় কৈল প্রভুর কীর্ত্তন॥

এক্ষণে ভক্তিরত্নাকরের বর্ণিত মহাপ্রভুর সঙ্গোপন-লীলা-কাহিনীটির কিঞ্চিৎ বিচার প্রয়োজন। যখন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনীলাচলভূমি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য তখন প্রকট ছিলেন—তিনিই তাঁহাকে নীলাচলের মহাপ্রভুর লীলাস্থলীগুলি দেখাইয়াছিলেন; যথা টোটা গোপীনাথ দর্শনে তাঁহার উক্তি শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

ওহে নরোত্তম এই খানে গৌরহরি।
না জানি কি গদাধরে কহিল ধীরি ধীরি॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥
ন্যাসী চূড়ামণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী হইল অন্ধকার॥
প্রবেশিয়া এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হলো অদর্শন পুনঃ না আইল বাহিরে॥
প্রভু সঙ্গোপন সময়েতে হলো যাহা।
লক্ষ মুখ হইলেও কহিতে নারি তাহা॥
এই খানে গদাধর হৈল অচেতন।
এথা সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন॥

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থকার শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে জনশ্রুতি অবলম্বনে গোপীনাথ আচার্য্যের মুখ দিয়া মহাপ্রভুর এই সঙ্গোপনলীলাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,তাহা বলিবার অনেক কারণ আছে। প্রধান কারণ এই দুঃখপূর্ণ লীলাকথা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার কোন আদি গ্রন্থে লিখিত নাই। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল যিনি প্রথম মুদ্রিত করেন—তিনি সাধারণ ভক্তজনের বিশ্বাসের বিপরীত কথা হয় ত প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই—কারণ একটা প্রাচীন পদে দেখিতে পাই—

কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি সরে।
মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে॥

বহুপূর্ব্বে মুদ্রিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে অনেক কথাই নাই—বিশেষ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গোপন-লীলা-কাহিনী যাহা পরে প্রকাশ হইয়াছেন—তাহা প্রকাশ করিতে কাহারও সাহস হয় নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর লীলাসঙ্গোপনকালে তাঁহার শক্তি ও স্মৃতি যে কোন পূজিত শ্রীবিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান—একথা অতি সঙ্গত। শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও গোপীনাথ এক বস্তু হইলেও বিভিন্ন ভাবদ্যোতক শ্রীবিগ্রহ। শ্রীজগন্নাথ মহা করুণার বিগ্রহ,—তিনি জাতি, কুল, দেশ, কাল, পাত্র পদ ও মর্য্যাদা—এসকল কিছুই বিচার করেন না

...এক সঙ্গে গ্রহণ করেন —অস্পৃশ্য ...উচ্ছিষ্ট হইলেও— তাহা মহা পরম পবিত্র বস্তু —তিনি হিন্দুমুসলমানের জাতির বিচার করেন না— সর্ব্ব জাতিকে এক প্রেমসূত্রে বদ্ধ করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তিনি তাঁহার অধরামৃত প্রসাদ বিতরণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সহিত শ্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধ ও সৌসাদৃশ্যভাব বহুতর তাঁহাকে এইজন্য তাঁহার ভক্তবৃন্দ সচল-জগন্নাথ বলিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে বাস না করিয়া শ্রীনীলাচলে বাস করিলেন —ইহা দ্বারা তিনি জগজ্জীবকে দেখাইলেন তাঁহার শ্রীজগন্নাথের প্রতি প্রীতি অধিক। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভাব নাই—ভারতবর্ষের যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে—সকল সম্প্রদায়ী সাধুগণই শ্রীজগন্নাথদেবকে সম্মান ও সমভাবে পূজা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু জীববন্ধু- সর্ব্বজীব উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহার অবতার গ্রহণ। তাঁহার ইচ্ছা হইল সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোক যে ঠাকুরের চরণাশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি সেই শ্রীবিগ্রহে নিজ শক্তি ও স্মৃতি রাখিয়া যাইবেন এইজন্য বোধ হয় তিনি শ্রীজগন্নাথ শ্রীবিগ্রহে লীন হইলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আসক্তি অধিক ছিল, তিনি শিশুকাল হইতে সর্ব্বভাবে শ্রীগৌরাঙ্গসঙ্গ ও ভজন করিবার আসিয়া... তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠা অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং সর্ব্বভক্তজনবিদিত তিনি গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসেবা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বর্ণন না যায়।
> প্রতিজ্ঞা সে কৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥
>
> *   *
>
> প্রভু কহে ইহা কর গোপীনাথ সেবন।
> পণ্ডিত কহে কোটী সেবা ত্বৎপদদর্শন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে গদাধরপণ্ডিতের জীবনরক্ষা দায় ... কিন্তু তাঁহাকে আরও কিছুদিন মহাপ্রভু প্রকট রাখিবেন—ইহা তাঁহার ইচ্ছা—কারণ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে দর্শন দান ও কৃপা না করিয়া তিনি আত্মগোপন করিতে পারেন না। ইচ্ছাময় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ইহাই ইচ্ছা। মহাপ্রভুর সঙ্গোপন-লীলাসংবাদে গদাধরপণ্ডিত দেহত্যাগের সংকল্প করিলে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়া আকাশবাণী দ্বারা আদেশ করেন "গদাধর। তুমি দেহত্যাগ করিতে পারিবে না, তোমার কার্য্য আছে,—তোমার এই গোপীনাথেই আমি রহিলাম"; এ সিদ্ধান্তও কিছু অসমীচীন নহে। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্মরণ সম্বন্ধে উভয়বিধ আখ্যানই গৌরভক্তগণ ভক্তিভরে সমাদর করিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা নিত্যলীলা,—এই নিত্যলীলা নিত্যধাম শ্রীনবদ্বীপে নিত্য প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলের লীলা সঙ্গোপন করিয়া তাঁহার নিত্যধাম শ্রীনবদ্বীপে যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে তাঁহার স্ব-স্বরূপে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দরূপে নিত্যলীলারঙ্গ করিতেছেন। যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীনদীয়াযুগলরূপে তাঁহার স্বয়ংরূপে নিত্য নদীয়া-বিলাস করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অন্তঃপুরে মনোহর পুষ্পোদ্যান, তথায় বিচিত্র মণিময় শ্রীমন্দির শোভা পাইতেছে। শ্রীমন্দির মধ্যে বহুমূল্য রত্নখচিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ-তলে মণিময় রত্নসিংহাসন,—তদুপরি শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীশ্রীলবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে লইয়া শত শত নাগরীগণবেষ্টিত হইয়া তথায় বিহার করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের কণককান্তি-বিনিন্দিত কলেবর বিচিত্র বহুমূল্য বসনভূষণ ও পুষ্পালঙ্কারে বিভূষিত। লক্ষ লক্ষ দাসীবৃন্দ সুবাসিত তাম্বুল ও মাল্যচন্দন যোগাইতেছেন, চামর ব্যজন করিতেছেন। অগণিত সখিবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে নিত্যলীলারঙ্গ করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিশেষ কৃপাপাত্র এবং চিহ্নিত দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রবেশ কালে গৌরশূন্য শ্রীনবদ্বীপ দেখিয়া গৌরবিরহশোকে বিহ্বল হইয়া যখন আকুলপ্রাণে শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন, তখন তিনি এই স্বপ্ন দেখিলেন ; যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে—